আবদুল মান্নান সৈয়দ

গল্পসংগ্রহ

গল্প সংগ্রহ

গল্পসংগ্রহ

আবদুল মান্নান সৈয়দ

ভূমিকা ও পরিশেষ
সাব্বির আজম

সূচীপত্র
www.sucheepatra.com

প্রকাশক ❑ সাঈদ বারী
প্রধান নির্বাহী, সূচীপত্র
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন ❑ ৭১১৩৮৭১

গল্পসংগ্রহ
আবদুল মান্নান সৈয়দ

স্বত্ব ❑ সায়রা সৈয়দ, জিনান সৈয়দ
ভূমিকা ও পরিশেষ স্বত্ব ❑ সাব্বির আজম
প্রথম প্রকাশ ❑ ফাল্গুন ১৪১৮ / ফেব্রুয়ারি ২০১২
প্রচ্ছদ ❑ সাঈদ বারী
বর্ণবিন্যাস ❑ আক্তারুজ্জামান
মুদ্রণ ❑ সাদাত প্রিন্টিং প্রেস, ১৪ কবিরাজ গলি লেন, ঢাকা ১১০০

ভারতে পরিবেশক ❑ রাজু বুক স্টোর
স্টল নং ৭, ব্লক-২, কলেজ স্কয়ার (দক্ষিণ)
সূর্যসেন স্ট্রিট, কলকাতা
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিবেশক ❑ মুক্তধারা
জ্যাকসন হাইট্স, নিউ ইয়র্ক
www.muktadhara.com
যুক্তরাজ্যে পরিবেশক ❑ সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
কানাডায় পরিবেশক ❑ এটিএন বুক এন্ড ক্রাফট্স
২৯৭০ ড্যানফোর্থ অ্যাভিনিউ, টরেন্টো
অনলাইন বুকশপ ❑ www.boi-mela.com

GALPOSANGRAHO
A Collection of Short Stories by Abdul Mannan Syed

Published by Saeed Bari, Chief Executive, Sucheepatra
38/2Ka Banglabazar Dhaka 1100 Bangladesh
Ph : (880-2) 7113871
e-mail : sucheepatra77@gmail.com, saeedbari07@gmail.com
website : www.sucheepatra.com
Price : BDT. 495.00 Only US $ 20.00 £ 10.00

মূল্য : ৳ ৪৯৫.০০ মাত্র

ISBN 978-984-8557-08-2

এই বইয়ের বিষয়বস্তু লেখকের নিজস্ব, লেখকের মতামতের জন্যে প্রকাশক দায়ী নন—প্রকাশক

উ ৎ স র্গ

হুমায়ুন চৌধুরী
জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

আমার গল্প লেখার প্রথম তিন সঙ্গীর উদ্দেশে

লে খ কে র ক থা

সাঈদ বারী সেল্‌ফোনে বলল—মান্নান ভাই, *পদ্মানদীর মাঝি*-র ভূমিকার প্রুফ রেডি। কোথায় আপনি? বললাম—আড্ডা দিচ্ছি *অন্তরে রেস্তোরাঁ*-য়। চলে আসুন। বলল—আসছি।—ছিলাম আমি আর সাব্বির আজম। গল্প করছি। বারী এসে পড়ল। লুচি-শবজি-চা চলছে। আর গল্প। মনে থাকে না আজকাল। বারীকে জিগেস করলাম—কি কি বই যেন ছাপছেন আমার? জানাল। সবই দেখি হয় ভূমিকা, নাহয় সম্পাদনা। অবাক হই। বলি—আমার নিজস্ব কোনো বই নেই? সহাস্যে বারী বলে—না-দিলে আমি কি করব? *কেন আসিলে ভালোবাসিলে* তো দিয়ে দিলেন বিজুকে। হা-হা করে হাসলাম আমি। বললাম—যদি কেউ জিগেস করে,

'আবদুল মান্নান সৈয়দ কি লিখছেন আজকাল?'
'মান্নান সৈয়দ ভূমিকা আর ফ্ল্যাপের লেখা লিখছেন।'

এই জবাব দেবেন।—সাব্বির হাসতে হাসতে বলল—কেন, *গল্পসংগ্রহ* তো হতে পারে। বারী তৎক্ষণাৎ রাজি। বললাম—বইমেলার কদিন মাত্র বাকি আছে আর? এর মধ্যে পারব কি? ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখি।—এবং চেষ্টাচরিত্র করে কিছু গল্প জড়ো করা গেল। আর এবার আর আক্তার কম্পোজ করতে দেরি করল না। অতিদ্রুত প্রুফ এসে গেল। কিন্তু আমার?—আমার আছে ফ্ল্যাপের লেখা আর আড্ডা আর ভূমিকা আর আড্ডা আর ঘর অন্ধকার করে চুপ করে শুয়ে থাকা।

যাই হোক, শেষপর্যন্ত *গল্পসংগ্রহ* তৈরি হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। সাব্বির ভূমিকা লিখছে, আরো-সব সাজিয়ে দিচ্ছে।

এদিকে সায়ীদ ভাই (আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ) বই বেরোচ্ছে শুনে বললেন—মান্নান, গল্প লেখা ছেড়ে দাওনি তাহলে? ছেড়ো না। কবি আবুল হোসেন বললেন—'রুমু রানি রোজি' আর 'বিদ্যাসুন্দর কাহিনী' থাকছে তো এখানে? আখতারুজ্জামান ইলিয়াস একটা গল্পের নাম করে বলল—তোমার ঐ গল্পের শেষটা কিন্তু loud হয়ে গেছে। ওটা দিয়ো না। আহমাদ মোস্তফা কামাল বলল—একটা দরকারি কাজ করছেন তাহলে। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় বললেন—বেরোলে তোমার গল্পের বইটা পাঠিয়ো তো আমাকে। মিনু বলল—কতবার বললাম, স্যার। আমাকে নিয়ে গল্প লিখলেন না আজো। আলমগীর রেজা চৌধুরী বলল—মান্নান ভাই, 'জীবনানন্দ দাশের অপ্রকাশিত গল্প'টা থাকছে তো? জিল্লু বলল—খুশিতে জান্‌টা তর্ হইয়া গেল। মনে হইল যেন্ আপনার লগে রাজধানী হোটেলে এক গেলাশ ঠাণ্ডা ফালুদা খাইলাম। যাক, আপনার গল্পের সাপ্লায়ারকে ভুলেন নাই তাইলে। অনিন্দিতা বলল—আপনার

মনোজগতের গল্পের প্রাধান্যই থাকে যেন। জামাল রেজা বলল—দেখি কোন গল্পের নাট্যরূপ দেওয়া যায়। মন্টু বলল—আমাকে নিয়ে আজকাল আর গল্প লিখছ না তুমি, দোস্ত। পিয়াস মজিদ বলল—আমি বইটার আলোচনা করব। খুকুরানি বলল—আমাকে সবসময় ন্যাস্টি চরিত্র দেন আপনি। আপনি আর কখনো এখানে আসবেন না। প্রফেসর আবু তাহের মজুমদার বললেন—গল্প লেখার ক্ষেত্রে আপনি শীর্ষে। মনে রাখবেন তুষ ঝরে যাবে, রয়ে যাবে সোনার ধান। পুলক হাসান বলল—মান্নান ভাই, আমার পত্রিকায় কিন্তু আপনার একটা গল্প লেখবার কথা ছিল। আবদুল্লাহ আল মামুন বলল—আগে তো তোমার গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছিলাম, এবার দেখি সিনেমা বানাব একটা। শশাঙ্ক পাল বলল—আমার *উল্কা* আর *শ্রাবন্তী*-তে প্রকাশিত আপনার সব গল্প বইয়ে থাকছে তো? ফারুক আহমেদ বলল—মান্নান ভাই, আপনার গল্প পেলাম না আজো। অশোক সৈয়দ বলল—বন্ধু, আমাকে আবার কাজে লাগাও। সোনালি বলল—শিল্পিত গল্পের বাইরে কিছু দেবে না। শওকত আলী বললেন—মান্নান, গল্প লিখছেন ভালো। উপন্যাস লেখায় নামুন এবার। অনামিকা বলল—আচ্ছা, তুমি এত গল্প লিখলে কখন? পারোও, বাবা! সাকি বলল—আপনার গল্প অন্যরকম। আনা বলল—মিখাইল, আপনি বলেছিলেন, নতুন একটা গল্প ডিকটেশন দেবেন। কি হলো তার?

সহৃদয়দের প্রত্যেকের কথায় আমি হুঁ-হ্যাঁ করে গেলাম। সহৃদয়দের সঙ্গে গল্প করা বা তাদের জন্যে গল্প লেখা ছাড়া আমি জবাব দেবো কি আর!

ফেব্রুয়ারি ২০১০

আবদুল মান্নান সৈয়দ

প্র বে শ ক

পূর্বভাষ্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত দিয়ে বাংলা প্রকৃত ছোটগল্পের অভিযাত্রিকতার যে সূচনা, শত বছরেরও অধিককালব্যাপী বিবিধ সঞ্চরণশীল পথ বেয়ে বিভিন্ন কথাসাহিত্যিকের দক্ষ কারুকার্যময়তায় ও প্রকৃত শৈল্পিকতায় সেটি হয়ে উঠেছে বলিষ্ঠ, সৌষ্ঠবমণ্ডিত ও বিচিত্রানুসন্ধানমুখী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, বেগম রোকেয়া প্রমুখ প্রথম দিককার গল্পকার। বিশের ও ত্রিশের দশকে শৈলজানন্দ, কাজী নজরুল ইসলাম, মনীশ ঘটক, জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, বনফুল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের হাতে বাংলা ছোটগল্প বেগবান হয়। এদের অনেকের হাতে একেবারে নিম্নবিত্তের জীবনধারা, আঞ্চলিক জীবনাচরণও রূপায়িত হতে থাকে। চল্লিশের দশকেরই প্রথম আধুনিক বাঙালি-মুসলমান গল্পকাররা বেরিয়ে আসেন—সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আবু রুশদ, শওকত ওসমান ও শামসুদ্দীন আবুল কালাম। এঁদের মধ্যে মূলত ওয়ালীউল্লাহকেই প্রকৃত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির অভিক্ষেপসম্পন্ন কথাসাহিত্যিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পঞ্চাশের দশকে আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক, হাসান আজিজুল হক, আবুবকর সিদ্দিক, জহির রায়হান প্রমুখ দেশবিভাগোত্তর পূর্ববাংলার গল্পকে শক্তিশালী ও স্বতন্ত্র করে তুলতে সক্ষম হন।

বিশ্বসাহিত্যের ছোটগল্পের দিকে তাকালে দেখতে পাব ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বিভিন্ন দেশের ছোটগল্প শক্তিশালী অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। বিশেষত রুশ সাহিত্য। কিন্তু চারটি তত্ত্ব বা মতবাদ সমস্ত বিশ্বসাহিত্যে আমূল পরিবর্তন এনে দিলো, কী বিষয়বস্তুতে কী প্রকরণে কী চিন্তা-চেতনায়। এর প্রথমেই আছে মার্কসবাদ—যেটি মূলত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দর্শন হলেও বাংলা সাহিত্যে তথা বিশ্বসাহিত্যে এর প্রভাব ও অবদান অবিচ্ছেদ্য। শ্রেণীচেতনার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মার্কসীয় ধারা সমাজকে দেখার নতুন পথ করে দেয়। স্বভাবতই সাহিত্যেও নির্যাতিত শ্রেণীর জীবনসংগ্রাম, অস্তিত্বসংকট ও সুখ-দুঃখ প্রতিফলিত হতে লাগল। এর পর সিগমুন্ড ফ্রয়েড এসে আরেকটি বড় ধরনের ঝড় তুললেন। তিনি দেখালেন—আমাদের মনে অচেতন (The unconscious) বলে একটি অংশ রয়েছে যা আমাদের চেতন-অংশ বা আমাদের প্রতিদিনকার চিন্তা-চেতনাকে প্রভাবিত করে, এমনকি নিয়ন্ত্রণও করে থাকে। এতকাল পর্যন্ত অচেতন সম্পর্কে আমাদের সেরকম স্পষ্ট কোনো ধারণাই ছিল না। ফ্রয়েডের এ আবিষ্কারও শিল্প-

সাহিত্যে নতুন দ্যোতনার বিস্তার ঘটায়, অচেতনকে অনুসন্ধানপ্রয়াসী হয়ে ওঠেন অনেক শিল্পী-সাহিত্যিক। এর পর বলা যায় সা'রিয়ালিজমের কথা। চিন্তার-ভাবনার-কল্পনার ক্ষেত্রে এতদিন যে শৃংখলাবদ্ধতা ছিল, দেয়াল ছিল, সমস্তই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো সা'রিয়ালিজম। যুক্তি-অযুক্তি, বাস্তবতা-কল্পনার দেয়াল ধ্বসে পড়ল। সৃজনশীল কাজের প্রতিটি শাখারই পরিসর বৃদ্ধি পেল। পরাবাস্তবতা মানুষের চেতন-অচেতনকে অনুসন্ধান করতে সাহায্য করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় অস্তিত্ববাদের রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রাণস্পন্দন। দর্শনের চিরায়ত রূপের আবরণ থেকে বের হয়ে অস্তিত্ববাদ একেবারে ব্যবহারিক দর্শন হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই প্রথম ব্যক্তির subjectivity কে কেন্দ্রে বসানো হলো। ব্যক্তিমানুষের ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতা, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা ইত্যাদি সে নিজেই নির্ধারণ করবে। ফলে সাহিত্যেও আরেকটি নতুন দরজা খুলে গেল। অন্যান্য দেশের সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেও এ চারটি তত্ত্ব বা মতবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট।

ষাটের দশকের অস্থির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যেই আবদুল মান্নান সৈয়দের আবির্ভাব ও স্ফূরণ। তবে তাঁর গল্পপাঠের ক্ষেত্রে সামাজিক অবয়ব বা রাজনৈতিক প্রেক্ষিত গুরুত্বহীন, কেননা তাঁর গল্প সচেতনভাবেই রাজনীতি ও সমাজবাস্তবতা বিবর্জিত। কিন্তু ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব, পরাবাস্তবিক ঘূর্ণি ও অস্তিত্ববাদী শিরদাঁড়াকে সাঙ্গীকৃত করে স্বতন্ত্র ও তীক্ষ্ণ ভাষাকাঠামো ও গল্পবয়নের কুশলতায় তিনি নিজস্ব কক্ষপথ তৈরি করে নিতে সক্ষম হন। ব্যক্তির সংকট এবং সে প্রেক্ষিতে তার মানসক্রিয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তাঁর গল্পের মৌল প্রবণতা।

মনোবিশ্ব ও নিরীক্ষণশীলতার পুরোহিত

Properly speaking, the unconscious is the real psychic; its inner nature is just as unknown to us as the reality of the external world, and it is just as imperfectly reported to us through the data of consciousness as is the external world through the indications of our sensory organs.

–Sigmund Freud

আমরা সাধারণত যে ধরনের গল্প পড়ে অভ্যস্ত অর্থাৎ ঘটনার প্রবহমানতা, মান্নান সৈয়দের গল্পে প্রায়শই তা পাওয়া যায় না; তাঁর গল্প আয়োজন আমাদের অন্দরমহলকে ঘিরে। তাঁর গল্পের (বিশেষত প্রথমদিককার গল্পের) নায়ক ঘরের মধ্যেই হয়তো বসে থাকে অথবা অফিস থেকে বাড়ি ফিরে চারপাশে মাঝে মাঝে দু'একটা আকস্মিক ঘটনা ঘটে, কখনো কখনো হয়তো কোনো আকস্মিক ঘটনাও ঘটে না—এরই মাঝে গল্পও শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তিনি প্রচ্ছন্নভাবে এক অদৃশ্য প্রশ্ন আমাদের দিকে ছুঁড়ে দেন—আমাদের দৃশ্যজগতের এই যে পটপরিবর্তন, ঘটনা দুর্ঘটনা, অস্থিরতা, সুখবোধ—এই কি সব? বা এই কি শেষ? অথবা এটাই কি মুখ্য? এইসব ঘটনা-দুর্ঘটনার পেছনে কি ঘাপটি মেরে লুকিয়ে নেই আমাদের অচেতন? অন্তর্বিশ্বের সেই সমস্ত অস্থিরতা-শঙ্কা-অন্তর্দ্বন্দ্ব-অপ্রাপ্তিকেই কি তাহলে

সামনে তুলে আনার প্রয়োজন নয়? মাইক্রোস্কোপ দিয়ে তিনি যেন এগুলোকে অবলোকন করেন আর তুলে নিয়ে আসেন। গল্পের চরিত্রপাত্র আমাদেরকে তীব্রতম সত্যের সম্মুখীন করে উপলব্ধ সত্যকে উগরে দিতে চায়। সত্যকে বারবার প্রশ্নের সম্মুখীন করে সত্যের অধিকতর ও গভীরতর কোনো সত্যকে সামনে নিয়ে আসেন।

গল্পের পাত্র-পাত্রী কোন শ্রেণীর সেটি কখনোই বড় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়নি তাঁর সামনে; বরং মানুষের অন্তর্লোক আবিষ্কারস্পৃহার ক্রমাগত অনুধ্যান তাঁর গল্পকে চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। শুধুমাত্র ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনা-মনোবিবাদ-চিত্তবৈকল্য-মানসচাঞ্চল্য-আবেগ-অতৃপ্তি দিয়েই তিনি যে গভীরতা ও অতলতার সামনে নিয়ে আমাদেরকে দাঁড় করান তাও বিস্ময়কর। এছাড়া বিচিত্র বিষয়ভঙ্গিমা ও আয়তনমাত্রাকে আত্তীকরণের ফলে গল্পগুলোর সৌষ্ঠব ও সৌকর্য আরো বেড়েছে। আত্মরতিতে নিমগ্ন ব্যক্তির অন্তশ্চেতনার অপরিশুদ্ধ অবয়ব ও অবলীলায় থরে থরে উপস্থাপন করে চলেন। স্মরণ করা যেতে পারে 'সমুদ্র ও সাধারণ মানুষ' গল্পের কথা–যেখানে অধ্যাপক তারেক সহকর্মী শওকতের সাহেবের ওপর মনে মনে প্রচ বিরক্ত ও ক্ষিপ্ত। কেননা তার উপস্থিতের কারণেই সে বহুদিনের পুরোনো বন্ধু হারুণ ও হারুণের স্ত্রী বিবি-র সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারছে না, অস্বস্তিতে ভুগছে। তার মানসিক ক্রিয়ার রূপটি লেখক প্রত্যক্ষ মনোলগের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করছেন—'মেয়ে দ্যাখোনি, শালা, জীবনে। মেয়ের গন্ধ পেয়েছ কী আর পিছু ছাড়ছ না, চিনে জোঁকের মতো লেগে আছ। ...আমার বন্ধু, বন্ধুর স্ত্রী, তারা আমাকে বন্ধু হিসেবে নিয়ে যাবে তাদের সঙ্গে-সেখানে তুমি কে? এম্নি তো তোমার বিষয় বুদ্ধি টনটনে—কিন্তু এগুলো বোঝো না কেন? না, বোঝো ঠিকই, কিন্তু লোভে মেরেছে তোমাকে। আজ সকালে কেন এলাম না, সেটাও তোমার বোঝা উচিত ছিল—কিন্তু তুমি হারামজাদা। শয়তান।' অথচ শওকত সাহেবই তাকে নির্বান্ধব এই কক্সবাজারে, চাকরিতে যোগদানের পর থেকে তাকে সঙ্গ দিয়ে আসছিলেন।

মনোজগত বিশ্লেষণ ও বুননে মান্নান সৈয়দের সাফল্য যেমন তুঙ্গস্পর্শী, নিরীক্ষণশীলতায়ও তাঁর দক্ষতা দীপ্র আলোয় উদ্ভাসিত। তাঁর গল্পে বিষয়বস্তুর চমৎকারিত্ব ও বিচিত্রমুখী গল্পশরীর প্রথমাবধি আমরা প্রত্যক্ষ করি। 'মাতৃহননের নান্দীপাঠ'-এ নিজের মাকে হননপ্রত্যাশী চেতনা বা 'বান্দা' গল্পে মোল্লারূপী লোকটির নগ্ন উন্মোচন অথবা 'শুকতারা-সন্ধ্যাতারা'র বিষয়বস্তু যে কাউকেই বিস্মিত করবে। বা 'হোসেন মিয়ার সঙ্গে'র কথাই ধরা যাক। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের চরিত্রগুলো এবং স্বয়ং লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি চরিত্র হিসেবে হাজির এ গল্পে। লেখকের সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোর সাক্ষাৎ হওয়ার মতো গল্প অনন্যপূর্বই। আবার 'জীবনানন্দের অপ্রকাশিত গল্প' পড়তে পড়তে দ্বিধান্বিত হতে হয় এটি কি মান্নান সৈয়দের লেখা নাকি জীবনানন্দের দাশের! জীবনানন্দের গদ্যরীতির অবিকল ছাপ বিস্ময়ের সুরভি ছড়ায় গল্পটির প্রতিটি বাক্যে। আরো মনোনিবেশ করলে স্পষ্ট হবে, গল্পটি মূলত জীবনানন্দ দাশের জীবনেরই একটি খণ্ডচিত্র। আমরা জানি, সাংসারিক জীবনে তিনি সুখী ছিলেন না

এবং আত্মহত্যা নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগাতেন যার স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর ডায়েরিতেও। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, এ ধরনের নিরীক্ষাধর্মী গল্পের ক্ষেত্রে তিনি ঐতিহাসিক সত্যতাকে ভুলে যাননি। সেজন্যই দেখি, 'হোসেন মিয়ার সঙ্গে' মানিক বন্দোপাধ্যায়ের ভাইয়ের যে প্রেসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর ছোট ভাইয়ের বাস্তবেও 'উদয়াচল প্রিন্টিং এ্যান্ড পাবলিশিং হাউস' নাম প্রেস ছিল। আবার দেখা যায়, 'পদ্মানদীর মাঝিতে' যার যেরকম চরিত্রস্বভাব ছিল—এখানেও ঠিক সেভাবেই উপস্থাপন করা হয়েছে। গল্পের শেষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটভাই সুবোধকে খুঁজে পাওয়া যায় না। ভাইয়ের প্রেসে এসে কুবেরের কাছ থেকে জানতে পারে সুবোধ হোসেন মিয়ার সঙ্গে সন্ন্যাসীর কাছে গেছে। সংসারে আর ফিরবে না। ঠিক যেভাবে হোসেন মিয়া তার দ্বীপের জন্য লোক সংগ্রহ করত, সুবোধকেও সে সেভাবেই নিয়ে গেল। ইতিহাস বা কল্পইতিহাসনির্ভর গল্পগুলোয় সংস্কৃত ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করে পুরো আবহকেই তিনি বজ্রগম্ভীর ও প্রাচীন করে তোলেন। ফলে পাঠকও এর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গল্পের মেজাজ ও রসকে উপলব্ধি করতে পারে। তাঁর সাম্প্রতিক গল্প 'ভূমিকম্পের পর'এর গল্পশরীরে আকৃতিতে ছোট কিন্তু একটি স্বয়ংম্ভর প্রবন্ধ মিশিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু খেয়াল করলে দেখতে পাব, সে প্রবন্ধের বিষয়েও রয়েছে নতুনত্ব। এভাবেই তিনি নিরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গল্পকে বস্তুনিষ্ঠ করে তুলতে সক্ষম হন। পাশাপাশি এ ধরনের নিরীক্ষা কখনোই তাঁর গল্পের মর্মবস্তুকে ম্লান করে না।

গ্রন্থ থেকে গ্রন্থান্তরে

১. 'সত্যের মতো বদমাশ' (১৯৬৮) মান্নান সৈয়দের প্রথম গল্পগ্রন্থ। বের হওয়ার অব্যবহিত পরেই অশ্লীলতার দায়ে নিষিদ্ধ হয়। যেকোনো প্রকৃত ও গুরুত্বপূর্ণ লেখকের প্রাথমিক এবং অন্যতম প্রধান চারিত্র হচ্ছে শিল্পস্পর্ধা ও সার্বভৌম ভূমিখণ্ড তৈরি করে নিতে পারার দক্ষতা, যার মধ্য দিয়ে কাল থেকে কালান্তরে পাঠক তাকে আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারবে। আর সেই ভূমিখণ্ডের পলিরূপে কাজ করে স্বতন্ত্র ভাষাকাঠামো, চিন্তার অগ্রবর্তীগামিতা, উপলব্ধির বহুমাত্রিকতা ও তার নন্দনতাত্ত্বিক সৌকর্যশোভিত উপস্থাপন। সূচনা গ্রন্থেই মান্নান সৈয়দ এসব কিছু আয়ত্ত ও অর্জন করেছিলেন।

এ গ্রন্থের 'ভয়' গল্পের কথাই ধরা যাক। চিন্তাগত দিক থেকে এটি প্রথাবিরোধী গল্প এবং সমাজকে ক্রিটিক করা হয়েছে। কখনো প্রত্যক্ষ মনোলগ কখনো পরোক্ষ মনোলগের মাধ্যমে একজন আত্মহত্যাপ্রত্যাশী যুবকের ভাবনাকাঠামো এখানে উঠে এসেছে। আমাদের চিরপরিচিত 'কানা' 'বোবা' শব্দগুলোকে তিনি ভেঙে নতুন অর্থ সঞ্চার করেন। 'কানা' শব্দটি শুনলেই আমাদের মানসচোখে ভেসে ওঠে চোখে দেখতে পায় না এমন আর্তিমাখা কোনো মুখমণ্ডল। কিন্তু তিনি 'কানা' বলছেন তাকে, যে 'অনেক অবৈধ ও অনৈতিক দৃশ্য দেখেও দেখল না।' আর 'বোবা' বলতে বোঝাচ্ছেন তাকে যে 'মিথ্যাচারের, অপমানের, নিষ্ঠুরতার সম্মুখে মুখ খুলল

না।' গল্পের প্রধান চরিত্র তার রক্তের সম্পর্কের এক আত্মীয়ার সাথে শারীরিক সম্পর্কে যুক্ত হয়—ফলশ্রুতিতে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে, যা সমাজের চোখে মহাপাপ; অথচ আজ যাদের বিয়ে হচ্ছে তারা যথেচ্ছ পরিমাণে সন্তান জন্ম দিতে পারবে যেহেতু তারা পেয়ে গেছে 'শারীরিক কথোপকথনের সমাজসম্মতি' আর কেন্দ্রীয় চরিত্রের আসন্ন সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে বলা হবে 'হারামজাদা'। বারান্দায় বসে সে এসব কথা ভাবতে থাকে।

নায়ক আত্মহননের সিদ্ধান্ত নেয়, তাতে হয়তো সমাজ মনে করবে তার ভিতরে অনুশোচনা বোধ তৈরি হয়েছিল। আত্মহত্যা করতে যাবার জন্য সে যখন বারান্দা থেকে সিঁড়িতে পা রাখল তখন নায়কের ভাবনা লেখক লিপিবদ্ধ করছেন এভাবে—'একটি বিবাহের উৎসব হচ্ছে এখন। এক কুকুর তার আপাতপ্রেয়সীতে মগ্ন। একজন আত্মহত্যা করতে চলেছে। ...এবার এক ঘরের কোনো বাড়ির কথা ভাবো, শহরে তো এমন আছে : একই ঘরে বিবাহোৎসব রতিক্রিয়া আত্মহত্যা তিনটি দৃশ্য মিলে গেল : জীবন—সেই বাড়ির নাম রেখো।' ছোট পরিসরে হলেও প্রাজ্ঞ মেধাবী দার্শনিকের মতো জীবনের এই দ্বৈরথ ও বৈপরিত্যকে পাশাপাশি ফ্রেমবন্দী করার এই প্রবণতা সঙ্গত কারণেই স্মরণযোগ্য। গল্পের একদম শেষে সে বিশাল গাছটার দিকে এগোয় এক হাতে সাপের ভয়ে হারিকেন নিয়ে—এ জন্যই যে সে তো আসলে বাঁচতেই চেয়েছিল, আরেক হাতে দড়ি, মানুষের ভয়ে বা সমাজের ভয়ে, যা তার আত্মহনন উদ্যোগের পেছনের একমাত্র কারণ।

এ বইয়ের অধিকাংশ গল্পে দেখা যায় কেন্দ্রীয় চরিত্র কোনো না কোনো বা কোথাও না কোথাও যাত্রা করতে উদ্যোগী—হোক তা আত্মহত্যা বা মাকে হত্যা অথবা ঘরে ফেরা অথবা নতুন বাসায় উঠতে যাওয়া। 'অধঃপতন' গল্পের প্রধান চরিত্র, তরুণ, পেশায় যে অধ্যাপক বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশে যাত্রা করে—এ যাত্রা অধঃপতনের অভিমুখে। তার এ যাত্রা বিবেক থেকে নিজেকে সরিয়ে আকাঙ্ক্ষার কাছে সমর্পণের। সে কারণেই 'বিবেক নামক মহাশয়ের' ভয়ে তটস্থ হয়ে যে সকল কাজ কখনো সে করেনি সেগুলোই করা আরম্ভ করল। রাস্তায় বেরিয়ে নিঃসঙ্কোচে মেয়েদের দেখল, সিনেমা হলে শিষ দিলো, পতিতার সঙ্গে বিছানায় গেল, মদ খেয়ে মাতাল হলো; যেসব কাজ সে কয়েকদিন আগেও কল্পনা করতে পারেনি। একটি সংবাদ তার সবকিছুকে পাল্টে দিয়েছে। ডাক্তারের কাছ থেকে সে জানতে পারে তার জীবনের আয়ু আর মাত্র এক বছর বাকি। তখন সে উপলব্ধি করে 'সমস্ত সুখের চেয়ে জীবন বড়, সমস্ত দুঃখের চেয়ে জীবন বড়...।' নিজের আসন্ন মৃত্যু তার ধ্যান-ধারণাকে, জীবনে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলে দেয়। এতদিনের অবদমিত আচরণগুলো উগরে দিতে থাকে নির্দ্বিধায়। সার্ত্র বলেছিলেন—'মৃত্যু আমাদের স্বাধীনতায় শুধু বাধাই সৃষ্টি করে না, বরং অস্তিত্বেরই বিলুপ্তি ঘটায়।' আর এখানে মৃত্যুর মাধ্যমে তার বিলুপ্তি ঘটবে এই ভাবনাই তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় একমাত্র নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। সমাজ অনুশাসিত রীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে মুক্ত সত্তায় পরিণত করে এবং মাতাল হয়ে বমি করতে করতে বলে

'...আমি যতদিন বাঁচি ততদিনের মধ্যে এতকাল-সঞ্চিত সম্ভ্রান্তির ভ্রান্তিময় সম্পদসকল হারিয়ে ফেলার চেষ্টা করব।'

'মাতৃহননের নান্দীপাঠ' ষাটের দশকের তীব্র আলোড়ন সৃষ্টিকারী গল্প। প্রশংসার পাশাপাশি বিতর্কও কম হয়নি। বিষয়ের অভিনবত্ব, চিন্তার দ্যুতি সবসময়ই তাঁর গল্পের বৈশিষ্ট্য। এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আতিকুল্লাহ মায়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, তাকে খুন করতে আগ্রহী। কিন্তু যেহেতু সে যুক্তিবাদী তাই মাকে খুন করতে চাওয়ার পিছনে একটি জুতসই 'কারণ' সে দাঁড় করাতে চায়। ঘটনার প্রবাহ থেকে ছেঁকে এই 'কারণ' খুঁজে বের করার প্রক্রিয়াই গল্পটির অন্তর্বস্তু। মায়ের অতিরিক্ত স্নেহে ও খবরদারিতে সে অতিষ্ঠ এবং মানসিকভাবে দলিত-মথিত। কিন্তু শুধু এ জন্যে সে হত্যা করতে পারে না। কারণ সে জানে মা একমাত্র তাকেই ভালোবাসে। স্বামী মারা যাবার পর একমাত্র আতিকুল্লাহর জন্যেই তিনি নতুন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি। এতে তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারত।

এর কিছুকাল পরে তাদের বাসায় একজন ভদ্রলোক প্রায়শই আসা-যাওয়া শুরু করেন এবং আচার-আচরণে স্পষ্ট হয়—তার সঙ্গে মায়ের ভালোবাসার একটি সম্বন্ধ রচিত হয়েছে। দর্শনের মেধাবী ছাত্র আতিকুল্লাহ, যে ইতোমধ্যে ফ্রয়েড পাঠ করেছে, ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব দ্বারা তার মায়ের ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে তাকে সেভাবে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারে না। অথচ এ ঘটনায় সে তীব্রভাবে ঘৃণা, বেদনা ও আক্রোশে ফেটে পড়েছে। এসময় তার একটি চোখ উন্মীলিত হয়ে যায়। নিজেকে সে আর দশজন থেকে আলাদা বা অস্বাভাবিক মনে করত। কিন্তু এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে আর দশজন যেভাবে ক্ষুব্ধ হয়, সেও তাই করেছে। সে অনুধাবন করতে পারে 'প্রবৃত্তির মোড় ফেরাবার ঘণ্টা বাজানোর সামান্যতম শক্তিও নেই তার। আসল কথা, মানুষের মৌল কয়েকটি রাস্তা আছে, একই কারণ, একই রাস্তা দিয়ে তোমাকে বয়ে নিয়ে যাবে, যেখান থেকে মুক্তি নেই কারো—আসলে মানুষ উপরে-উপরে যদিও পাশা খেলার ছক নয় ভিতরে-ভিতরে তবু সে এক গভীরতর অঙ্ক, যে অঙ্কের বঙ্কিম পদ্ধতি কেউ জানলো না, যে নিয়ম মানলো না কোনো সিঁড়ি।' নিজের অস্বাভাবিকত্ব থেকে সাধারণ্যের কাতারে শামিল হবার মধ্য দিয়ে সে এতদিনের আরাধ্য 'কারণ' খুঁজে পেল। ফ্রয়েড বলেছিলেন 'Ego is not master in his own house.' প্রবৃত্তিচালিত Id এবং যুক্তিশাসিত Ego-র মধ্যে দ্বন্দ্ব সবসময়ই চলতে থাকে, আমাদের মনের ভিতরে। ঘটনার গম্ভীর মেঘ ছাড়াই যুক্তি ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বমুখর চেতনার এমন বহুমাত্রিক বিন্যাস বাংলা ছোটগল্পে বিরল।

বারোটি গল্পের মধ্যে আমরা যুক্তির প্রতি অঙ্গীকার, অস্তিত্বকামী মানস, ব্যক্তির মনস্তাপ, আত্মজিজ্ঞাসা, অন্তর্কলহ, কামনা-বাসনা, শূন্যবোধ, অপ্রাপ্তি, অস্তিত্বের বিসর্জন প্রবৃত্তির উল্লাস প্রভৃতি বহুমুখী প্রান্তকে স্পর্শ করবার সাহস প্রত্যক্ষ করলাম। লক্ষণীয় যে, 'সত্যের মতো বদমাশ'-এ যৌনতার-কামনার-বাসনার কথা থাকলেও সমাজবাস্তবতা যেমন অনুপস্থিত তেমনি প্রেমের আখ্যানও অনুপস্থিত।

অথচ তারপরও জীবনের অজস্রতার যেন কোনো ঘাটতি পড়ে না। তাঁর গল্পগুলোর বিষয় অভিনবত্ব, সেটি তো রয়েছেই, ভাবনার বহুত্ব, গল্পনির্মিতির মুক্তিয়ানা, একান্ত আপন সময়ে মানুষের চিন্তনপ্রক্রিয়া, দ্বিধাগ্রস্ততা, মনোকলহ ইত্যাদির অবিকল অনুবাদ–সব মিলিয়ে প্রাবন্ধিক সৈয়দ আবুল মকসুদের সঙ্গে একমত হয়ে বলা যায় 'সত্যের মতো বদমাশ' আমাদের গল্পভুবনের একটি স্থায়ী মাইলস্টোন।

সত্যের মতো বদমাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং পুনর্মুক্তি

১৯৬৮ সালে প্রকাশের পরপরই পাকিস্তান সরকার কর্তৃক 'সত্যের মতো বদমাশ' নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কারণ হিসেবে দেখানো হয়—অশ্লীলতা। বইটির 'বান্দা' গল্পে যৌনপ্রত্যঙ্গসংক্রান্ত গালিসহ খোলামেলা অনেক কথা রয়েছে। 'দণ্ডিত খেলোয়াড়ে'র বিষয়বস্তুও হয়তো তাদের চোখে 'অশ্লীল' লেগেছিল। নাকি 'সত্যের মতো বদমাশ' এ নামটিই তাদের মনে ভীতির সঞ্চার করেছিল? চরিত্রপাত্রের মনোবিশ্লেষণে দস্তয়েফস্কির অনুবর্তী হলেও শব্দ ব্যবহারের শুচিবায়ুগ্রস্তহীনতার দিক থেকে তিনি অনেকটাই ডি. এইচ. লরেন্সের নিকটবর্তী। বাংলাদেশে অদ্যবধি 'সত্যের মতো বদমাশ'-ই একমাত্র নিষিদ্ধ হওয়া গল্পগ্রন্থ। এমনকি বিশ্বের অন্যান্য দেশেও হাতেগোনা কয়েকটি গল্পগ্রন্থ নিষিদ্ধ হয়েছে। বইটি নিষিদ্ধ হওয়ার পর তাদের ভিতরে এর প্রতিক্রিয়া ও পুনর্মুক্তি প্রসঙ্গে তাঁর প্রিয়তম বন্ধু আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ 'ভালোবাসার সাম্পান' গ্রন্থে বিস্তারিত স্মৃতিচারণ করেছেন। *কণ্ঠস্বরগোষ্ঠী* তাঁর বাসায় একত্রিত হয়েছিলেন কিভাবে নিষেধাজ্ঞার খড়্গ তোলার ব্যবস্থা করা যায় সেজন্য। বইটি নিষিদ্ধকরণের 'মূল হোতা'র কাছে গিয়ে তাকে বোঝানো সত্ত্বেও তিনি তার সিদ্ধান্তে অনড় থাকলেন। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ জানাচ্ছেন, উল্টো, 'সাহিত্যে অশ্লীলতা কী সে-ব্যাপারে আমলা মহোদয়ের কাছ থেকে বিশদভাবে আলোকিত হয়ে আমি ফিরে এলাম।'

বইটির পুনর্মুক্তিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন লেখকের বন্ধু অধ্যাপক আতাউর রহমান খান। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে এক সাংসদকে তিনি বইটির ওপর নিষিদ্ধাদেশ তুলে নেয়ার ঘোষণা দেওয়ার জন্য রাজি করান। ঢাকা স্টেডিয়ামের নিচতলায় 'প্যাপিরাসে'র সামনে বিভিন্ন লেখকের উপস্থিতিতে বইটির ওপর নিষিদ্ধাদেশ তুলে নেয়ার ঘোষণা পাঠ করেন সেই সাংসদ স্বয়ং।

২. 'চলো যাই পরোক্ষে' (১৯৭৩) তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ। বইটি উৎসর্গ করেছিলেন 'সত্যের মতো বদমাশ গল্পগ্রন্থের চরিত্রদের উদ্দেশে'। এ উৎসর্গ একই সঙ্গে যেমন লেখকের মনোবেদনার চিহ্ন বহন করে (যেহেতু বইটি নিষিদ্ধ হয়েছিল), আবার সেই চরিত্রগুলোকে সম্মান জানানোর মধ্য দিয়ে নিষেধাজ্ঞা ঘটনার প্রতিবাদ হিসেবেও দেখা যায়। প্রথম গল্পগ্রন্থের মতো এখানেও কাহিনীর বাগাড়ম্বরতা নেই; আছে তাঁর গল্পের কেন্দ্রীয় প্রবণতা মনোবিশ্লেষণ ও তার বিস্তারসঞ্চারী উপযুক্ত

সংস্থাপন। তবে এখানকার দশটি গল্পই তীব্রভাবে প্রতীকাশ্রয়ী এবং মূলত অচেতনকে অনুসন্ধানের জন্যই প্রতীকীসংশ্লেষের ব্যবহার করেছেন। অচেতনের ছিপি খুলে দেয়া মনোজগতের আখ্যান পাশাপাশি পরিবেশে বা আবহের নিপুণ মিশোল দেখতে পাওয়া যায় এ গ্রন্থে, যা আগের বইতে ছিল না। ফলে গল্পগুলো নতুন মাত্রা পেয়েছে।

একেকটি সম্পর্কজালে মানুষ একেক ধরনের আশ্রয় খুঁজে ফেরে বা খুঁজে পায়। 'একটি আয়না নিয়ে' গল্পের নায়কের কাছে আয়নার মতো জড়বস্তুও একটি বিশেষ ঘটনার অভিঘাতের পর থেকে তার আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। আয়নার সম্মুখে সে যেভাবে আত্মোন্মচন করতে পারে অন্য কোথাও বা কারো সামনে তা পারে না। আয়না নিয়েই সে চলাফেরা করে, আয়নাতেই ডুবে থাকে। আয়নাটি তাই তার 'সত্তার অংশ'। একদিন হঠাৎ একজন অপরিচিত লোক এসে তাকে অন্য এক জায়গায় নিয়ে যায় যেখানে বেশ কয়েকজন লোক মিলে তাকে আয়না সম্পর্কে জেরা করে। এক ভদ্রলোক বলেন, 'জানেন, আপনি কত বড় অপরাধ করেছেন—কত বড় সামাজিক অপরাধ?' তারা আয়নাটি মেঝেতে ছুঁড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে আর সে লুকিয়ে একটা টুকরো পকেটে ফেলে। কেননা 'আয়না ছাড়ার আমার কিছুতেই চলবে না, আয়নার একটা টুকরোই তো সম্পূর্ণ আয়না।' ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার সঙ্গে সমাজ বা রাষ্ট্রের সংঘাত অনিবার্য। রাষ্ট্রযন্ত্র সামাজিক নিরাপত্তার নামে নানা বিধি নিষেধ আরোপ করে ব্যক্তির উপর। অনেক ক্ষেত্রেই এতে ব্যক্তির নির্দোষ অভিলাষ ও বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। ব্যক্তি অস্তিত্ব সংকটে পড়ে। 'আয়নার একটা টুকরোই তো সম্পূর্ণ আয়না' অর্থাৎ একজন মানুষ, সে নিজেইতো স্বয়ম্ভর সত্তা, সম্পূর্ণ। এরকম একেকজন স্বয়ম্ভর মানুষের সমন্বয়েইতো একটি পুরো সমাজ (বা আয়না) তৈরি। খুবই সামান্য ও তুচ্ছ একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ থিমের শিল্পিত প্রকাশ আমরা এখানে দেখতে পাই।

'জলপরি' গল্পে আমরা প্রথম মান্নান সৈয়দের কাছ থেকে প্রেম বা ভালোবাসার গল্প পেলাম। যদিও ভালোবাসাটা ছিল একতরফাই। কারণ নায়কের জবানি থেকে আমরা জানতে পারি—'আমার আচরণে তার প্রতি আমার মনোভাব হয়তো একটু স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেত। কিন্তু শম্পার ব্যবহারে লুকোনো কিছু না থাকলেও কোথায় যেন একটা আড়াল থাকত, সে নিজেকে কিছুতেই আবেগে ভাসিয়ে দিত না, কোথায় একটা শাসন থাকত তার—কিন্তু 'শাসন' শব্দটি এখানে যথাযথ প্রযোজ্য হচ্ছে না, তার ব্যবহারে এমন একটি সহজতা ছিল যেখানে শাসন কথাটি সুপ্রয়োগ নয়, অথচ দূরত্ব ছিল।' শম্পার বিয়ে হয়ে যায় এক ধনীর সঙ্গে। বিয়ের পরেও শম্পার স্বামীর বাড়িতে সে যাতায়াত শুরু করে, গল্পগুজব করে। শম্পার স্বামীও তাদের আড্ডায় শরিক হন। কিন্তু তার ঘন ঘন আগমনে একদিন শম্পার স্বামী ক্রুদ্ধ হন এবং তাকে অপমান করে বের করে দেন। নায়ক শম্পার দিকে তাকিয়ে দেখে 'তার মুখে ভাবান্তর নেই, নিঃশব্দে উল বুনে চলছে সে।' বারবার চেষ্টা করেও তাকে ভুলে যেতে ব্যর্থ হয়। সে ভাবে 'আমি আমার পরিচিতদের

মতোন যদি বারবার ভালোবাসতে পারতুম গভীরতম ভালো না বেসে, তাহলে বোধ হয় বেঁচে যেতুম।'

এক রাতে, অচেতন মনের টানেই হয়তো, সে শম্পাদের বাড়ির পিছনে, লেকের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সেখানকার পানিতে ওদের আলোজ্বলা বাড়ির প্রতিফলিত অবয়ব স্পষ্ট দেখা যায়। তারপর—'খুব সাবধানে নামলাম পানিতে, একটুও ঢেউ না দিয়ে। যাতে লেকের পানির ভিতরের শম্পাদের বাড়ি কিছুতেই না ভেঙে যায়। ডুব দিলাম তারপর। এক ডুব দিয়ে শম্পাদের পানির ভিতরের বাড়ির দরোজায় ঘা দিলাম। দরোজা খুলে গেল। শম্পা বসে আছে। আর কেউ নেই। শম্পাকে আমি পেলাম। ...এমনিভাবে তাকে আমি বারে-বারে পাই।' ভালোবাসার মানুষকে না পাওয়া এবং তার ফলশ্রুতিতে এমন আকুলতা আমাদের মধ্যে খুব একটা দুর্লক্ষ্য না হলেও গল্পের শেষে এরকম পরাবাস্তবিক ম্যানিফেস্টেশন আমাদেরকে বিহ্বল করে। অন্যদিকে, শম্পাকেও কোনোক্রমে দোষারোপ করা যায় না কেননা সে তো নায়ককে ভালোবাসে এমন কথা কখনো বলেনি বা তার আচরণ থেকে তা বের হয়ে আসেনি।

'চলো যাই পরোক্ষে'র প্রায় প্রতিটি চরিত্রই গল্পের শেষে যে অদ্ভুত পরিস্থিতিতে পড়েছে তার সঙ্গে তাদের মানসিক উদ্বেগ-ভয়-উৎকণ্ঠা-অপ্রাপ্তির সরাসরি সম্বন্ধ রয়েছে। 'গতবৃষ্টি' গল্পে সার্জেন্ট আজিম বৃষ্টিস্নাত এক 'হাওয়ার রাতে, আঁধারের রাতে' ডিউটিতে বের হয়েছে রাস্তায়। হাঁটতে হাঁটতে তার জাহানারা নামধারী শ্যামসুন্দর একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে যাকে সে পছন্দ করত। 'আজকের রাত সেই শ্যামলীর মুখ হয়ে উঠতে চাচ্ছে যেন।' এসব চিন্তা বাদ দিয়ে সে তার কাজে মনোযোগ দেয়। চারপাশ একদম ফাঁকা, তার অধীনস্থ দুজন নিযুক্ত সিপাই তাদের কেউ নেই। কিছুদূর হাঁটার পর সহসা চমকে উঠল আজিম–'দূরে অন্ধকারের ভিতর একখণ্ড শাদা আভাসের মতোন একটি ছায়ামূর্তি দেখা গেল যেন।' সে মনে মনে ভাবে 'এখন, এত রাত, ঠাণ্ডা হাওয়ার কালোরাতে সবাই যখন ঘরের দরোজা লাগিয়ে ঘুমোচ্ছে তখন এ ব্যক্তিটি নিশ্চয়ই সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বেরোয়নি রাস্তায়।' তাই সে তাকে ধাওয়া করে। কিন্তু এ গলি-ও গলি, এ রাস্তা-ও রাস্তা তার পিছু পিছু দৌড়েও তাকে ধরতে পারে না। যে ছায়ামূর্তির পিছনে সে এত রাতে ছোটে, বলাই বাহুল্য, তা তার ইল্যুশন। জাহানারার স্মৃতি ভুলতে না পারায়, অচেতন মনের প্রণোদনায় গম্ভীর রাতের আবহে সে ভ্রান্তিতে পড়ে। শুধু 'গতবৃষ্টি' নয়, প্রায় প্রতিটি গল্পেই যে প্রতীকের আশ্রয় নেয়া হয়েছে সেই প্রতীকগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব চরিত্রপাত্রের অচেতন মন কিভাবে চেতনকে নিয়ন্ত্রণ করছে। 'শেষ বাস', 'এক সন্ধ্যা,' 'এক রাত্রি', 'ঝড় ও দরোজা' প্রতিটি গল্পের জন্যই একথা প্রযোজ্য। আবার 'সাপ' গল্পে 'সাপটা আমাকে জীবন্ত সম্পূর্ণ গিলে ফেলল।' এই বাক্যের মধ্য দিয়ে যখন গল্পটি শেষ হয় তখন সাপ শুধু বস্তুসাপ হয়ে থাকল না বরং নায়কের সহকর্মীদের কূটচাল-ভণ্ডামির প্রতীক হয়ে উঠল। জর্জ এলিয়ট বলেছিলেন 'Conclusions are the weak points of most authors.' কিন্তু মান্নান সৈয়দের বেশীরভাগ গল্পের পরিসমাপ্তিগুলো দুর্দান্তভাবেই সফল।

এ গ্রন্থে 'চলো যাই পরোক্ষে' নামে কোনো গল্প না থাকলেও প্রত্যেকটি গল্পের মর্মবস্তু পরোক্ষের বা মনের অভ্যন্তরীণ গতিপথকে কেন্দ্র করে। কোনো কোনো গল্পে কাব্যিকতাও ঝলক দিয়েছে, কিন্তু তাতে গল্পের সঘনবদ্ধব্যাপ্তি ঝুলে যায়নি। 'সত্যের মতো বদমাশের' মতো যৌনতার ব্যবহার এখানে একেবারেই অনুপস্থিত। তারপরও অর্ন্তজগত, রাত্রির-অন্ধকারের যথোপযুক্ত ব্যবহার, পরাবাস্তবিকতার বিচ্ছুরণ, প্রতীকতা এখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে আর এসবের সুসংবদ্ধ ব্যবহার করে প্রকৃত গল্প করে তোলেন।

৩. 'মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা'-য় (১৯৭৭) এসে মান্নান সৈয়দ বর্হিজগতকে আলিঙ্গন করলেন। এর আগের দুটি গ্রন্থে আমরা দেখেছি কাহিনী কখনোই মুখ্য ছিল না, ব্যক্তির মনোজগতের বিস্তারের জন্য যতটুকু ঘটনার বর্ণনা প্রয়োজন ততটুকু দেখেছি। কিন্তু এ গ্রন্থে মনোজগতের সমান্তরালে কাহিনীময়তাও গুরুত্ব পেয়েছে। সবগুলো গল্পই বাস্তবতার পাটাতনের উপর ভিত্তি করেই রচিত। নিম্নবিত্তের জীবনসংগ্রাম, দারিদ্র্যও এসেছে এখানকার গল্পে ('রুপোলি খুন', 'বাঘ', 'মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা') কিন্তু বাস্তবতার করাঘাতে মনের যে প্রবাহমানতা ভিতরের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, ক্ষোভ ও প্রতিবাদ বা নিয়তিচেতনাই এ গ্রন্থের মূল সুর। 'রুপোলি খুন', 'দর্পনে অগ্নি দেখে', 'সর্বশক্তিমান', 'বাঘ', 'শুকতারা-সন্ধ্যাতারা', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'শিকার' ইত্যাদি প্রত্যেকটি গল্পই একটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও বন্ধুরতাকে ধারণের এ প্রচেষ্টা চোখে পড়ার মতো। আবার বিভিন্ন গল্পে সিলেট, কুমিল্লা, খুলনা ইত্যাদি অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার গল্পগুলোর বাস্তব ভিত্তিভূমিকে শক্তিশালী করেছে।

রিজিয়া, 'মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা' গল্পের প্রধান চরিত্র, মধ্যবয়সী এক মহিলা। পরিবারের মধ্যে সেই একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। সীমাহীন কষ্ট করে হলেও সে সংসারটাকে টিকিয়ে রেখেছে, ছোট দুই ভাইকে পড়ালেখা শিখিয়েছে। সংসার চালানোর পিছে ছুটতে ছুটতে বিয়েও করা হয়ে ওঠেনি তার। ছোটভাই হাবিবের জন্য যখন তারা মেয়ে দেখতে যায় আনন্দের পাশাপাশি তীক্ষ্ম ঈর্ষাও তাকে আঁকড়ে ধরে—'যেন হঠাৎ নিজের ব্যর্থ কুমারী জীবনের কথা মনে পড়ে গেল তার।'

তারপরও নতুন বধূকে সে আপন করে নিয়েছিল নিজস্ব ঔদার্যে। হাবিব ও তার স্ত্রীর জন্য নিজের ঘর পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিল। বিয়ের কিছুদিন পরের ঘটনা। নতুন বৌ তার বাবার বাড়িতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, ঠিকঠাক মতোই চলছিল সবকিছু কিন্তু হঠাৎ সে তার সোনার হারটা খুঁজে পায় না। রিজিয়াকে সেটি জানাতেই সে বিষয়টি মজা করে উড়িয়ে দেয় আর বলে, ক'দিন পর তো আসছোই, তখন নিও। কিন্তু বৌ গোঁ ধরে হারটা তখনই দিয়ে দিতে বলে। রিজিয়া নিজের জীবনের কোনো সুখ-আহলাদের প্রতি কখনোই তাকায়নি, সংসারের সকলকে শুধু একতরফা দিয়েই গেছে, সবার এরকম আচরণে তার হাসিখুশি মুখ দপ করে নিভে

যায়। জীবনের বাস্তবতা এরকমই। যে দায়িত্ব পালন করে তাকেই সবসময় সবকিছু করে যেতে হয়, যে দিয়ে যায় তাকেই সবসময় আত্মত্যাগ করতে হয়; সামান্য ব্যত্যয় হলে তাকেই ভুগতে হয় যন্ত্রণায়। রিজিয়া রাগে-ঘৃণায় হারটি গলা থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে আর বলে 'ছোটলোক কোথাকার'। এই ক্রোধোক্তি শুধু বৌয়ের প্রতি নয় একই সঙ্গে তার পুরো জীবনের ত্যাগ-বিসর্জনের কোনো মূল্য না পাওয়ার এবং তার মানসিক অবস্থাকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হওয়া ভাই ও মায়ের প্রতিও। এর মধ্য দিয়েই যেন রিজিয়ার পুরোজীবনের দুঃখগুলো আমাদের চোখের সামনে দিয়ে চলচ্চিত্রের মতো ভেসে গেল।

'শিকার' গল্পে হারুন ও তার স্ত্রীর সঙ্গে হারুনের অতিথি, বন্ধু ফরহাদ পাখি শিকারে বের হয়। পাখির সন্ধানে তারা অনেক দূর হেঁটে পার হচ্ছে। এদিকে ফরহাদ আসার পর থেকেই হারুনের অন্য রূপ দেখতে পায় তার স্ত্রী জাহানারা। ফরহাদের প্রতি হারুনের ঈর্ষাকাতর স্বভাব তার সামনে নগ্নভাবে ধরা দেয়। হারুন কথাচ্ছলে ফরহাদকে অপমানিত করে যা হয়তো ফরহাদ ধরতে পারে না বা পারলেও চেপে যায়। এতে জাহানারা মনে মনে ক্ষুব্ধ হয় এবং ফরহাদের প্রতি তার একধরনের মুগ্ধতা জেগে ওঠে। ফেরার পথে ফরহাদ তীরের অল্প পানির ভিতরে হাঁটতে থাকা একটি বককে নিশানা করে গুলি ছোঁড়ে। কিন্তু বকটা উড়ে চলে যায়। হারুণ ফরহাদের ব্যর্থ নিশানায় হো হো করে হেসে ওঠে যেন তারই বিজয় হয়েছে। ফরহাদ বলে 'গুলি বকটার গায়ে লাগেনি ঠিকই, কিন্তু ওখানে গেলে দেখতে পাবে কয়েকটা পালক পড়ে আছে।' এই উক্তিকে একেবারে সোজা-সাপটা হিসেবে দেখলেও হয়তো চলত। কিন্তু বিকল্প পাঠেরও সুযোগ আছে। ফরহাদ আসার কারণে জাহানারার মনে হারুন সম্পর্কে পূর্বে যে দ্বিধাহীন সুমনোভাব দানা বেঁধেছিল তা কিছুটা হলেও হোঁচট খায়। এই পরিবর্তনটুকুকেই ফরহাদ 'কয়েকটি পালক পড়া'র সঙ্গে তুলনা করে এমন আয়রনিক মন্তব্য করেছে।

৪. মান্নান সৈয়দ নিজের তৈরি করা ধারাকে নিজেই ভেঙেছেন, নতুন করে সৌধ গড়েছেন। বুঝতে অসুবিধা হয়না যে, তাঁর তৃষ্ণাকাতর অতৃপ্ত লেখনিশক্তি তাকে একেকবার একেক পথে নিয়ে যায়। 'উৎসব' (১৯৮৮) গ্রন্থে তিনি সম্পূর্ণ নতুনভাবে আবির্ভূত হলেন। ইতিহাস ও কল্পইতিহাস-আশ্রয়ী এ গল্পসংকলন শুধুমাত্র রাজা-বাদশাদের কাহিনীর বয়ান নয়। সংস্কৃত শব্দাধিক্যের ঝংকারে গল্পের পুরো আবহই হয়ে ওঠে প্রাচীন। কিন্তু এসব গল্পের অন্তর্বস্তু চিরকালীনতাকেই ধারণ করে। রাজাবাদশাদের কাহিনী বহিরাবরণ মাত্র। গল্পগুলোয় যৌনতার বাঁধনহারা উদ্দামতা যেমন দেখি, গৌতম বুদ্ধের মতো দার্শনিককেও চরিত্র হিসেবে পাই যিনি জগৎসংসারের এ ঘটনাপ্রবাহকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। সৌভাগ্যের বিষয় মান্নান সৈয়দ কোনো গল্পেই moral judgement দেননি।

রাজনীতিবিমুখতা মান্নান সৈয়দের স্বভাবজাত। কিন্তু 'রাজা' গল্পটি রাজনৈতিকই। এরকম গল্প তিনি আগে-পরে লেখেননি। গল্পে এক রাজার মৃত্যু

হয়েছে। জনসাধারণ একে স্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবে জানলেও সেটি ছিল মূলত হত্যা। বর্তমানে যিনি রাজা হিসেবে অধিষ্ঠিত, সে-ই রাজার কাছের লোকজনকে দিয়ে তার ওষুধের ভিতরে বিষ মিশিয়ে তাকে হত্যা করান। ক্ষমতার রয়েছে একটি নিজস্ব স্বভাবধর্ম। তাই সে স্থানে যে আরোহণ করে তার ভিতরেও সেই বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত হয়। যদিও মিশেল ফুকো বলছেন, ক্ষমতা শুধু প্রতিষ্ঠান বা কোনো কাঠামো নয়। ক্ষমতা সর্বত্রই উপস্থিত এবং তা সবসময়ই সৃষ্টি হচ্ছে। নতুন রাজার যতটুকুও শুদ্ধতা ছিল তাও তিনি হারালেন ক্ষমতার বসে। যে জলপ্রপাতের পাশে বসে যুবক রাজা একসময় পাখির কলকাকলি শুনে পুলকিত হতেন, তার নির্দেশে সেই জলপ্রপাতের চূড়া থেকেই দুজন দাসীকে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হলো। আস্তে আস্তে দেখা গেল বিগত রাজার মতো সেও নিষ্ঠুর হয়ে উঠল, রাজ্য পরিচালনায় চলে আসল ঢিলেঢালা ভাব বরং রমণী প্রমোদে মেতে উঠল সে। কিছুদিন যেতে না যেতেই তাকেও পূরাতন রাজার পরিণত মেনে নিতে হয় এবং তার হত্যাকারীও সেই বর্ষীয়সী রমণী যার সঙ্গে পরামর্শ করে পূর্বতন রাজাকে হত্যা করা হয়েছিল। ক্ষমতা ও রাজনীতিকেন্দ্রিক এই পটপরিবর্তন ও কাছের মানুষের প্রতারণা শুধু সামন্ত যুগের বিষয় নয়। গণতন্ত্রের আলোয় সমুজ্জ্বলিত দেশগুলোতেও বিশেষত উপমহাদেশীয় প্রেক্ষাপটে এরকম নৃশংসতা ও কাছের মানুষের প্রতারণা এখনো নির্মম বাস্তব।

'চোখ' গল্পে চঞ্চলার জন্য নগরের শ্রেষ্ঠ পুরুষ (বাগ্মী, কবি, ভাস্কর, চিত্রকর, বণিক) থেকে শুরু করে সাধারণ পুরুষ সকলেই পাগলপ্রায়। কিন্তু সকলে লক্ষ্য করলো একমাত্র দার্শনিকই কখনো তাকে আকাঙ্ক্ষা করেনি। কবি উৎসাহের সঙ্গে বলে, 'চঞ্চলা আজ রাত্রেই তার নৈঃশব্দ্য, গাম্ভীর্য, কৌমার্য, একাকিত্ব ভঙ্গ করবে।' চঞ্চলা সেই রাতে একেবারে স্বচ্ছ পোশাকে দার্শনিকের গৃহে গমন করে। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে, তাকে আলিঙ্গন করতে করতে বলে 'আমি চঞ্চলা, এই নগরের বাররমণীদের শ্রেষ্ঠা।' কিন্তু দার্শনিক 'এক-খণ্ড শীতল নিস্তাপ রক্তহীন পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।' চঞ্চলা কাতরকণ্ঠে তাকে গ্রহণ করার অনুরোধ জানায় এবং আবার আলিঙ্গন করে। কিন্তু তাতেও দার্শনিকের ভাবাবেগ হয় না। বন্ধন ছাড়িয়ে সরে দাঁড়িয়ে চঞ্চলার ব্যর্থতায় ন্যুব্জ হওয়া মনোভাবকে উপলব্ধি করে বলে, 'আমি তোমার অসামান্য সুন্দর শরীরের ভিতরের কঙ্কাল যে দেখতে পাচ্ছি। আমি কী করব? আমি কী করব? আমি নিরুপায়।' দার্শনিক যেন দেহাতীত সত্যকে জেনে ফেলেছে, দেখে ফেলেছে। তাই চঞ্চলার সুন্দর দেহও তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়, ঠুনকো হয়ে দাঁড়ায়।

৫. 'নেকড়ে হায়েনা আর তিনপরী (১৯৯৭) ও 'মাছ মাংস মাৎসর্যের রূপকথা' (১৯৯৮)-র বেশিরভাগ গল্প পড়লে বোঝা যায় এই গল্পগুলো ষাট, সত্তর কিংবা আশির দশকের গল্প নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি গ্রন্থে যে বিবর্তন আমরা মান্নান সৈয়দের গল্পে পেয়ে আসছি এখানেও তার ছাপ স্পষ্ট। শাহরিকতার গন্ধ বা শহুরে উপাদানগুলো এখানে আরো প্রবলভাবে উঠে এসেছে। ফ্ল্যাটবাড়ির সংস্কৃতি বা

'গার্লফ্রেন্ড', 'প্রস' শব্দের ব্যবহার সমসাময়িকতাকেই লিপিবদ্ধ করে। গল্পগুলোর মনোবিশ্ব আবিষ্কার মূলত সামাজিক বা অর্থনৈতিক সংকটকেন্দ্রিক। চরিত্রগুলোও মধ্যবয়সী বা পঞ্চাশোর্ধ্ব; লক্ষণীয় মান্নান সৈয়দের বয়সও ততদিনে পঞ্চাশোর্ধ্ব। জীবনের অনেক দূর পেরিয়ে এসে অপ্রাপ্তির নির্মম রৌদ্র যেভাবে পুড়িয়ে মারে, চিৎকার করেও যেসব কথা বলা যায় না, কিংখাবে মোড়ানো স্মৃতিগুলো গলগল করে আসে তার খণ্ড খণ্ড উদ্ভাসন দেখা যায় এ দুটি গ্রন্থে।

আখ্যান বর্ণনার ক্ষেত্রে মান্নান সৈয়দ অধিকাংশ সময়ই মুক্ত অপ্রত্যক্ষ মনোলগকে অবলম্বন করেছেন। ফলে দেখা গেছে তাঁর চরিত্রগুলো আবেগের স্রোতে ভেসে যায়নি। 'আবদুল হাফিজ : জীবন ও সাহিত্য' গল্পেও তিনি এ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। গল্পের প্রধান চরিত্র লেখক আবদুল হাফিজ। সে একেকবার একেকজনের কাছ থেকে অপমানিত হয় অথবা তার স্বপ্নভঙ্গ হয়, তখনই তার সেই পরাজয়কে মেনে নিতে না পারাকে বিধৃত করার জন্য পরাবাস্তব বিমোক্ষণের আশ্রয় নিতে দেখা যায়। প্রতিটি ঘটনার পরই সে আত্মহত্যার নেমে পড়ছে। প্রত্যেকটি খণ্ড খণ্ড ঘটনার করাঘাতে তার যেন টুকরো টুকরো মৃত্যু হয়। সে আত্মহত্যা করলেও লেখক যেন একেবারে নির্মোহ, নির্বিকার ভঙ্গিতে বলে চলেন তার কাহিনী। এমনকি গল্পের শেষে খুকুরানিও কাঁদতে কাঁদতে তাকে প্রত্যাখ্যান করে বলে—'আপনিতো আসেন লেখার বিষয় খুঁজতে। আপনার মন নেই। আপনি আমাকে ভালোবাসেন না।' আবদুল হাফিজের হয়তো কিছুই বলবার থাকে না। তাই তাকে কিছু বলতেও দেখা যায় না। তাও কি তার জীবন থেমে যায়? খুকুরানি বা তার ছাত্রী ঝুমু—এরা কি অপরিহার্য নাকি উপলক্ষ মাত্র? অন্যদিকে, 'জ্যোৎস্নায় ভূত' গল্পটি প্রথম পুরুষে বর্ণিত, অথচ লেখক ঠিকই একই নির্মোহ ভঙ্গি বজায় রাখতে পেরেছেন।

প্রসঙ্গ : গল্পসংগ্রহ

'গল্পসংগ্রহ'-এ মান্নান সৈয়দের ২৮টি গল্প সন্নিবেশিত আছে। দু'ভাগে রয়েছে গল্পগুলো : গ্রন্থিত আর অগ্রন্থিত। গ্রন্থিত ভাগে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন গল্পগ্রন্থের থেকে নির্বাচিত ১৪টি গল্প আর অগ্রন্থিত ভাগের ১৪টি বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকা বা লিটলম্যাগে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু মলাটবন্দী হতে যাচ্ছে এই প্রথম। সে হিসেবে পুরোনো পরিচিত গল্পের পাশাপাশি একঝাঁক নতুন গল্পের সম্মিলন পাঠকের মনে আনন্দ সঞ্চার করবে সন্দেহাতীতভাবে। এবার অগ্রন্থিত গল্পগুলোর দিকে একটু আলোকপাত করা যাক।

'স্টুডিও জামান' গল্পটি পারিবারিক একটি ঘটনাকে নিয়ে। মূল চরিত্র তিনটি : পুতুল, জামান আর শরিফা। পুতুল জামান সাহেবের মেয়ে। তার স্ত্রী বুলবুল মারা যাওয়ার পরে পুতুলই উদ্যোগী হয়ে তার বাবার বিয়ে দেয়। বৃদ্ধ বয়সের নৈঃসঙ্গ্যকে উপলব্ধি করেই পুতুল এরকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পাত্রী শরিফা, তাদেরই প্রতিবেশী, যার বিয়ের জন্য বুলবুল-জামান দুজনই চেষ্টা

করেছিলেন। অথচ ভাগ্যের টানে বুলবুল মারা গিয়ে সে দরোজা খুলে দিল। 'Problems of Dostoevsky's Poetics' এ মিখাইল বাখতিন Polyphonic (বহুস্বরীয়) প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছিলেন। এ গল্পেও আমরা দেখি পুতুল, জামান আর শরিফা একই ঘটনাকে তাদের নিজেদের অবস্থান থেকে অবলোকন করছে। একই কথা 'মাছ মাংস মাৎসর্যের রূপকথা' গল্পের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। 'রুমু রানি রোজি' গল্পটিও পারিবারিক পটভূমিকায় রচিত, কিন্তু প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। রুমু রানি ও রোজি তিন বোন। তাদের মা সম্প্রতি মারা গেছে। যে ডাক্তারের হাত দিয়ে তাদের মা মারা যান সেই ডাক্তার সালাহউদ্দিন অপরাধবোধে পুড়েই কয়েকদিন তাদের বাসায় আসে। তার ক'দিন পরে সে তার আরেক বন্ধু মারফত মেজো বোন রানিকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। রুমু শাহিনের কাছে কমিটেড থাকায় তার পক্ষে এ প্রস্তাবে রাজি হওয়া সম্ভব হয় না। পরে সে যে কোনো এক বোনকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠায়। এ থেকে অনুমান করা যায় তার অপরাধবোধের মাত্রাটা কতটা তীব্র ছিল। একেবারে শেষে রোজি, যে কিনা সেই ডাক্তারের প্রতি সবচেয়ে বিরক্ত ছিল, তাকে নিয়ে কটুকথাও বলত, তার রাগ অনুরাগে পরিণত হয়। সে তাকে বিয়ে করতে সম্মত হয় এবং একটি হাস্যোজ্জ্বল পরিসমাপ্তি ঘটে।

সাম্প্রতিক গল্পগুলোয় তিনি খুব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকাজের দিকে বেশি মনোযোগী হয়েছেন। প্রথম দৃষ্টিতে গল্পগুলোকে একরৈখিক, সাদামাটা বলে মনে হলেও তার মর্মে থাকে মোচড়খোচিত আলোর বিভাস যা কিছুটা তৃপ্তি দেয়, কিছুটা অবাক করে, কিছুটা হাহাকারে ফেলে। স্বীয় স্বাতন্ত্র্যের বিষয়ে তিনি সর্বদাই আপোষহীন। তার স্বাতন্ত্র্যের ধরন পরিবর্তিত, বিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু নিজস্ব কক্ষপথচ্যুত হননি। 'পুরোনো কবিতা' খুব সাদামাটা একরৈখিক গল্প মনে হলেও তার মর্মে তিনি পুরোনো কবিতা বা ভালোবাসার সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাত এবং টিভি প্রডিউসারের উল্লেখ করা আলোচনার বিষয় 'পুরোনো বাংলা কবিতা'র মধ্যে দুর্দান্ত কন্ট্রাস্ট লুকিয়ে রাখেন। তাঁর গল্প একটি থেকে আরেকটি স্বতন্ত্র। যেমন : ষাটোর্ধ্ব বা প্রৌঢ় মানুষকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু গল্প তিনি লিখেছেন। কিন্তু একটি থেকে আরেকটি ভিন্ন। তাই মানবিকতায় ভরা 'প্রফেসর আলি আকবরের একদিন' গল্পের সঙ্গে 'পঞ্চেন্দ্রিয়' গল্পের মিল নেই। আবার 'যখন ফুটে উঠল তারা'-র প্রৌঢ়ের সঙ্গে 'পুরোনো কবিতা'-র প্রৌঢ়ের মিল পাওয়া যায় না।

মান্নান সৈয়দ বরাবরই বিচিত্র বিষয়পিয়াসী এবং অনুসন্ধিৎসু চোখ দিয়ে তিনি গল্পগুলোকে বের করে আনতে পারেন। 'জ্যোৎস্নায় ভূত'ও সেরকম একটি বিচিত্র গল্প। একজন খুনির আত্মস্বীকারোক্তিমূলক বয়ানে গল্পটি বিধৃত। খুনির প্রতি ঘৃণা বা যে মারা গেছে তার প্রতি সমবেদনার থেকেও তাঁর লক্ষ্য ছিল খুনির চলমান মানসিক ক্রিয়াটি উদঘাটন করা—যার কারণে সে খুনটি করেছে। খুনি ইদ্রিস, নাজমা আপাদের বাড়িতেই বড় হয়েছে, তাদের বাড়িতে কাজ করেছে বহুদিন, অনেক বিশ্বস্তও সে। অনেকদিন পর নাজমা আপার বাসায় বেড়াতে গেলে নাজমা আপা খুব খুশি হয়। একপর্যায়ে নাজমা বলে—'তোদের মতো বিশ্বাসী লোক

আজকাল আর পাওয়া যায় না।' একটু নাটকীয়ভাবেই আমরা দেখি নাজমা আপা বাথরুম থেকে বের হওয়া মাত্র তাকে খুন করে ইদ্রিস। খুন করার কোনো নির্দিষ্ট কারণ সে বলতে পারে না। কিন্তু একটি ঘটনার কথা স্মরণ করে যা সে ভুলতে পারেনি। ইদ্রিস যখন বেড়ে উঠছিল তখন নাজমা আপা তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিলেন বা বলা যায় নাজমা আপাকে কেন্দ্র করে তার যে আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল সেটি অচরিতার্থ থেকে যাওয়ার কারণে তার অচেতনে জমা পড়ে থাকে ঘটনাটি। নাজমা আপা বা হয়তো ইদ্রিসও সেসব ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু 'ভূত চেপে গিয়েছিল আমার মাথায়। আশ্চর্য, আপা বাথরুমের কথা বলতেই আমার মনে পড়ে গিয়েছিল আরেকটি বাথরুমের কথা।'

'গল্পকারকে নিয়ে লেখা একটি গল্প'-তে দেখতে পাব যে একজন গল্পকার যে কিনা 'অবক্ষয়ী, শূন্যবাদী, মানুষবিরোধী এক নিজস্ব কল্পনার জগতের অভিবাসী।' কিন্তু গল্পের শেষে সে গ্রামে যেয়ে বসবাস করা শুরু করে এবং গ্রাম থেকে যে চোরাচালানের কারবার হতো তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, নিজের জীবননাশের আশঙ্কার সম্ভাবনা সত্ত্বেও। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত সেও মানুষের সাথে মিশে যাচ্ছে, সমাজকে আলিঙ্গন করছে।

'আত্মতাড়িতেরা' এই সংগ্রহের একটি বিশেষ অবস্থান জুড়ে আছে। এটি মান্নান সৈয়দের একেবারে প্রথম দিককার গল্পের নিদর্শন এবং পূর্বে কোনো বইয়ে সংগৃহীত হয়নি। কাহিনী বলতে সেরকম কিছুই নেই। একজন লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। গন্তব্য—তার এক আত্মীয়ার বাসা, যেখানে তার সঙ্গে সে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করবে, বহুপ্রতীক্ষার পরে। মেয়েটি যখন সম্পূর্ণ নগ্ন হয় তার তিনটি স্তন দেখে সে বের হয়ে আসে। চিন্তাচেতনায় ও ভাষায় প্রথম থেকেই স্বতন্ত্র হয়ে ওঠার যে অভিপ্রায় সেটি এখানেও পরিস্ফূটিত। পুরো গল্পটি একটি মাত্র অনুচ্ছেদে প্রবন্ধের ভাষায় অনেকটা। প্রবৃত্তিবাগীশ, আত্রমসম্মত, মনোবিন্যাস ইত্যাদি যৌগিক শব্দ তৈরি যেমন রয়েছে, আবার একের পর এক উপমার স্রোত—ক্ষমাহীন রিকশা, বাস্তবপীড়িত, চুলহীন শান্ত গাছ, আদি লেনদেন, চাঁদের ভালোমানুষ আলোয়, হাতুড়িসম ধমক ইত্যাদি দেখা যায়। 'সত্যের মতো বদমাশ'র তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন—'গল্প জীবনের প্রতিফলন নয়—আর এক জীবন। জীবন-নদীর পলিমাটি থেকেই গল্পকার কুমোর নতুন-নতুন জিনিস তৈরি করে। কিন্তু পলিমাটি আর একটা কলস বা পেয়ালা কি এক জিনিস? এক নয়।' এক জিনিস নয় বলেই তাঁর গল্পে নিজেদের জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে দেখতেও যেন দেখি না। কিন্তু তাতে হতাশ হতে হয় না। জীবনের বিভিন্ন কোণগুলো দেখা হয়। যার সঙ্গে হয়তো আমার ঘটনা মিলছে না, কিন্তু আরেকজনেরটা মিলছে।

উত্তরভাষ্য

সালাউদ্দিন আইয়ুব লিখেছিলেন 'আবদুল মান্নান সৈয়দ কবিতা লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন, গল্প লিখেছেন, গবেষণা করেছেন; কিন্তু তাঁর সাহিত্যকর্মের উপযুক্ত

ব্যাখ্যা কিংবা বিশ্লেষণ হয়নি। আবদুল মান্নান সৈয়দ অনেক লেখককে ইন্টারপ্রেট করেছেন, কিন্তু আমরা তাঁর লেখাকে ব্যাখ্যা করতে পারিনি।' মান্নান সৈয়দের গল্প নিয়ে আলোচনা-ব্যাখ্যা কম হওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে আমি মনে করি আমাদের সাহিত্যবিচারের কেন্দ্রে অবস্থান করা জীবনবাদিতা ও কলাকৈবল্যবাদিতার স্থূল বিভাজন রেখাই দায়ী। একরৈখিক বাজারি ছকে ফেলা গতানুগতিক গল্প না লেখার ফলে তিনি যেমন পাঠকপ্রিয়তা পাননি, সমাজবাস্তবতাকে উপজীব্য না করার ফলে জীবনবাদী সমালোচকদের কাছ থেকেও ভালো কোনো মন্তব্য তিনি পাননি। তা সত্ত্বেও সামগ্রিক বিবেচনায় একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায়, তাঁর গল্প এমন একটি নিঃশব্দ স্রোত যা নিঃসঙ্গ ব্যক্তির আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মগ্লানি, ফ্যান্টাসি, দুঃখবোধ, মনোকলহ, স্মৃতিচারণ, অপ্রাপ্তির হাহাকারে মেতে থাকলেও দার্শনিক প্রতীতি, জীবনবীক্ষার প্রাতিস্বিকতা ও শিল্পের প্রতি গভীর একাত্মতার সঙ্গে বাস্তবতার আশ্চর্য সম্মিলনে শেষপর্যন্ত ঠিকই জীবনের সুবিশাল মোহনায় এসে মেশে। আর এজন্যই তিনি পুরো বাংলা গল্পের প্রেক্ষিতেই অপরিহার্য একজন কথাশিল্পী এবং সমালোচক-কথাসাহিত্যিক আহমাদ মোস্তফা কামালের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলা যায়, তাঁর 'গল্প ছাড়া আমাদের সাহিত্যের আলোচনা পূর্ণতা পায় না।'

মান্নান সৈয়দের গল্প যে বাংলা ছোটগল্পের ভুবনে অপরিহার্য একথা নিঃসংশয়চিত্তে বলা গেলেও তাঁর গল্পের গতিবিধি সম্পর্কে উপসংহারমূলক কোনো মন্তব্য করাটা বোকামিই হবে। 'সত্যের মতো বদমাশ' থেকে শুরু করে অদ্যাবধি তিনি প্রতিনিয়ত যেভাবে বিষয়বৈচিত্র্য ও প্রকরণবৈচিত্র্য দেখিয়ে চলেছেন এবং তাঁর লেখনির অগ্নিপ্রভ সজীবতা বজায় রেখেছেন তাতে তাঁর পরবর্তী গল্পগুলো জীবনের কোন প্রান্তগুলোকে ছুঁয়ে যাবে বলা মুশকিল। বলাটা মুশকিল হলেও, আমাদের সাহিত্যের জন্য তা ফলপ্রসূ, সেটা বলাই বাহুল্য।

শীতের কনকনে রাতে ব্ল্যাংকেট গায়ে জড়িয়ে শুয়ে আছি। হালকা কুয়াশাবিদ্ধ অন্ধকার ঘরে, বাইরে পূর্ণিমার চাঁদ ঝরলেও তার কি সাধ্য আছে এই নাগরিক কাঠামোকে ভেদ করার? এমন সময় দেখলাম টেবিলে সাজিয়ে রাখা তাঁর বইগুলোর একরৈখিকতায় গা না ভাসানো চরিত্রপাত্র-ঘটনা-চেতন-অচেতনগুলো 'ফল ইন' করে দাঁড়িয়ে আছে। কতটুকুই বা আমি তাদের বুঝতে পারলাম!

জানুয়ারি ২০১০ **সাব্বির আজম**

সূ চি প ত্র

অগ্রন্থিত

রুমু রানি রোজি | ২৭
ছবির মতো | ৩৬
আশ্বিন-কার্তিক | ৪৫
ভাদ্রের একটি দিন | ৫৫
যখন ফুটে উঠল তারা | ৬৪
ছবি ও মানবী | ৭১
গল্প ১৯৭৩ | ৭৮
জ্যোৎস্নায় ভূত | ৮৪
পঞ্চেন্দ্রিয় | ৯১
পুরোনো কবিতা | ১০৩
প্রফেসর আলি আকবরের একদিন | ১০৯
গল্পকারকে নিয়ে একটি গল্প | ১১৬
বিকেলের নক্ষত্র | ১২৫
আত্মতাড়িতেরা | ১৩৩

গ্রন্থিত

মাতৃহননের নান্দীপাঠ | ১৩৯
জলপরি | ১৪৭
কে তুমি? | ১৫২
ব্ল্যাক-আউট | ১৬০
গ্রীন রোড | ১৬৯
এক অমানুষের গল্প | ১৭৭
চোখ | ১৮৭
শিকার | ১৮৯
নেকড়ে, হায়েনা ও তিন পরী | ২০৮
একদিন | ২২২
কে বিদেশি বন-উদাসী | ২২৫
প্রবেশ | ২৩৪
জীবনানন্দের একটি অপ্রকাশিত গল্প | ২৪৪
মাছ মাংস মাৎসর্যের রূপকথা | ২৫১

পরিশেষ

আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর গল্প-সংক্রান্ত তথ্যমালা

গ্রন্থ পরিচিতি | ২৬৩
বিভিন্ন গল্পসংকলনে অন্তর্ভুক্ত গল্প | ২৭৬
নির্বাচিত মন্তব্য | ২৭০

রুমু রানি রোজি

কড়া নড়ে উঠল।

এ সময় আবার কে এল? জীবনে যে-সব আত্মীয়স্বজনকে দ্যাখেনি রোজি, তারাই হবে হয়তো কেউ। আম্মার ইন্তেকালের পর কত আত্মীয়স্বজনকেই যে দেখল তারা। তাদের কেউ কেউ এখনো আসছেন। কেউ কেউ একদিন-দুদিন এসেই তাদের কর্তব্যকর্ম পালন করেছেন।

দরোজা খুলল রোজি।

দেখেই মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল।

—ও, আপনি!—রোজির চেহারার মধ্যেই পরিষ্কার বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল।

লোকটা বিব্রতভাবে একটু ঠোঁট কামড়াল। তারপর বলল—আফজাল শাহেব আছেন?

কোনো জবাব না-দিয়ে দরোজাটাও বন্ধ করে এসে দুমদুম করে ভেতরের ঘরে এল। তার পদক্ষেপেও স্পষ্ট নাখোশ ভাব। লোকটাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার তারা বাড়িশুদ্ধু কেউ তাকে পছন্দ করছে না।

ভেতরে এসে রোজি বলল—আব্বা, সেই বদমায়েশ ডাক্তারটা আবার এসেছে।

আফজাল হোসেন খাটে শুয়েছিলেন। শাদা-পাকা দাড়ি খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে। এখন আর নিয়মিত শেভ করা হয় না। কোথাও কিছু না—হঠাৎই সারাজীবনের সঙ্গিনী চলে গেল তাঁকে ফেলে। তিন-তিনটি জোয়ান মেয়ে, আর কতদিনের সাধ সদ্যজাত একটি ছেলেকে রেখে। সন্তানের কী দরকার ছিল? কিন্তু একটি পুত্রসন্তানের জন্যে পাগল হয়ে ছিল ভেতরে ভেতরে। আফজাল শাহেবের কোনো খেদ ছিল না। আর কতকাল পরে হলো। এতদিন পরে তো সাধারণত সন্তান হয় না। একটাই সান্ত্বনা, লুৎফা, লুৎফুন্নেসা খাতুন, জেনে গেছেন তাঁর একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। পুত্রসন্তানের মুখ দেখে গভীর পরিতৃপ্তিতে সেই যে চোখ বুজেছিল তার সে-চোখ খোলেনি আর। স্বামীর কাছে তার সারাজীবনের আরাধ্য পুত্রসন্তানটি উপহার দিয়ে যেন একটি দায়িত্ব সম্পন্ন করে চলে গেল লুৎফা। একবার ভাবতে পারল না, কোন্ বিশাল মরুভূমির মধ্যে তাকে একা ফেলে চলে গেল সে। আজিমপুরের সরু একটা গলির মধ্যে ছোট্ট এই ভাড়াবাড়ি, একটুকরো উঠোন, যেখানে লুৎফারই লাগানো একটামাত্র পেঁপে গাছ। চাকরি থেকে কিছুকাল

হলো অবসর নিয়েছেন আফজাল হোসেন। সরকারি অফিসের একজন হেডক্লার্ক হিশেবে। পেনশনের সামান্য টাকায় তিন মেয়ে গলায় বেধে আছে, যাদের একজনেরও বিয়ে দেওয়া হয়নি—তবু তো দিনগুলো অভাব-অনটনের মধ্যে চলে যাচ্ছিল একরকম। কেন দুর্মতি হলো লুৎফার। তাঁরই কপালের লেখন।

রোজির কথা শুনে উঠতে হলো বাধ্য হয়ে। লোকটা যে কেন আসে!

লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে দিলেন। একটা পাঞ্জাবিটা পরে নিলেন।

রোজিকে বললেন—একটু চা কর।'

—আমি পারব না।—সোজাসুজি বলে দিল রোজি।

অতি দুঃখের মধ্যেও ম্লান হাসলেন আফজাল হোসেন। এ মেয়েটা তাঁর হয়েছে অন্যরকম। ছোট মেয়ে তো। অতি আবদেরে ছেলেবেলা থেকেই। আর মুখের ওপর ঠাশঠাশ করে কথা বলে দ্যায়।

আফজাল শাহেব বললেন—ঠিক আছে। রানিকে ডেকে দে।

রানি তাঁর মেজো মেয়ে। সে-ই তো সংসারটাকে সচল রেখেছে। লুৎফা বেঁচে থাকতেই সে-ই তো সংসারের সব ভার নিয়েছিল।

রোজি নিজেই বলতে পারত রানিকে চা করার জন্যে, কিন্তু তা সে করল না। রানিকে ডেকে দিল।

আফজাল শাহেব বললেন—ঐ ডাক্তার শাহেব এসেছেন, একটু চা-টা দিস।

রানি বলল—ঠিক আছে, চা দিচ্ছি। কিন্তু উনি আসেন কেন, তা তো বুঝি না। ওনার হাতেই তো মারা গেলেন আম্মা। বেরিয়ে গেলেন উনি, আর শেষ নিশ্বাস পড়ল আম্মার। আর সেদিনও উনি কি নিতে ভোলেননি।

আফজাল শাহেব বললেন—থাক, রানি। এসব কথা এখন বলে আর লাভ কী।

কোনো কথা না-বলে রানি চলে গেল। সেও ডাক্তারের ওপর অসন্তুষ্ট। হবেই বা না কেন?

আফজাল শাহেব তাঁর ছোট্ট বসার ঘরে ঢুকলেন।

বেতের চেয়ারে বসেছিলেন ডাক্তার সালাহউদ্দিন আহমদ। আফজাল শাহেবকে ঢুকতে দেখে সালাম দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

সালামের জবাব দিয়ে আফজাল শাহেব বললেন—বসেন।

বসল আবার ডাক্তার সালাহউদ্দিন আহমদ। কী কথা বলবে খুঁজে পাচ্ছিল না। বলল—বাচ্চাটা ভালো আছে তো?

—আছে।

একটু ইতস্তত করে ডাক্তার সালাহউদ্দিন আহমদ বলল—এই সময় একটু বুকের দুধ না-পেলে—

—না। সে ব্যবস্থা হয়েছে। বাচ্চাকে ওর ছোট খালা নিয়ে গেছে। তারই বুকের দুধ খাচ্ছে।

ডাক্তার সালাহউদ্দিন যেন কিছু কথা বলতে পেরে বেঁচে যায়। বলে—কোথায় থাকেন ওনারা?

—পুরোনো ঢাকায় থাকে।—বললেন আফজাল শাহেব।

এইসময় রানি চা-বিস্কুট নিয়ে এল ট্রে-তে। ডাক্তার সালাহউদ্দিন আহমদ বা রানি কোনো কথা বলল না। সকালে একজন ঠিকে কাজের মেয়েলোক কাজ করে দিয়ে যায়। কোনো বাঁধা কাজের লোক নেই। রোজি তো সামনেই আসবে না এই বদমাশ ডাক্তারের। আপা এখন মেটারনিটি হসপিটালে। রানি ছাড়া চা নিয়ে আর কে আসবে?

আফজাল শাহেব বললেন—চা খান।

ভাবলেন, হায়াত-মওতের মালিক আল্লাহতালা। ডাক্তারের আর দোষ কী। কিন্তু তরুণ ডাক্তার সালাহউদ্দিন আহমদ বেচারা বোধহয় একটা অপরাধবোধে ভুগছে। তা নাহলে ফিরে ফিরে আসে কেন? তাঁর মেয়েরাও যে ভালো ব্যবহার করছে না, সেও কি আর ডাক্তারটা বুঝছে না? তবে, একটা মানুষ, অনাত্মীয় একজন মানুষ এলেও, কি তাঁকে মুখের ওপর দরোজা বন্ধ করে দেওয়া যায়? বিদায় করে দেওয়া যায় একেবারে? আত্মীয়স্বজনের আসা-যাওয়া কমে এসেছে এর মধ্যেই। কেউ এলে একটা কথা বললেও ভালোই লাগে।

আফজাল শাহেব বললেন—কোথায় থাকেন আপনি?

—আমি? আমি তো সরকারি ডাক্তার। আজিমপুরে একটা ফ্ল্যাট পেয়েছি। মা-কে এনে রেখেছি। আর আমার একটা ছোট বোন আমার বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করে। ইডেন গার্লস কলেজে পড়ে।—ডাক্তার সালাহউদ্দিন আহমদ নিজে থেকেই বলে যায় অনেকখানি।

আফজাল হোসেন কী আর বলবেন? বললেন—ও। ভালো।

একটু ইতস্তত করে ডাক্তার সালাউদ্দিন আহমদ বললেন—আমি তাহলে উঠি।

—আচ্ছা—আফজাল হোসেন বললেন।

ডাক্তার বেরিয়ে গেলে আফজাল হোসেন দরোজা বন্ধ করে চলে এলেন ভেতরের ঘরে। ওরা কোথায় গেল? দেখলেন, দুই বোন বারান্দায় মোড়ায় বসে কথা বলছে।

আফজাল হোসেনকে দেখে রোজি বলল—বদমাশ ডাক্তারটা গেছে?

হাসলেন আফজাল হোসেন। রোজির কথার জবাব না-দিয়ে বললেন—আচ্ছা, রুমু তো এল না এখনো?

রানি বলল—কী-যে ভুলো মন হয়েছে আব্বার। আপা বলে গেল না, ফিরতে আজ রাত হবে। রাত দশটা নাগাদ ফিরবে।

—ও। বললেন আফজাল হোসেন। লুৎফার হঠাৎ-মৃত্যুর পরে অনেক কিছুই আজকাল আর মনে থাকছে না।

রানি বলল—আব্বা, কাল দুপুরে আমরা খাওয়াদাওয়া করে রোজি আর আমি খালার বাসায় গিয়ে বাবুকে একটু দেখে আসব। আপনার কোনো অসুবিধে হবে না তো?

—নাহ। আমি বাসায় থাকব। গিয়ে দেখে আসিস। কিন্তু বেশি দেরি করবি না ফিরতে।

—না। না। দেরি করব না। আপা তো মেটারনিটিতে চলে যাবে। আপনি একা একা থাকবেন—

আফজাল হোসেন বললেন—তাতে কোনো অসুবিধে হবে না।

আজকাল কেন যেন একা থাকতেই ভালো লাগে তাঁর।

উঠোনে পেঁপে গাছটা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। একপাশে লুৎফা আর তাঁর মেয়েদের নিজের হাতে তৈরি ছোট্ট একটি বাগান—সেখানে লাউ গাছ, টমাটো, সীম, করল্লা কত কিছুর চাষ করেছিল ওরা। এখন আর গাছগুলোতে পানি দেওয়া হয় না। এক-একদিন রানিই খেয়াল করে। একবার আলুর চাষ পর্যন্ত করেছিল ওরা। যখন মাটি উল্টেপাল্টে সবাই মিলে আলু বের করছিল একটুখানি মাটির নিচ থেকে, কী-যে আনন্দ পেয়েছিল সেদিন সবাই। আফজাল হোসেন বারান্দায় বসে ছিলেন। লুৎফা আর তিন মেয়ে হৈ-চৈ বের করছিল আলু—ঝুড়ি ভরে এনে রাখছিল তাঁর সামনে—তখন তাঁদের কী উল্লাস। এতদিন পরে রুমু রানি রোজিদের একটা ভাই হয়েছে—ওরা কী খুশি! শুধু যদি বেঁচে থাকত লুৎফা। বারান্দায় বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারলেন না আফজাল হোসেন। ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

* * *

বিকেলে দরোজার কড়া উঠল।

রোজি নিজের মনে বলে উঠল—আজ বদমাশ ডাক্তারটাকে দুটো কথা শুনিয়ে দেব আমি ঠিক।

রুমু ভাবল : শাহাদাৎ এল নাকি? আজ তো আসার কথা না। তবু হঠাৎ আসতেও পারে।

রানি বলল—রোজি, ভদ্রতা বলে একটা কথা আছে—মনে রেখো। তিন বোন বারান্দায় পাটি বিছিয়ে বসে গল্প করছিল। কয়েকদিন আগে রানি আর রোজি লক্ষ্মীবাজারে খালার বাড়িতে গিয়ে বাচ্চাটাকে দেখে এসেছে। বছরখানেক আগে মেজো খালার একটা মেয়ে হয়েছিল। বড় বোনের ছেলেকে মাতৃস্নেহে পালন করছেন খালা। বড় আপার জন্যে কান্নাকাটি করল। খালু পুরোনো ঢাকার ব্যবসায়ী মানুষ। বারবার বললেন—বাচ্চাকে আমি সামলে রাখছি। ওর জন্যে কোনো চিন্তা করতে হবে না। তোমরা দুলাভাইয়ের দিকে খেয়াল রেখো। এই বয়েসে এত বড় আপাত— খালার অবস্থা কত ভালো। আসার সময় কত কী যে রান্না করে দিল ওদের। এক সপ্তার খাবার। ভরাট মনে দুই বোন ফিরে এসেছিল।

রোজিকে ধমকে রানি উঠল দরোজা খুলে দেওয়ার জন্যে।

দরোজা খুলে দ্যাখে অচেনা একজন।

ভদ্রলোক জিগেস করলেন—এটা কি আফজাল শাহেবের বাড়ি?

জি।—রানি সংক্ষেপে বলে।

উনি কি বাড়িতে আছেন?'

'জি, আছে। বসেন আপনি। ডেকে দিচ্ছি আব্বাকে।—বলে দরোজা ভেজিয়ে দিল। গলির ভেতরে দরোজা খুললেই ওদের ঘর। সারাক্ষণ বন্ধ রাখতে হয়। এই

বাড়িতেই আছে কতকাল। বাড়িওয়ালা ভালোমানুষ। হাজী নূর মোহাম্মদ। এত বছরেও ভাড়া বেশি বাড়াননি। এই ভাড়ায় এরকম বাড়ি পাওয়া এখন অসম্ভব।

হাজী নূর মোহাম্মদ আফজাল হোসেনকে পরিষ্কার বলেছেন—আমি যদ্দিন বাঁইচ্যা আছি, আপনি থাকেন আমার বাড়িতে। ঢাকা শহরে আমার সাতটা বাড়ি। ব্যবসা আছে। আল্লাহর রহমতে ট্যাকার অভাব নাই আমার। আমার কিছু হইলে আমার পোলাপানরা কী করব, কইতে পারি না।

তা নাহলে আব্বা এখন পেনশন পাচ্ছেন সামান্য। রুমু নার্স হিশেবে চাকরি করায় না সংসারটা সচল আছে? থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করে কোথাও ভর্তি হলো না রোজি। সোজা ঘোষণা দিয়েছে : পড়াশোনা করব না আর। রানি বি.এ.তে ভর্তি হয়েছে ইডেন কলেজে, কিন্তু সেও অনেকদিন কলেজে যাচ্ছে না, বেতনটা গিয়ে দিয়ে আসছে—এটুকু মাত্র।

আফজাল হোসেন যথারীতি খাটে শুয়েছিলেন। এই বিকেলবেলাতেও। যেন তাঁর সমস্ত শক্তি চলে গেছে লুৎফার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। রানি বলে বলে হয়রান হয়ে গেল—আব্বা, একটু হেঁটে আসেন। এভাবে থাকলে হবে নাকি?—কিন্তু আফজাল হোসেন নড়েন না। দিন-রাত বলতে গেলে শুয়ে থাকেন। সেজন্যেই কেউ এলে রানি একটু খুশিই হয়। অন্তত একটু কথা বললে ভালো লাগবে আব্বার।

—কে যেন এসেছে, আব্বা।—বলল রানি।

আফজাল হোসেন বললেন—কে এল আবার?—বলে পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে ছোট্ট ড্রয়িং রুমটায় এলেন।

ভদ্রলোক, ছোকরা যুবক বললেই ভালো হয়, সালাম দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বসতে বললেন আফজাল হোসেন। তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

ছেলেটি বলল, 'আমি ডাক্তার শফিক। আপনার স্ত্রীর যে চিকিৎসা করেছিল, ডাক্তার সালাহউদ্দিন আহমদ, তার বন্ধু আমি।'

আফজাল হোসেন বললেন—ও।

ডাক্তার শফিক বলল—আমি—কী বলব—একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আমার বন্ধুর বিবাহের প্রস্তাব। ও আপনার মেজো মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। ও হুগলির ছেলে। চলে এসেছিল বাংলাদেশ হওয়ার পরে। আমি জানি ওকে অনেকদিন ধরে। ও কিন্তু খুব ভালো ছেলে। মেধাবী ছেলে। স্কলারশিপ পেয়ে পড়েছে। অনেকদিনের বন্ধু আমার। আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে—

প্রস্তাবের আকস্মিকতায় চমকে গিয়েছিলেন আফজাল হোসেন। তিন মেয়ের বিয়ে নিয়ে তাঁর আর লুৎফার ভাবনার অন্ত ছিল না। বিশেষত তিনি রিটায়ার করে যাওয়ার পরে। রোজি অবশ্য ছোটই আছে—কিন্তু বড় দুই মেয়ের বিয়ে দেওয়া দরকার। আফজাল হোসেন অবশ্য জানেন না, রুমু একজনের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। শাহাদাৎ। শাহাদাৎ ওদের বাড়িতেও আসে মাঝে মাঝে। এঁদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। রানি জানে, শাহাদাৎ কেন আসে। আপার অফিসেও মাঝে মাঝে যায় শাহাদাৎ—তাও জানে রানি। শাহাদাতের সঙ্গে রুমু হোটেল-রেস্তোরাঁয়ও খায়ও মাঝে মাঝে, ঘোরাফেরা করে—তাও কি টের পায় না রানি?

আপা যেদিন একটু ভালো শাড়ি পরে নার্সের ড্রেস ব্যাগে ভরে নিয়ে যায়। রানি জানে—সেদিনই শাহাদাৎ আসবে, শাহাদাতের সঙ্গে ঘুরবে রুমু। রুমু বাড়িতে ফেরার পরে তার চোখ-মনের দ্যুতি দেখলেই বোঝা যায়। এঁচোড়ে-পাকা রোজিও টের পেয়েছে। শাহাদাৎ এলে মিটিমিটি চোখে রুমুর দিকে তাকিয়ে।

এখন ডাক্তার শফিকের প্রস্তাবের আকস্মিকতায় আফজাল হোসেন কিছুক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারলেন না।

তারপর বললেন—আচ্ছা—তো আমার তো একটু কথা বলতে হবে—ওদের খালা-খালু আছেন—

—নিশ্চয়। ডাক্তার শফিক বলল—আপনারা ঠিক করুন। একটা কথা বোধহয় বলা দরকার, সালাহউদ্দিনের কোনো ডিমান্ড নেই। এটা আপনাকে বলা আমার উচিত হবে না, তবু বলছি, ডিমান্ড কোনো থাকলে ও নিজে থেকে এই প্রস্তাব দিত না। আর, আবার বলছি, ও অত্যন্ত ভালো ছেলে। স্বভাবচরিত্র ভালো। মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার। সরকারি চাকরি করে। আজিমপুর কলোনিতেই ফ্ল্যাট। মা আর ছোট বোন আছে। আপনার মেয়ে সুখেই থাকবে।

আফজাল হোসেন বললেন—আচ্ছা, ঠিক আছে।—তারপর একটু থেমে বললেন, 'আপনি একটু চা খান।'

ডাক্তার শফিক বলল—সামনে সপ্তায় তো আসছি। তখন চা খাব। আজ একটা অন্য কাজ আছে।

—আচ্ছা—বললেন আফজাল হোসেন।

সালাম করে বেরিয়ে গেল ডাক্তার শফিক। আফজাল হোসেন দরোজা ভেজিয়ে দিয়ে ড্রয়িং রুমেই চেয়ারটায় বসে থাকলেন। সত্যি অভাবিত প্রস্তাব! একটা ডাক্তার ছেলে প্রস্তাব দিয়েছে রানিকে বিয়ে করার জন্যে—এটা জানলে কী যে খুশি হতো লুৎফা! মেয়েদের বিয়ে নিয়ে মাঝে মাঝেই কথা বলত লুৎফা। বলত—আপনি রিটায়ার করে গেলেন, একটা মেয়েরও বিয়ে হলো না এখনো।—সেই ভাবনাতেই যেন দ্রুত বুড়িয়ে যাচ্ছিলেন আফজাল হোসেন।

রানিকে পছন্দ করা স্বাভাবিক। তাঁর তিন মেয়ের মধ্যে কেন, এমনিতেই রানি ভারি সুন্দরী। যেমন তার চোখ-মুখ, তেমনি তার গায়ের রঙ।

আজ বাড়িতে ওরা তিন বোনই আছে। কিন্তু রোজির কথা না—রুমুকে বাদ দিয়ে রানির বিয়ের প্রস্তাব এসেছে, এটা বাপ হয়ে কী করে বলবেন আফজাল হোসেন। আবার, ওদের সংসারে কত্রি তো বলতে গেলে রানিই। লুৎফা বেঁচে থাকতেই সংসারের সমস্ত পরামর্শ সমস্ত সিদ্ধান্ত সব রানিই নিয়েছে। ওর বিয়ে হয়ে গেলে আফজাল হোসেনই বা বাঁচবেন কি করে?

এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ড্রয়িংরুমের চেয়ারেই বসেছিলেন আফজাল হোসেন।

সন্ধে উতরে গেছে অনেকক্ষণ, ড্রয়িংরুমে কথাও শোনা যাচ্ছে না কোনো, পরদা একটু সরিয়ে রোজিই আবিষ্কার করল—আব্বা অনেকক্ষণ ধরে একা বসে আছেন।

আব্বার আবার কী হলো?

তিন বোনই একসঙ্গে ড্রয়িংরুমে এল।

রানি বলল—আব্বা, আপনার শরীর ভালো আছে তো?

রোজি বলল—কে এসেছিল, আব্বা?

আফজাল হোসেন ভাবতে পারছিলেন না আর। আলাদা করে রুমুকে বলা যাবে না। আলাদা করে রানিকেই বা তিনি বলবেন কি করে?

রুমু রানি রোজি তিনজনই লক্ষ্য করল আফজাল হোসেনের মলিন চেহারাটা যেন এখন একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বললেন—তোরা সবাই আছিস, ভালো হলো। শরীর আমার ভালো আছে। একটু আগে যে এসেছিল সে হচ্ছে ডাক্তার শফিক, ঐ ডাক্তার সালাহউদ্দিন আহমদের বন্ধু। ও একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। আমি তোমাদের খালা-খালুর সঙ্গে আলাপ করব—এখন আফজাল হোসেনের গলায় যেন একটা আত্মপ্রত্যয়ের সুর জেগে উঠেছে—কিন্তু তা আগে তোমাদের সঙ্গেই কথা বলে নিই। তোমরা বড় হয়েছ। তোমাদের মতামতটাই আগে জানা দরকার।

রুমু রানি রোজি তিনজনই উৎসুক হয়ে উঠেছে ততক্ষণে।

আফজাল হোসেন মেয়েদের দিকে না-তাকিয়ে বলে যাচ্ছিলেন—ডাক্তার সালাহউদ্দিন আহমদ তার বন্ধুর মারফত বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। রানিকে বিয়ে করতে চায়।

রোজি প্রায় লাফিয়ে উঠল—ওহ, দারুণ হবে! তাই বলি— বলে আব্বার সামনে আর কথাটা সম্পূর্ণ করল না।

রুমু বলল—খুব ভালো হয়, আব্বা। আর কোনো কথা নেই। মেডিক্যাল কলেজের সরকারি ডাক্তার—

রোজি বলল—বড় আপা কেন বলছে, তা অবশ্য আমি জানি।

বাপকে আড়াল করে রুমুকেই গা টিপতে হলো রোজির।

রুমু বলল—রানি, কী বলিস তুই? আমাদের যা অবস্থা—এরকম তো ভাবাই যায় না— তারপর বলল—আব্বা, ছেলের কে কী আছে সে-সব বলল না?

ওদের বাড়ি হুগলিতে।—আফজাল হোসেন বলছিলেন—বাপ নেই। মা আর একটা ছোট বোন আছে। ছেলেটা নাকি খুব ভালোও—

—তাহলে খালা-খালু গিয়ে একবার কথা বলে আসুক— রুমু বলল। তারপর বলল—কী রে, রানি, তুই চুপ করে আছিস।

রানি স্থির গলায় বলল—অসম্ভব। আমি এখন বিয়ে করব না।

রুমু বলল, তার চোখে প্রায় পানি এসে গেছে, ছোট এই বোনটাকে চেনে সে, যা একবার বলে তার নড়চড় হয় না, রুমু বলল—দ্যাখ, এর চেয়ে ভালো পাত্র কী আমাদের আসবে? পাগলামি করিসনে, রানি।—রুমু ভাবছিল, মা বেঁচে থাকলে তিনি যা করতেন সেই দায়িত্ব তো এখন পালন করতে হবে আমাকে।

রানি চুপ করে আছে।

রুমু বলছিল—দ্যাখ, বাঁচা-মরা আল্লাতালার হাতে। তোর কি ডাক্তারের ওপর রাগ আছে, সেজন্যে রাজি হচ্ছিস না?

রানি আর-একবার বলল—তা না। আমি এখন বিয়ে করব না। আমার বিয়ে হয়ে গেলে আব্বাকে দেখবে কে? না আমাদের যে-ভাইটাকে রেখে গেছে সে কী চিরকাল খালার বাড়িতে থাকবে? রোজিটা তো একটা পাগলি। এখন আমি বিয়ে করব না।

আফজাল হোসেন কিছু ভাবতে পারছিলেন না। তবু তাঁর মতো দরিদ্রের মেয়েকে মেডিক্যাল কলেজের একটা ডাক্তার বিয়ে করতে চাচ্ছে—এটাই যেন তাঁর মধ্যে একটা বল সঞ্চার করল।

শোবার ঘরে গিয়ে প্যান্ট-শার্ট পরে তিনি ড্রয়িংরুমে সমবেত তিন মেয়েকে বললেন—আমি একটু হেঁটে আসি।

আসলে তিনি ওদের সুযোগ দিয়েছিলেন, তিন বোন নিজেরা খোলামেলা আলোচনা করে ঠিক করুক।

কতদিন পরে যেন রাস্তায় বেরিয়েছেন আফজাল হোসেন। আলো জ্বলা দোকানপাট রিকশা বেবিট্যাক্সি গাড়ি লোকজনের চলাফেরা—সন্ধেবেলার জমকালো পরিবেশটা চমৎকার লাগছিল তাঁর। অম্লান কি শেষ হয়ে গেল? একটা হাফ-সোয়েটার পরে এসেছেন তিনি। তবু একটু যেন শীত-শীত লাগছে। বাতাসে এই শীতের আমেজটিও একটি স্বস্তিসুখ বয়ে আনছে যেন।

* * *

ডাক্তার শফিক পরের সপ্তায় ঠিক এসে উপস্থিত হয়েছিল। আফজাল হোসেন মন-মরাভাবে তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। রানি কিছুতেই বিয়েতে রাজি হয়নি। ওদের খালা-খালুকে জিগেস করার কথা বলেছিল রুমু। আফজাল হোসেন বলেছিলেন, রানিই যখন রাজি না, তখন ওঁদের জিগেস করে কী হবে? সেটা রুমুও জানত। রানি একবার যেটা 'না' করে, সেটা আর দ্বিতীয়বার তাকে দিয়ে করানো যায় না। একেবারে ছেলেবেলা থেকেই ওরকম। রুমু আদৌ ওরকম না। ও একটু নরম। ওদের মেটারনিটি হসপিটালে এসেছিলেন উপদেষ্টা একজন—কোন্ বিদেশি প্রতিনিধি, মিস্টার এ্যালাস্টার—কীভাবে যেন রুমুর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়ে যায়। সেই সূত্র ধরে তাঁর গাড়িতেই একবার তাদের বাড়িতে এসেছিলেন এ্যালেস্টার, ভাঙা ভাঙা বাংলায় ওদের আব্বার সঙ্গে ওদের তিন বোনের সঙ্গে গল্প করেছিলেন। বলেছিলেন আফজাল হোসেনকে হেসে হেসে—আপনার তিন মেয়েই তো খুব সুন্দর আছে। তারপর একদিন পূর্বাণী না শেরাটন থেকে ওদের নাম-না-জানা অনেক দামি দামি খাবার নিয়ে একাই চলে এসেছিলেন। স্বভাবসুলভ খোলামেলাভাবে শাহাদাৎকে একথা জানিয়েছিল রুমু। ওরে বাবা, তাই নিয়ে কী রাগ শাহাদাতের। বহু কষ্টে তাকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করেছিল রুমু। তারপর থেকে এ্যালেস্টার শাহেব যে কয়েক মাস বাংলাদেশে থেকেছে, রুমু তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছে।

কিন্তু ডাক্তার সালাহউদ্দিন আহমদ তো ভারি আশ্চর্য লোক। এক সপ্তা পরেই আবার উদয় ডাক্তার শফিক।

বলল—দ্যাখেন, ওর কী হয়েছে জানি না। সালাহউদ্দিন নিজে তো আসতে পারে না। তাই বারবার আসতে হচ্ছে আমাকে। ও আর একটা প্রস্তাব দিয়েছে। এতে আপনি কিন্তু না-করতে পারবেন না।

—কী? আফজাল হোসেনের গলায় কোনো উৎসাহের সুর ছিল না।

—সালাহউদ্দিন আপনার যে-কোনো একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। বিশ্বাস করুন, ও খুব ভালো মানুষ। ওর বেশি বন্ধুও নেই। আমিই সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। ওর আরো দু-তিনজন বন্ধু আছে। সামনে সপ্তায় আমি ওদের নিয়ে আসব। আর ওর মা বয়স্ক মহিলা। উনি ঠিক আসতে পারবেন না। আপনারা গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে দেখবেন। উনিও খুব ভালো মানুষ। আমাদের—ডাক্তার সালাহউদ্দিনের বন্ধুদের—উনি মায়ের মতো আদর করেন। দয়া করে আপনি আপনার মেয়েদের বুঝিয়ে বলুন। আর যে-কাউকে দিয়ে খবর নিন ওদের।—ডাক্তার শফিক অনেকক্ষণ ধরে প্রায় কাকুতি-মিনতি করছিল।

ডাক্তার শফিক চলে যাবার পরে আবার স্থাণুর মতো বসে থাকলেন আফজাল হোসেন। কিছুই তাঁর মাথায় ঢুকছিল না।

রুমু রানি রোজি তিনজনকে আজ ড্রয়িংরুমে নিজেই ডাকলেন। ওরাই ঠিক করুক।

তারপর শোবার ঘরে ঢুকে শার্ট-প্যান্ট পরলেন। ফুল-হাতা সোয়েটার পরলেন। ডাক্তার শফিকের আসার কথা ছিল না আজ। হঠাৎ এসে পড়েছিল। আফজাল রোজই শেভ করেন তিনি।

আফজাল হোসেন বেরিয়ে যাবার পরে রুমু রানি রোজি ঘরে রইল। তিন জনের মুখেই হাসি। আজ রানিও হাসছে।

রুমু বলল—রানি, তুই রাজি হয়ে যা। পাগলামি করিস্‌নে। ইশ, আম্মা বেঁচে থাকলে আজ কী যে খুশি হতেন।

রানি বলল—অসম্ভব। বলেছি তো, এখন আমি বিয়ে করার কথা ভাবছি না। তুমি বরং—

রুমু বলল—তাহলে শাহাদাৎ আমাকে আস্ত রাখবে? খুন করে ফেলবে একদম। আমার উপায় নেই রে!

রানি রুমু দুজনই তাকাল রোজির দিকে।

রুমু বলল—কি রে, রোজি? তুই কি বলিস?

রোজি বলল—আমি রাজি।—বলে লজ্জায় রুমু রানি দুজনকেই জড়িয়ে ধরল ॥

ছবির মতো

পুতুল

ফরিদ বলছিল—এটা কেমন হবে?

আমি বলছিলাম—কিছু হবে না। আমি তো আর মিথ্যে কিছু লিখছি না। তুমি তো জানো, ছল-চাতুরী আমি পছন্দ করি না। আব্বা-আম্মা আমাকে মানুষ করেছে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েই। তা না-হলে কি তোমাকে বিয়ে করতে পারতাম?

ফরিদ তখন হেসে বলেছিল—ঠিক আছে। কর্ত্রীর ইচ্ছায় কর্ম। তারপর উপরের পাটির কয়েকটি দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে বলেছিল—সব ব্যাপারেই তো তুমি কর্ত্রী!

—এই, অসভ্যতা কোরো না। আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম।

কিন্তু মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিলাম ওর দিকে। ওকে কোনোদিন বলিনি, ওর এই উপরের দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ানো দেখলে কী সুন্দর লাগে ওকে! যতই বলি, এভাবেই যেন ওর একটা অনুমোদন নিয়ে নিলাম।

খসড়া একটা তৈরি করেছিলাম আগেই। সেটাই ওকে কয়েকবার পড়ে শোনালাম।

সুধী,

আগামী শুক্রবার বাদ মাগরিব আমার আব্বা স্টুডি জামান-এর স্বত্বাধিকারী, জনাব আতিকুজ্জামান বিয়ে করছেন শরিফাকে। শরিফা জনাব মোহাম্মদ আবদুল খালেকের ভাগনি।

আপনি/আপনারা এই বিয়েতে আমাদের বাড়িতে এলে আমরা সবাই খুব খুশি হব।

পুতুল

নীলখেতের যমুনা প্রেসে আমাদের স্কুলের ১০-বছর পূর্তি উপলক্ষে একটা স্মরণিকা ছাপা হয়েছিল। আমারই তত্ত্বাবধানে। ওই প্রেসেই ছাপতে দিলাম। বিয়েতে ৫০জন লোকও হবে না—যদিও খাবার আয়োজন করা হচ্ছে ৬০-৭০ জনের—কিন্তু কার্ড ১০০টিই ছাপতে দিলাম। খালেক শাহেবের বাড়িতে নড়াচড়ার জায়গা নেই। আর আব্বা যে বাড়িতে থাকেন তার বাড়িওয়ালা রহমতউল্লাহ শাহেব তো আব্বাকে ভারি ভালোবাসেন। কাজেই ওসব ক্ষেত্রেও কোনো নিয়ম মানা হলো না। বর কনের বাড়িতে যায়—এটাই তো আমাদের বিয়ের নিয়ম। আজকাল তো

কমিউনিটি সেন্টার। সেসব ঘটা করার সাধ বা সাধ্য কোনোটাই নেই আমাদের। বিয়ে তো শুক্রবার দিনেরবেলাতেই হয়ে যাবে। রাত্রিবেলা আর কিছু না—একটু হইচই, খাওয়া-দাওয়া। খুব আপনজন ছাড়া কাউকেই বলা হচ্ছে না। ফরিদের বাবা-মাকে দেশে কার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা আসতে পারবেন না। আসুন, তাও আমরা চাই না। বাড়িওয়ালার লোকজন, আমরা—আমাদের বলতে নানি, ছোট মামা—অন্য মামারা আসবেন না, খালেক শাহেবের কয়েকজন, আব্বার দু'একজন বন্ধু, দু'একজন আত্মীয়। এই। তাও বাবুর্চি ডেকেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আব্বা আবার এসব ব্যাপারে হুঁশিয়ার। নিজের সাজগোজের ব্যাপারে যেমন, তেমনি লোককে খাওয়ানো-দাওয়ানোর ব্যাপারে যেন কমতি না পড়ে। খুব দামি জিনিসে না-হলেও আমাদের ঘরদোরও তো ছবির মতো সাজানো। সেও তো আব্বারই নিজের হাতে সাজানো, আম্মা এসব পারত না।

আমিই তো এই বিয়ের প্রস্তাব করেছিলাম।

এখন বিয়ের জন্যে ঘর সাজাচ্ছি।

আর আমার জন্যে চোখ ভরে উঠছে পানিতে।

সবাই ভাবছে আমার কত উৎসাহ, আমি বোধহয় আম্মাকে ভালোবাসতাম না। ভুল। মিথ্যে সব। আব্বা একা একা জীবন কাটাবে? এই চিন্তা করেই-না এই বিয়ের ব্যবস্থা করেছি।

এই বিয়ের ভাবনা মাথায় আসার পর পুরনো ঢাকায় নানির বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম ফরিদকে নিয়ে।

নাতজামাইকে নানি খুব আদর করে খাওয়ালেন।

আমি ভেতরে গিয়ে নানিকে যখন একথা বললাম, নানি প্রায় ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

তারপর কাঁদতে কাঁদতে বললেন আমার বয়েস হয়েছে, আমাকে কেন আজরাইল দেখতে পেল না! বুলবুল! আমার বুলবুল!—তারপর কাঁদতে কাঁদতেই বললেন—কিন্তু জামান একদিনের জন্যেও আমার মেয়েকে একফোঁটা কষ্ট দ্যায়নি। ওর তো এ দেশে কেউ নেই। তোমরাও তো বিয়ে হয়ে গেল। ও এই বয়েসে একা থাকবে কী করে? তুমি ঠিকই ভেবেছ, মা। জামানের মতো ছেলে হয় না। তারপর একটু শান্ত হয়ে বললেন—যে মেয়েটার কথা বললি, ওরা কি রাজি হবে?

ও—অসুবিধে হবে না। কাঁদতে কাঁদতে আমি বলেছিলাম। ফরিদকে এসব কিছুই বলি না। আমাকে ভেজা চোখে ড্রইংরুমে ফিরতে দেখে ও একটু অবাক হয়েছিল।

জামান

বুলবুল, পুতুল আর আমি আমাদের তিনজনের ছোট সংসার। কী সুখেই না ছিলাম আমরা! এখন মনে হয়—সুখে-দুঃখে মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত সুখেই।

কোথাও কিছু না, সেই বুলবুল—কলেজে পড়তে পড়তে যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আমার, সে হঠাৎ অনারোগ্য এক অসুখে মরে যাবে, কে ভাবতে পেরেছিল।

আর মরল কিনা কিরকম একটা অসময়ে। এক বছরও ছিল না আমাদের বিয়ের ২৫ বছর পুর্ণ হতে। বিয়ের রজতজয়ন্তী বুলবুল বেশ জমকালোভাবে উদযাপন করবে, ভেবে রেখেছিল এটা। ওর একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিলাম। কত টাকাই বা ছিল তাতে! কিন্তু প্ল্যান করেছিল ওই টাকা থেকেই আমাকে কি উপহার দেবে। আমি ভেবে রেখেছিলাম, অনেকদিন তো দেওয়া হয়নি, ওকে একটা সোনার নেকলেস কিনে দেব, আর সম্ভব হলে একটা হিরের আংটি।

সব শেষ হয়ে গেল যখন ওর জরায়ুতে ক্যান্সার ধরা পড়ল। আমার টাকা, ওর জমানো টাকা, পানির মতো শেষ হয়ে গেল কয়েক মাসেই। শাশুড়ি টাকা দিলেন অনেক। কলকাতায় ঠাকুরপুকুরে নিয়ে গেলাম, বেশ কয়েকবার। রে দেওয়া হলো। প্রথমবার প্লেনেই গিয়েছিলাম। তারপর বাসে যাতায়াত করতাম। কিছুতেই কিছু হলো না। ঢাকার ডাক্তারেরা যা বলেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তা-ই হলো। কয়েকটা মার ঘোরের মধ্যে কাটল। তারপর একদিন শেষ হয়ে গেল সব।

পুতুল আমাদের একমাত্র মেয়ে। একমাত্র সন্তান।

বুলবুল ভাবত, মেয়ে হওয়ায় আমি হয়তো অখুশি। কিন্তু ওর হয়তো নিজেরই কাম্য ছিল ছেলে।

বহু কষ্টে ফটোগ্রাফির একটা দোকান দিয়েছি। স্টুডিও জামান। সেখানেই দিনরাত্রি কাটে আমার। ছুটির একটি দিন ছাড়া।

তার মধ্যেও বুলবুলের সঙ্গে একটা দিন বেরোতে হলে আমার নারিন্দায় ওদের পীরশাহেবের কাছে। পীরশাহেবের কাছ থেকে পানিপড়া নিয়ে এল। পীরশাহেব মেয়েদের আলাদা দ্যাখেন, বাড়ির ভেতরে। আমি বাইরের ছোট জাজিমপাতা আশ্চর্য শান্ত ঘরে বসলাম। ভেতর থেকে বেশ ছোট কাপে চা এল। আরো দুএকজন পুরুষ ছিলেন সেখানে। একজন বোধহয় ব্যবসায়ী। কথাবার্তায় মনে হলো নিয়মিত আসেন। বললেন—হুজুর, মেশিন এসে গেছে চিটাগাঙে কিন্তু কিছুতেই টাকার ব্যবস্থা করতে পারছি না। আপনি একটু দোয়া করেন। পীরশাহেব দোয়া পড়ে ওকে একটা তাবিজ দিলেন।

আমি কিছু বলছিলাম না।

অবাক হয়ে ঘরটা দেখছিলাম। ওপাশে তাকের উপরে অনেক পুরোনো বইপত্র। আরবি-ফার্সি-উর্দুতে লেখা বলে মনে হচ্ছে। মেঝের উপর একটা বড় বাকশোমতন। তার ওপাশে পীরশাহেব বসে। কত কী যে ছড়ানো রয়েছে নিচে।

আমরা একসঙ্গে ফিরে পুরোনো ঢাকাতেই শ্বশুরবাড়িতে গেলাম। সেখানে গিয়ে বুলবুল যে কথা হাসতে হাসতে বলল তা শুনে পীরশাহেবের উপরে আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

পীরশাহেব বলছেন—আমি শুধু যেজন্য এসেছ আমার কাছে, তার জন্যে দোয়া করতে পারি। দেনেওয়ালা তো আল্লাহতাআলা। আমার যদি ওরকম ক্ষমতা থাকত তাহলে তো আমার ছেলে থাকত।

পীরশাহেবের আমার মতো একটিই সন্তান—একটি মেয়ে। বুলবুলদের চেয়ে অনেক বড়।

শুনে আমিও হেসে ফেলেছিলাম।

আমার কথা একটু বলি।

আমার জন্ম কলকাতায়। আমদের বাড়ি ছিল পার্ক সার্কাস এলাকায়। আব্বার একটা ফটোগ্রাফির দোকান ছিল সেখানে। আমাদের ১১ ভাই-বোনের মধ্যে আমি ছিলাম সবচেয়ে ছোট। আব্বা হঠাৎ মারা গিয়েছিলেন। আমি তখন স্কুলে পড়ি। কী একটা পরীক্ষা হচ্ছিল, ইতিহাস পরীক্ষা, এমন সময় বাড়ি থেকে লোক এল আমাকে নিতে। আমি ঐ অর্ধসমাপ্ত রচনার সর্বশেষ লাইনে কোনো এক সম্রাটের মৃত্যুর কথা লিখেছিলাম। যে শিক্ষক আমাদের গার্ড দিচ্ছিলেন, তিনি খোলা পাতার ঐ লাইনটি পড়ে নাকি বলেছিলেন—ও বাড়িতে গিয়ে মৃত্যুসংবাদ পাবে। বেশি কথা বলার দরকার নেই, বড় ভাইরা আব্বার দোকান দখল করেছিল, রোজ রোজ খোঁটা শুনতে হতো, পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার এক নানা সরকারি চাকরি করতেন—তিনি ঢাকায় যাবেন, আমি অনেক খোশামোদ করে তাঁর সঙ্গে ঢাকায় চলে আসি।

ঢাকায় তখন নতুন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি শুরু হয়েছে মাত্র। আমি অভিনয় কোনোদিন করিনি, কিন্তু দু'একজন আমাকে সিনেমার সুযোগ দেবেন বলায় যাতায়াত শুরু করি। সিনেমায় চান্স পাইনি। একজন ক্যামেরা চালানো শেখাতে লাগলেন তাঁর অ্যাসিসটেন্ট হিশেবে। জমিদার ছিল আমাদের এক আত্মীয় মামা। ছ'ফুটের উপরে লম্বা, বিশাল চেহারা, বকস ক্যামেরায় ছবি তুলে এনে দেখাতেন আমাদের। অনেক পরে বুঝেছি, আমাদের দু'তিনটি বোনের আকর্ষণেই তিনি আসতেন। যাই হোক, ভেতরে ছবি তোলার প্রতি সেই থেকে আমার একটা আকর্ষণ হয়েছিল। সেই মামার কিছু ছবি আব্বার স্টুডিওতে ব্যবহার করা হতো। সেই জমিদার মামা মাঝে মাঝে আব্বার দোকানেও বসতেন। এখন বুঝি, পার্ক সার্কাস এলাকার দু'একজন মেয়ে, বা মহিলা বলা যেতে পারে, এই মামার টানে দোকানে আসতেন।

তারপর যখন দেখলাম, বছরের পর বছর ক্যামেরাম্যানের সহকর্মী হিশেবেই কাজ করে যাচ্ছি, তখন হুঁশ হলো। আম্মা তখন বেঁচে। কলকাতায় গেলাম। আম্মা কিছু টাকা দিলেন। আর সেই নানা—যাঁর সঙ্গে কলকাতা থেকে এসেছি—তিনিও। একজনের সঙ্গে পার্টনারশিপে একটা স্টুডিও গড়লাম। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখি আমাদের যৌথ এ্যাকাউন্টের টাকা কীভাবে কমে যাচ্ছে। কোনোক্রমে অনেক ক্ষতি সহ্য করেও আলাদা হয়ে গেলাম। ছোট্ট একটা দোকান নিলাম। নাম দিলাম 'স্টুডিও জামান।'

বুলবুল একদিন আমার দোকানে এসেছিল তার দুই বান্ধবীর সঙ্গে ছবি তুলতে। তারপর দেখি একদিন এল আর এক বান্ধবীর সঙ্গে। তারপর একদিন একা। এরকম কয়েকদিন আসার পর একদিন সরাসরি আমাকে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা, আপনি কি বিয়ে করেছেন? আমি বললাম—না, আমাকে কে আর বিয়ে করবে—করা হয়নি—একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। আমার আপনজন

কে আছে জিজ্ঞেস করায় বললাম—মা আছেন, কলকাতায়, এখানে কেউ নেই। সেই নানার কথা চেপে গেলাম। তারপর হঠাৎ একদিন আমার দোকানে দু'জন বয়স্ক লোক এলেন।

আমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন—বুলবুলের সঙ্গে বোধহয় তোমার পরিচয় হয়েছে। আমি বুলবুলের চাচা। আমরা তোমাকে বুলবুলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাই। কলকাতা ঠিকানা দাও। তোমার মাকে লিখব।

আমি বললাম—আমি অনেকবার আম্মাকে ঢাকায় আসতে বলেছি। আম্মা আসবেন না। ওখানে আব্বার কবর রয়েছে। সব মিলিয়েই—

ওঁরা বললেন—তবু তুমি ঠিকানা দাও। তোমার অনুমতি ছাড়া তো বিয়ে হতে পারে না।

আমি ঠিকানা দিলাম।

অনেকদিন পর আম্মাকে একটা চিঠিও দিলাম। অনুমতি প্রার্থনা করলাম বিয়ের।

যথাসময়ে আম্মার অনুমতি আমি পেলাম। ওঁরাও গেলেন। তবে আমি যে বলেছিলাম আম্মা আসবেন না, সেটা সত্যি হলো।

হঠাৎ একদিন আমার অপরিচিত এক ভদ্রলোক এলেন। আম্মা কলকাতা থেকে পাঠিয়েছেন। এক সুটকেস-ভরা জিনিসপত্র।

যে-বন্ধুর সঙ্গে দোকান নিয়ে মনোমালিন্য হয়েছিল, তাকে নিয়ে এবং আর কয়েকজনকে নিয়ে বিয়ে করতে গেলাম।

শাশুড়ি আমাকে নাম দিয়েছিলেন 'হিরো'।

ওরা নিজেরা আলোচনা করছিলেন আমার সামনেই বুলবুলের পছন্দ আছে।

মেয়েরা দু'একজন ফোড়ন কেটে এও বলেছিল—আমার সঙ্গে বুলবুলকে নাকি মোটেই মানায়নি।

বিয়ের পরে বুলবুলের সে কী খুশি!

আমার সামনেই বলল—আমার বরের মতো সুন্দর বর পাবে না কেউ!—কী আনন্দে কেটে গেল পঁচিশ বছর।

না, পঁচিশ বছর পুরো হতে পারল না। কালব্যাধি ধরা পড়ল তার আগেই।

—একটা ছেলে দেখে আমি থাকতে থাকতে—পুতুলের বিয়ে দিয়ে দাও। রোজ বলত।

একদিন পুতুলকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে পুতুল বলল—ছেলে আমার পছন্দ করা আছে।

মুহূর্তে আমার মনে হলো, বুলবুলও তো এমনিভাবে আমাকে একদিন পছন্দ করেছিল।

সব ঠিক হয়ে গেলেও বুলবুলের অবস্থা অতি দ্রুত এত খারাপ হতে লাগল যে ওর জীবদ্দশায় বিয়েটা দেওয়া গেল না।

শেষ যেদিন বেরিয়েছিল, সেদিনকার কথা মনে আছে। বেইলি রোডে একটা নাটকের অর্ধেক দেখে বেরিয়ে আসতে হলো। বুলবুলের পছন্দ সব নিষিদ্ধ খাবার

খেল সেদিন। আর রাস্তায় একটা সুন্দরী মেয়ে দেখলেই বলে উঠছে—এই মেয়েটার সঙ্গে বিয়ে হলে খুব ভালো হয় তোমার। তাই না!

পরদিন সব শেষ।

শরিফা

সবকিছু স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। কোত্থেকে কী হয়ে গেল।

এই তো কিছুকাল হলো জামান ভাই—এখন আর জামান ভাই কী করে বলব, তবু এই সম্বোধনটাই মাসখানেক পরেও এসে যাচ্ছে—আর বুলবুল ভাবি আমার বিয়ের জন্যে কত-না চেষ্টা করেছেন। বাপ-মা-মরা মেয়ে আমি। দু'ভাই আছে বটে, মায়ের পেটেরই ভাই, তারা কিন্তু মরে গেছি না বেঁচে আছি কিছুই খোঁজ নেয় না। বড় মামা যদি না-দেখতেন, কোথায় ভেসে যেতাম। মামিও ভালোই বলব, আমার মতো অপয়া মেয়েকে খেতে-পরতে-থাকতে দিচ্ছেন। কোনো-রকমে ম্যাট্রিক পাস করেছি, তারপর কলেজে ভর্তিও হয়েছিলাম, কিন্তু পড়ালেখায় আমার মন বসে না।

এরকম করে গেল কিছুদিন।

মামা মা'র সবচেয়ে বড় ভাই। মামা-মামিরও বয়স হয়েছে। অবস্থাও ভালো না। আমাকে টানবে কদ্দিন?

জামান তো নায়কদের মতো সুদর্শন, একটা ফিল্মে নেমেছিলও, তবে ছবিটা শেষ হয়নি। দু'একটা বিজ্ঞাপনে মুখ দেখিয়েছে। এই বয়সেও যে-চেহারা যে-রঙ, এখনো নায়ক হিশেবে দিব্যি মানিয়ে যায়। হয়তো ফিল্ম লাইনের পলিটিকসের জন্যে জামান ভাইয়ের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি। মামার জোর, টাকার জোর—বেচারার তো কিছু নেই। আছে শুধু অসম্ভব ভালো ব্যবহার, মানুষের মন জয় করার আশ্চর্য ক্ষমতা।

বুলবুল ভাবি আর জামান ভাই আমার বিয়ের জন্যে কত চেষ্টা করেছেন। মামা হয়তো বলেছিলেন কোনোদিন। প্রতিবেশী হিসেবে আমি প্রায়ই বুলবুল ভাবিদের বাড়িতে যেতাম। বুলবুল ভাবি, পুতুল ওদের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে যায় আমার। হঠাৎ এক-আধদিন জামান ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ছুটির দিনই সাধারণত।

চেষ্টা করেও ওরা আমার বিয়ে দিতে পারেননি। আমার মতো কুরূপা ক্যাংটাকে কে বিয়ে করবে? কলেজে কয়েকটি মেয়ে আমাকে নাম দিয়েছিল 'কঞ্চি'। কী নিষ্ঠুর হতে পারে মেয়েরা!

আমি একদিন প্রতিবাদ করেছিলাম।

—এই তোমরা আমাকে কঞ্চি বলো নাকি?

—না, তোমাকে না। কঞ্চিকে আমরা কঞ্চি বলি—একটি মেয়ে বলল

আরেকটি মেয়ে বলল—না, উঁচু-নিচু নেই কিনা, তাই কঞ্চি বলি।

অন্য একটি মেয়ে রীতিমতো একটি অসভ্য কথা যোগ করল। তারপর কি দাঁড়িয়ে থাকা যায় সেখানে?

মেয়েগুলো যদি জানত আমার বাপ-মা নেই, মামার বাড়িতে থেকে কলেজে পড়ছি, তবে বোধহয় এতটা নির্মম হতে পারত না।

কিন্তু আমি এত মুখচোরা, এত হীনমন্য, মুখ ফুটে ওই সত্যি কথাটা ওদের জানিয়ে দিতে পারলাম না।

আর কেউ না, কিন্তু ওই দলের মেয়েগুলোই ছিল একটু ফাজিল।

আর একদিন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে করিডোরে পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলছিল—আচ্ছা, আমাদের এই মেয়েদের কলেজে আবার একটা ছেলে কেন পড়ে, বল তো?

আর একজন বলল—ছেলে না মেয়ে তুই বুঝলি কী করে?

আমি তাড়াতাড়ি সরে এলাম সেখান থেকে, যাতে আর কোনো কথা শুনতে না-হয়।

সেজন্যে নয় অবশ্য, পড়ালেখাতে আমার একটুও মন ছিল না। সেজন্যেই কলেজ ছেড়ে দিয়েছিলাম। কলেজের মাইনের টাকা, যাতায়াতের টাকা কিছুই অন্তত চাইতে হবে না। মামাকে বলে—মামা খুব বারণ করছিলেন, আমি শুনিনি—বইগুলো নীলখেতে পুরোনো বইয়ের দোকানে বিক্রি করে দিয়ে এলাম একদিন। মামাকে টাকা দিতে গেলে মামা নিলেন না। বললেন—তুই খরচা করিস।

নিঃসন্তান প্রায় দরিদ্র মামা-মামি কিন্তু আমাকে রূঢ় কথা বলেননি কোনোদিন। মামার ছিল সরকারি চাকরি। সামান্য পেনশনের টাকার মধ্যে আমাকে পাত্রস্থ করার একটা চিন্তাও ছিল তাঁদের।

এর মধ্যে বেশ কটি ছেলে দেখল আমাকে। কেউ পছন্দ করল না। একজন রাজি হলো বটে, কিন্তু ছেলেকে কী কী দেওয়া হবে তার একটি তালিকা দিতে বললেন ছেলের বাপ। আজো মনে আছে, কী রাগ তখন জামান ভাইয়ের! যে-লোকটাকে হাসিমুখে ছাড়া দেখিনি কোনোদিন, সেদিন দেখলাম কী পরিমাণ রেগে যেতে পারে সেই মানুষটা। মামার তো সেসব দেওয়ার কোনো ক্ষমতাই ছিল না।

হয়তো এভাবেই কোনোদিন কোনো ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যেতে পারত আমার, আমারই মতো হতভাগ্য কারো সঙ্গে, কিন্তু তার আগেই বুলবুল ভাবির অসুখটা ধরা পড়ল।

যত ঘনিষ্ঠই হই, সহজে জানতে পারিনি।

জামান ভাই যখন বুলবুল ভাবিকে নিয়ে কলকাতায় যাবেন, তখন পুতুলকে একা বাড়িতে রেখে যাবেন কী করে? তখনই মামাকে সব বললেন তাঁরা। আমিও জানলাম। পুতুলকে সঙ্গ দেওয়ার জন্যে ওদের বাড়িতে থাকতে লাগলাম মাঝে মাঝেই।

আশ্চর্য বলতে হবে, বুলবুল ভাবির চেহারা যে খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল, বা স্বাস্থ্য যে একেবারে ভেঙে পড়েছিল—তা নয়। মাথার চুল বোধহয় পড়ে যাচ্ছিল, রুমাল বেঁধে রাখতেন।

আস্তে আস্তে আমি বাড়ির লোকের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। বাথরুমে ধরে ধরে নিয়ে যেতাম। পেশাব করতে কষ্ট হতো খুব।

ডাক্তাররা কদ্দিন বাঁচতে পারেন পরিষ্কারই বলে দিয়েছিলেন।

জামান ভাই-ই একদিন বাড়িতে এসে মামা-মামিকে বলেছিলেন। আমিও সামনেই ছিলাম।

—সেবাযত্ন করে যতটা কষ্ট দূর করা যায়, এখন তো এছাড়া আর কিছু করবার নেই।—মামা বলেছিলেন।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে—তোর মামি তো নিজেই নড়তে-চড়তে পারে না। শরিফা, তুই যা পারিস—

জামান ভাই বলে উঠেছিলেন—শরিফা অনেক করছে।

শেষদিকটা রাতেও থেকেছি। পুতুল আর আমি পালা করে রাত জাগতাম। একটা মেয়েলোকও আলাদা করে রেখে দেওয়া হয়েছিল।

বুঝি না, পৃথিবীতে ভালো মানুষদেরই বোধহয় খারাবি হয় বেশি।

ওই মৃত্যুমুখী অসুখ, তার মধ্যে বুলবুল ভাবি হঠাৎ হঠাৎ বলতেন—তোর একটা উপায় করে যেতে পারলাম না, শরিফা।

অসুখের পর থেকে উনি আমাকে ভালোবেসে 'তুই' বলতে আরম্ভ করেছিলেন।

ইশ, ভাবি কি জানতেন ঐরকম হবে? উপায় তিনি নিজেই করে দেবেন?

বিয়ের রাতে দরোজা বন্ধ করে এসে যখন আমার সামনে এলেন, আমি খাটের কিনারায় গুটিশুটি হয়ে বসে, উনি হাসছেন, বললেন—দ্যাখো, শেষ পর্যন্ত তোমাকে পাত্রস্থ করে ছাড়লাম তো—

কেঁদে ফেললাম আমি—আমি কি কোনোদিন এভাবে পাত্রস্থ হতে চেয়েছিলাম?

উনি কথা বলছেন না। তাকিয়ে দেখি—ওনার চোখেও পানি চিকচিক করছে।

যে খাটে মারা গিয়েছিলেন বুলবুল ভাবি, সে-খাট অনেক আগে বিদায় করে দিয়েছেন জামান। একটা সিঙ্গেল খাট কিনে নিয়েছিলেন। আমাদের বিয়ের সময় আবার ডবল খাট কিনেছেন।

একদিন ওনার স্বভাবসুলভ হাসতে হাসতে বললেন—আচ্ছা, অনেক দিন তো হয়ে গেল, 'আপনাআপনি' বাদ দিয়ে এবার 'তুমি' করে বলো আমাকে।

আমি বললাম—সে আমি কোনোদিন বলতে পারব না। আমি আপনাকে 'আপনি' ছাড়া আর কিছু বলে ডাকতে পারব না।

উনি বললেন—কেন, আমার তোমার চেয়ে অনেক বয়েস বেশি বলে?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম—না। না। সেজন্যে না। সেজন্যে না।

উনি যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন। এ নিয়ে আর কোনোদিন কথা বলেননি।

পুতুলকে নিয়ে ঠিক সেরকম ঘটনাই ঘটল একদিন। বিয়ের পর মতিঝিল থেকে রোজই আসত পুতুল, কখনো ফরিদকে নিয়ে, কখনো একা।

মাঝে বেশ কিছুদিন আসেনি। দিন পনেরো।

আমি আকুল হয়ে ওঁকে বললাম—আচ্ছা পুতুল যে আসছে না—খোঁজ নেবেন না একবার?

উনি বললেন—ও, তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। ফোন করেছে পুতুল। পরীক্ষার খাতা দেখা নিয়ে খুব ব্যস্ত। খাতা দেখা শেষ হলেই আসবে।

এল কয়েকদিন পর। ফরিদকে নিয়ে এল। আর একগাদা খাবার-দাবার। পুতুল যেরকম। ফরিদকে ড্রইংরুমে বসিয়ে শোবার ঘরে এসে নিজেই বলল—শরিফা-বু, আজ রাতে এখানে খাব আমরা।

আমি বললাম—খাবি, আবার কী। কতদিন পরে এলি, বল্ তো?

আমারও সম্বোধনের লাইন পাল্টে যাচ্ছিল। আমি পুতুলকে আগে 'তুমি' বলতাম', আজকাল বলি 'তুই'।

পুতুল বলল—ফরিদা-বু, ইশ, এই কদিন তোমাকে দেখিনি—এত সুন্দর হয়ে গেছ তুমি?

আমি বললাম—সত্যি বলছিস?

সত্যি না তো কী? আয়নায় নিজেকে দেখতে পাও না?

কথা ঘোরানোর জন্যে বললাম—সে না হয় হলো, কিন্তু তুই আমাকে 'মা' বলিস না কেন?

পুতুল হঠাৎ একদম গম্ভীর হয়ে গেল। বলল—তোমাকে 'মা' আমি কোনোদিন বলব না।

গম্ভীর হয়ে গেলাম আমিও। বললাম—জানিস, বুলবুল ভাবি তার এই কঠিন অসুখের মধ্যেও আমার বিয়ে হচ্ছে না বলে চিন্তা করত।

আমার কান্না-ভেজা গলা শুনে পুতুল আমাকে জড়িয়ে ধরল।

বললাম ভেজা গলাতেই—তোদের সঙ্গে বুলবুল ভাবি এমন বাঁধনে জড়িয়ে রেখে যাবে আমাকে, তা কি কোনোদিন ভাবতে পেরেছিলাম?

পুতুলও আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিল। বলল—জানো, সেদিন আব্বার স্টুডিওতে গিয়েছিলাম। দেখলাম দোকানের নাম বদলে ফেলেছে। নাম রেখেছে 'স্টুডিও বুলবুল।' আম্মার একটা বড় ছবি ছিল না দোকানে? তার চেয়ে বড় করে আম্মার একটা ছবি টাঙিয়ে রেখেছে।

আমি বললাম—ওঠ্। রান্নাঘরে চল্ ॥

আশ্বিন-কার্তিক

সকাল আটটা

তখনো ভালো করে ঘুম ভাঙেনি।

ফোন বেজে উঠল।

খাটের শিয়রের পাশেই ফোন। ফোন ধরল হাত বাড়িয়ে।

—হ্যালো।

—সালাম আলায়কুম, শামিম ভাই। ভালো আছেন? আমি মলি বলছি।

—আলায়কুম আস্‌সালাম। হ্যাঁ, আছি।

—শামিম ভাই, আজ আমাদের বাড়িতে এফতার করেন। ভাবিকে নিয়ে আসেন। অনেককে বলেছি। আটশোজন।

—আচ্ছা, দেখি। আটশোর জন্য দাওয়াতটা শুনে চমকাল না শামিম।

—*ব্রহ্মপুত্র* নামে যে-পত্রিকা বেরিয়েছিল তার জন্যে ৫০০ টাকা, আর একটা লেখার কথা আপনাকে বলেছিলাম-না, প্রবন্ধ, জীবননান্দের ছোটগল্পে বিদেশি প্রভাব, তার জন্যে ১৫০০ টাকা আমি বলেছি—এই ২০০ টাকা নিয়ে—

—আজকেই অফিসে চলে আসেন— যেন মুহূর্তে ঘুমের জড়তা ভেঙে গেল, সুস্পষ্ট গলায় শামিম বলে।

—প্রবন্ধের টাকাটা হাতে পাইনি এখনো, advance দিতে বলেছি—

—সামনের সপ্তায় অফিসে চলে আসেন তাহলে—

হাসতে হাসতে খানিকটা খাপছাড়াভাবেই বলল মলি—আপনাকে যে ভালোবাসি তা তো সরাসরি বলতে পারি না, আচার-আচরণের মধ্যে দিয়েই জানিয়ে দেই।

শামিম কী বলবে আর। হাসল।

মলি বলল—আসবেন কিন্তু।

শামিম বলল—দেখি— বলে ফোন রেখে দিল।

তখনই মিনা, তার স্ত্রী, চেঁচিয়ে বলল—তুমি কি যাবে? সোমা জিগেস করছে—

চেঁচিয়ে বলল শামিম—সাড়ে-আটটার দিকে রেডি হতে বলো—

মলি ইসলাম একটা পত্রিকা বের করে। *সঞ্চয়*। অনিয়মিতভাবে অনেক দিন ধরেই বের করে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সৈয়দ শামিম রেজার গল্প বের করে তার

পত্রিকায়। পুরোনো গল্পের পুনর্মুদ্রণ। এই তো সেদিন হঠাৎ দেখা আজিজ মার্কেটে। শামিম দেখেও না-দেখার ভান করে চলে যাচ্ছিল। মলিই ডেকে তার পত্রিকা বের করে দিল। নতুন সংখ্যা *সঞ্চয়*। প্রথমেই সৈয়দ রেজার গল্প। 'রৌদ্রের অন্ধকার'। নামটি নিয়েছে জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতা থেকে। জীবনানন্দ ছাড়া এরকম অভিব্যক্তি আর কার লেখাতেই বা আছে। কিন্তু এই গল্পটা না *সঞ্চয়েই* আর-একবার ছেপেছিল মলি ইসলাম? কী জানি। ওর পত্রিকা যা-ই হোক, ভারি ভদ্র মেয়েটি। বলেছিল—শামিম ভাই, চা-টা খেয়েছেন?—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলে শামিম এগিয়ে যায় কবি সুমন দস্তিদারের সঙ্গে। সুমন দস্তিদারের সঙ্গে সেদিন দীর্ঘ আড্ডা দিয়েছিল শামিম। ওরা একটা পত্রিকা বের করার চেষ্টা করছে। জীবনানন্দের সম্পর্কে। সেখানে অতিথি-সম্পাদক থাকবে শামিম। পত্রিকার মূল উদ্যোক্তা অবশ্য মামুন রশিদ।

সকালবেলা দ্রুত প্রস্তুত হতে গিয়ে মলি ইসলামের কথা মনেও থাকে না শামিমের।

সকাল দশটা

—এই বিস্কুটের টিনটা কোথাকার, মানে কোন দেশের?—সৈয়দ শামিম রেজা জিজ্ঞেস করল।

—মালয়েশিয়ান। মিঠু এন্টারপ্রাইজের দোকানি বলল।

—আচ্ছা। হ্যাঁ। এটাই খুঁজছি আমরা। সোমা বলে—দাম কত?

—১৬৩ টাকা। দোকানির জবাব।

সোমা বলল—কী বলেন! সেদিন আমরা অন্য একটি দোকনে এই দাম দেখে নিইনি। দেড়শো টাকা দেব।

—এতে লাভ থাকে নাকি, আপা? আপনি ১ টাকা কম দেবেন। ১৫২ টাকা। এর নিচে নামতে পারব না।

—১৫২ টাকা হলে কত করে বিক্রি করব?

—১৭০-৮০। যে যে-রকম পারে। এসব তো বিদেশি জিনিশ, আপা। দাম লেখা থাকে না। সম্ভব হলে আপনি দুশো টাকাতেই বিক্রি করবেন। আপনার দোকান কোথায়, আপা?

সৈয়দ শামিম রেজা বলে—বেছে ফেল্ তো, সোমা। ক-টা নিবি?

—আব্বা—! মেয়ে ধমক দ্যায়।—এত তাড়াহুড়ো করলে হবে?

—আমার অফিস আছে, বুঝিস না?

—রোজই তো অফিস করছ। একদিন অফিস দেরি হলে কিছু হবে না। তারপর দোকানির দিকে তাকিয়ে বলে—আচ্ছা ভাই, বের করুন ৫টা টিন।

দোকানি বের করে বিস্কুটের টিনগুলো সাজিয়ে রাখে।

সৈয়দ শামিম রেজা বলে—না—না—একরকম রঙের নেওয়া যাবে না। সবুজ একটা, লাল দুটো, কিন্তু সবগুলো লাল নেবে না—

সোমা বলে—এটা তো লাল না, আব্বা, মেরুন।

—আচ্ছা, নে। বর্ণসচেতন শামিম, কিন্তু মেয়েদের রঙের বোধ আর চেতনাই আলাদা। মিনাকে দেখছে না দীর্ঘকাল! মেয়েকেও দেখছে অন্য আরো দুএকটি মেয়েকেও কী দ্যাখেনি?

সাবিনার কথা মনে আছে। সাবিনা—কী কমন নাম। শামিম ওর নাম দিয়েছিল বীণা। কী মধুর কণ্ঠস্বর! শামিম তখন ছোট একটা অফিসে। এলিফ্যান্ট রোডে। কত বছর আগে? কত আর—১৫/১৬/১৭ বছর আগে মাত্র। এর মধ্যে কোথা থেকে কোথায় চলে এসেছে সৈয়দ শামিম রেজা। জীবনে। সাহিত্যের নয় কি? ছোটগল্প লেখক হিশেবে বাংলা একাডেমী পুরস্কার পেয়েছে। উপন্যাস লেখার ফরমাশ আসে মাঝে মাঝে—ঈদসংখ্যার জন্যে, প্রকাশকের তরফ থেকে, কিন্তু শামিম তার গল্প-এলাকার বাইরে যায়নি। গল্প লেখে, গল্প নিয়ে আলোচনা করে, প্রবন্ধ লেখে গল্প সম্পর্কেই, এমনকি স্বাধীনতার পরে সৈয়দ শামিম রেজা *গল্পপত্র* নামের একটি লিটল ম্যাগাজিনও বের করেছিল। মাত্র ৫টি সংখ্যা বের হয়েছিল *গল্পপত্র*-এর। ঐ পত্রিকাসূত্রেই অফিসে এসেছিল বীণা—একজনের সঙ্গে, একটি গল্প নিয়ে। কিশোর। কিন্তু গল্প পড়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল। গল্পটি মোটের উপরে ভালো। কিন্তু অবাক হয়েছিল সাবিনা তথা বীণা-র শরীরী বর্ণনার দুঃসাহসিকতায়। কোনো মেয়ে যে এভাবে লিখতে পারে, জানা যায় না। কীভাবে যেন দিনে দিনে জড়িয়ে পড়েছিল বীণা-র সঙ্গে। বীণাকে সালোয়ার-কামিজ, শাড়ি, কত কী-ই-না কিনে দিয়েছে। আর ঐ সময়েই শামিম, যার নিজের রঙের নান্দনিক বোধ সম্পর্কে গোপন গর্বই ছিল বলতে গেলে, ধাক্কা খেল। রঙের যে এতরকম শেড্ হতে পারে, এত নাম, বাংলা নামই রঙের যে সূক্ষ্ম পার্থক্য এত, তা শামিম জানত না। শাড়ি-কাপড়ের দোকানে খিলখিল করে হেসে উঠত কিশোরী।

সেই বীণা—সেই সুমধুর সম্পর্কের বীণা—সময়ের জলস্রোতে একদিন হারিয়ে গেল কোথায়।

হঠাৎ একদিন ঐ এলিফ্যান্ট রোডেই দেখা হয়ে যায়।

—শোনেন! না-ডাকলে চিনতেই পারত না তাকে শামিম। আগের তুলনায় অনেক ফরশা, কিশোরী-ভাবটাই নেই, অনেক মোটা হয়েছে, সুদর্শনাও হয়তো। কিন্তু আগের সেই শ্যামলা তন্বঙ্গী মেয়েটাই কী ভালো ছিল না?

কিন্তু কোথায় যেন সেই পুরোনো জাদু। সেই অবিরল জলস্রোতের মতো কথা। সেই ধারায় কথার ধারার মধ্যে কীভাবে কফিহাউজে একবার যেতে আহ্বান না-জানিয়ে পারে। দেখা গেল : বীণা এখন এক ব্যাংকারকে বিয়ে করে সুখী গৃহিণী। কোথায় তার সেই কৈশোরক শরীরী আগ্রহ কৌতূহল দুষ্টুমি খারাপ খারাপ শব্দ নিয়ে খেলা শামিমকে আবার কৈশোরে ফিরিয়ে আনা, বিবাহ-বহির্ভূত উল্লাসের আস্বাদ দেওয়া। যেন আবার ভিন্ন মানুষে পরিণত করেছিল এক ঘণ্টায়।

হ্যাঁ, সব মনে পড়েছে শামিমের। আশ্বিন-কার্তিকের কোনো দিনই হবে। রোদের তাপ যখন কমে গেছে। দুপুরবেলাও কিরকম স্বপ্নময়। কোথায় একটি স্নিগ্ধতা লেগে থাকে।

এরকম দিনগুলোতে শামিমের ভিতরে যেন একটা উদাসী বাউল জেগে ওঠে। একা একা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। দিনগুলো যেন জ্যোৎস্নারাত্রির মতো, তার মনে হয়। এরকম দিনেই বীণাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

তা নাহলে সেই বীণা-ই যেদিন কোত্থেকে তার বাড়ির ফোন নম্বর জোগাড় করে বারবার বলছিল—আমি বীণা বলছি—বীণা—বীণা—, তখন শামিম বারবার জিগেস করছিল—কে? কে? একটু একটু তার সন্দেহ হচ্ছিল, বীণা, যার আসল নাম সাবিনা, কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না সে-ই কিনা, বীণা তখন 'শুনতে পাচ্ছেন না? কালা নাকি?' বলে ঝপ করে ফোন রেখে দ্যায়। এবং এটা নিয়ে তেমন কোনো মাথা ব্যথাও থাকে না শামিমের। যেন কথাটা এক কান দিয়ে অন্য কান দিয়ে বের করে দিয়েছে শামিম। এ্যাদ্দিন পরে কেন ফোন করেছিল বীণা, কী জানতে বা জানাতে চেয়েছিল, তার ফোন নম্বরই-বা কোত্থেকে জোগাড় করল—এসব কোনো-কিছুই ভাবল না শামিম।

সময়টা ছিল রাত্রি, আর আশ্বিন-কার্তিকের দিনরাত্রিও নয়।

এখন আশ্বিন-কার্তিকের সময়ই চলছে। আশ্বিন কি চলে গেছে? কার্তিক কি এসে গেছে? খবরের কাগজ বা বাংলা ক্যালেন্ডার না-দেখলে বোঝা যাবে না—এরকম দিন এখন।

যার এরকম দিনে বাংলাদেশের বৃহত্তম মুদি বাজারে ঢুকে বিখ্যাত গল্পকার সৈয়দ শামিম রেজা দরদস্তুর করছে। 'সোমা স্টোর'-এর জন্যে। তার মেয়ের দোকানের জন্যে।

এই-তো ক-দিন আগে চট্টগ্রামে এক সাহিত্য-সম্মেলনের নিমন্ত্রণে গিয়েছিল শামিম। সাধারণত, অন্তত বাংলাদেশে, গল্পকারদের নিয়ে আলাদা সম্মেলন হয় না। চট্টগ্রাম এই আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠান ছিল একদিনেরই। সভাপতিত্ব করতে রাজশাহী থেকে এসেছিলেন সুবিখ্যাত গল্পকার হাসান আজিজুল হক। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক 'বাংলাদেশের ছোটগল্প' নামে একটি পেপার পড়েছিলেন। তাতে সৈয়দ শামিম রেজা সম্পর্কেও সশ্রদ্ধ উল্লেখ ছিল। শিল্পকলা একাডেমী-তে অনুষ্ঠান হয়েছিল। নাচ-গান তো ছিল না। তবু এ ধরনের অনুষ্ঠানে লোক একেবারে কম হয়নি। শামিমের ভূমিকা ছিল মুখ্য আলোচকের। হাসান আজিজুল হক যে-তীক্ষ্ণ তির্যক ভঙ্গিতে ভালো বলতে পারেন, সভাপতির বক্তব্যে সেটা বোঝা গেল। পরদিনই ঢাকায় ফেরার কথা সকালে। ফেরার সময়টা একটু পিছিয়ে দিল। উদ্যোক্তারা গাড়ির ব্যবস্থা রেখেছিল। সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে নিয়ে গেল তারা। সমুদ্র তো দেখা হলোই মৃদু ঝিরিঝিরি বৃষ্টির ভিতরে। সৈকতের দোকানগুলো থেকে এটা-ওটা কেনা হলো। ১০০০ টাকায় ১০০টা মালা কিনে নিল শামিম। মেয়ের দোকানের জন্যে। অন্তত দ্বিগুণ-তিনগুণ দামে বিক্রি করতে পারবে।

এখন, একটা ট্যাকসি-ক্যাব নিয়ে জিনিশপত্র সমেত বাড়িতে এল শামিম।

এসে দেখল অফিসের গাড়ি এসে গেছে। আলম, একজন ড্রাইভারই হবে বোধহয়, তার সঙ্গে গল্প করছিল। স্যারকে দেখে এগিয়ে এল তাড়াতাড়ি।

শামিম বলল—একটু বোসো, আমি এখনই আসছি।

বেলা সাড়ে এগারোটা।

রোজার সময় এখন। সারাদিনই রাস্তায় ভিড়। জ্যাম। তবু তার মধ্যেই গাড়ির ভিতরে বসে থেকেই না শামিম দেখল সেই জ্যোৎস্নার মতো স্নিগ্ধ শান্ত কোমল দিন। এরকম দিনে গাড়ির ভিতরে বসে থাকা যায়? এরকম দিনে নীল আকাশের নিচে রাস্তাগুলো ডাক দ্যায়। এসো। হাঁটো। রাস্তায় রাস্তায় উদ্দেশ্যহীন ঘোরা। নিরুদ্দেশে হারিয়ে যায়।

শামিম প্রায় বলে উঠতে যাচ্ছিল : কিসের অফিস? কিসের চাকরি? আলম, গাড়ি থামাও। আমি। হেঁটে হেঁটে রাস্তায় ঘুরব এখন। একা একা।

কিন্তু মুখ ফুটে বলা হলো না। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল না শামিম। জ্যাম একটু ফাঁকা হতেই গাড়ি চলতে শুরু করল।

অফিসে নেমে সৈয়দ শামিম রেজা যেন মুহূর্তে আর-এক মানুষে রূপান্তরিত হলো। আলম দরোজা খুলে দিল। রহিম তার ব্রিফকেস, খাবার পাত্রটা, পানির বোতল গাড়ির ভেতর থেকে বের করে নিল। শামিম সরাসরি সেল্‌স্ সেন্টারের দিকে এগিয়ে গেল।

—প্রতিদিনই আপনারা এখানে জটলা করেন। কী ব্যাপার?

—না, স্যার। কুণ্ঠিত গলা।

—যান। সে যার রুমে চলে যান। কাজ করেন।

বলে এগিয়ে গেল লিফ্‌টের দিকে।

লিফ্‌ট্‌ম্যান শহীদুল্লাহ 'কা-না-মু-না' (কাজ নাই মজুরি নাই) ভিত্তিতে কাজ করছিল। এখন তার আর কাজ নেই। বছরখানেক এই চুক্তিতে কাজ করেছে। আবার শহীদুল্লাহ ছাড়া লিফ্‌ট্ অচল। আপাতত চালিয়ে যেতে বলেছে। ঈদের পরে তাকে অন্তত দিন ১৫-র জন্যে অব্যাহতি দিতে হবে। উপায় নেই। ইতোমধ্যে দরখাস্ত করেছে সে শূন্য পদে। কিন্তু বয়েস একটু বেশি। মাঝে দু-একবার বলেছে। আশ্বাস দিয়েছে শামিম—তোমাকে নেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। এর চেয়ে বেশি বলা সম্ভব না। নিয়োগ কমিটি আছে একটা। শামিম যদিও নিয়োগ কমিটির সভাপতি, তবু সে-ই তো সব না। আর নিয়ম-কানুনের বাইরে বেশিদূর যাওয়া সম্ভব না। বিষয়টাই সে ভালো বোঝে না। যেমন তার পিয়ন ছিল যে নূর মোহাম্মদ, তাকে শামিম পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে : জেলা কোটায় সে পড়ে না, কাজেই তার নিয়োগের সম্ভাবনা শূন্য। আর একজন মহিলা ছিল এই অফিসে, কী কারণে যেন চাকরি নেই এখন। তার বয়েস হয়েছে ৪০এর মতো। তার চাকরি কী করে হবে। অথচ মহিলা উমেদারি করে চলেছেন। নিয়োগ নিয়ে চিন্তায় আছে শামিম।

সৈয়দ শামিম রেজার ব্রিফকেস, খাবারের ব্যাগ নিয়ে এল রহিম। পি.এ. ইলিয়াস সিল-মারা দরোজা খুলল। প্রতিদিন চারটি সরু স্লিপে নিজের স্বাক্ষর লিখে দিতে হয় শামিমকে। একটা আঁটা হয় তার অফিসরুমের দরোজায়, একটা তার ঘর পেরিয়ে পি.এ.-র রুমের দরোজায়, একটা তার দফতরের প্রধান দরোজায়, আর একটা সিঁড়ির মুখের দরোজায়। তার অফিসটি চারতলায়।

অফিসে বসতেই ফোন বেজে উঠল।

মন্ত্রণালয় থেকে। জরুরি কথা সারল।

আয়েশা, পিয়ন, ইলিয়াসকে বলল তাকে শুনিয়েই—ফাইলগুলো স্যারকে—

ইলিয়াস বলল—স্যার একটু রেস্ট নিয়ে নেন, তারপরে—

সবই কানে গেল শামিমের। গতকালও তাগিদ দিয়েছে। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা পোশাক অ্যালাউন্স পায় একটা, তার তাগাদা। সামনে ঈদ আসছে। সেজন্যে টাকা দরকার। আসল কথা হচ্ছে তা-ই। পোশাক কখন বানায়। বানালেও খুব-একটা পরে না।

শামিম বলল—লাঞ্চের পরে দিয়ো ফাইলগুলো।

একদিন এই হাউজে এসেছিল নাসির আলী মামুন। সৈয়দ শামিম রেজার কাছে নয়। অন্য কোনো কাজে। কী মনে করে আলোকচিত্রী তার ঘরেও এসেছিল। তারও কয়েকটি ফোটো তুলেছিল। লেখক-কবিদের ছবি তোলা তার একটা হবি। ছবি তো তুললই। ছবি তোলা ছাড়াও কিছু কথা লিখে দিতে হলো। এমনকি রঙিন কলমে একটি ছবি পর্যন্ত এঁকে দিতে হলো শামিমকে। ছবি আঁকল সে নিজে বসে আছে রাশি রাশি ফাইল-পরিবৃত অবস্থায়।

নাসির আলী মামুন বলল—শামিম ভাই, আপনি ছবি আঁকতে পারেন ভালো।

ইন্টারকমে উপ-পরিচালক বলল—স্যার, আপনি চাবিটা এনেছেন আজকে?

ফাইল-ক্যাবিনেটের চাবি। গোপনীয় কাগজপত্র সব আছে ওখানে।

শামিম বলল—কাল নিশ্চয় আনব।

ফোন নামাতেই আবার বেজে উঠল ইন্টারকম।

সেক্রেটারির পি.এ. জয়নাল আবেদিন বলল—স্যার, এক ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছেন? দেবো?

—দেন। তারপরই—হ্যালো।

—আমি শামসুন নাহার করিম বলছি। মনে আছে, কলেজে আপনার কলিগ ছিলাম।

—হ্যাঁ। নিরুত্তাপ গলা শামিমের।

—আসতে চাই একদিন আপনার অফিসে। আমার একটা গল্পের বই বেরিয়েছে। আপনাকে দিতে চাই। আপনি তো আমাদের অগ্রজ গল্পকার। আর বিখ্যাত।

—ঠিক আছে। আসেন একদিন। এই ফোন নাম্বারে ফোন না-করে আসবেন না।

—না। তা আসব না। খোদা হাফেজ।

—খোদা হাফেজ।

ইলিয়াস ভেতরে এসে বলল—স্যার, আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে চাচ্ছেন।

—আসতে বলেন।

একটু পরেই এক বয়স্ক ভদ্রলোক ঢুকলেন, সঙ্গে একটি যুবক।

—সালাম আলায়কুম, স্যার। আমরা খুলনার প্রগতি লেখক সঙ্ঘ থেকে আসছি।

বসুন। বলল শামিম।

ভদ্রলোক বললেন—আমি প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সভাপতি, আর—ইনি—সম্পাদক। আমরা আপনার গল্পের ভক্ত। আমরা চাই, আপনি আমাদের অনুষ্ঠানে—

সৈয়দ শামিম রেজা তো গল্প আজ থেকে লিখছে না। তার প্রথম গল্পগ্রন্থের তিনটি সংস্করণ হয়েছে। তারপর আরএকটি বইএরও হয়নি। এমনিতে পত্রিকাসম্পাদকেরা তার গল্প চান, বিশেষ সংখ্যার জন্যে বিশেষভাবে, বাংলাদেশের গল্পের ইতিহাসে তার নামোল্লেখও হয়—ব্যাস এটুকু। তার গল্পের প্রধান প্রকাশক বলেছেন—এবার আপনি একটি উপন্যাস দিন। বুঝলেন না, লোকে উপন্যাস চায়। বড় গল্প। দীর্ঘ কাহিনী। তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেলে কী ভাল্ লাগে?'

এই অফিসে জয়েন করার পরে হঠাৎ তার গল্প একটা ফ্যাক্টর হয়ে গেল নাকি?

সৈয়দ শামিম রেজা বিনীতভাবেই বলল—দেখুন আমি ঢাকার বাইরে যাই না। কাজেই—

খোশামোদ চলল অনেকক্ষণ। রাজি হলো না শামিম।

ফোন বেজে উঠল।

—হ্যালো, শামিম ভাই। আমি *অন্যদিন* থেকে মোমিন রহমান বলছি। আপনার গল্পটা পাচ্ছি তো আজ?

শামিম বলল—হ্যাঁ, পাবেন। রাত আটটায় আপনি বাড়িতে লোক পাঠাবেন। আমি দিয়ে দেব।

—ধন্যবাদ, শামিম ভাই।

ফোন রাখতে-না-রাখতেই বেজে উঠল আবার।

—হ্যালো, শামিম ভাই। আমি মামুন রশিদ বলছি। চ্যানেল আই-এ জীবনানন্দের প্রোগ্রামের রেকর্ডিয়ের ডেট ঠিক হলেই আপনাকে জানাচ্ছি। আপনি করছেন তো?

—নিশ্চয় করব। কেন করব না?

—আপনি বলবেন জীবনানন্দের গল্প সম্পর্কে। জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে বলবেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। চেনেন কি মান্নান ভাইকে?

হেসে বলল শামিম—হ্যাঁ, চিনি। আলাপ আছে।

মামুন রশিদ বলল—আর আমি উপস্থাপনা করব। আপত্তি নেই তো আপনার?

শামিম বলল—না, কোনো আপত্তি নেই।

মামুন রশিদ বলল—তাহলে আমি উপস্থাপনা করছি, মান্নান সৈয়দ জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে বলছেন, আর আপনি বলছেন জীবনানন্দের গল্প সম্পর্কে। ঠিক তো?

—হ্যাঁ, ঠিক আছে।

মামুন রশদ বলল—তাহলে আপনি বলছেন জীবনানন্দের গল্প সম্পর্কে, মান্নান সৈয়দ বলছেন কবিতা নিয়ে, আর আমি উপস্থাপনা—

এই সময় দরোজা খুলে সহকারী পরিচালক ঢুকল। দরোজায় একটু ইতস্তত করছিল ফোন ধরে আছে শামিম সেজন্যে, শামিম বলল—আসেন—

মামুন রশিদ বলল—কি বললেন?

শামিম বলল—না, আপনাকে না।

মামুন রশিদ বলল—তাহলে ডেট ঠিক হলে আপনাকে জানাব? আপনার কোনো অসুবিধে নেই তো?

শামিম বলল—না, নেই। মামুন শাহেব এখন একটা মিটিয়ে বসব—আমার রুমেই—

মামুন রশিদ বলল-ঠিক আছে তাহলে। ঐ কথাই রইল। জীবনানন্দের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে চ্যানেল আইএর অনুষ্ঠানে আপনি তাঁর গল্প সম্পর্কে বলছেন, মান্নান সৈয়দ তাঁর কবিতা সম্পর্কে আর আমি উপস্থাপনা করছি। রেকর্ডিয়ের তারিখ ঠিক হলে আপনাকে জানাব।

শামিম বলল—ঠিক আছে। খোদা হাফেজ।

মামুন রশিদ বলল—খোদা হাফেজ।

ফোন রাখতেই সৈয়দ শামিম রেজার মুখ কঠিন হয়ে গেল। সহকারী পরিচালকের দিকে তাকিয়ে বলল—২০০৩-০৪ অর্থবছরে আমরা যে-কাজ করেছি, তার প্রাথমিক বিববরণ মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি। অক্টোবর মাস পড়ে গেছে, আপনি এখনো সেটা সাবমিট করতে পারলেন না।

—এর ফাঁকে ফাঁকে তো অন্য কাজ। করতে হচ্ছে আমাকে—

—সেটাও তো করতে হবেই।

—আমাকে, স্যার, আরএকটু সময় দেন।

—কবে নাগাদ?

—সামনে সপ্তায়।

—এটা তো অস্পষ্ট কথা। আপনি তারিখ বলুন। কোন্ তারিখে আপনি ঠিক দিতে পারবেন?

—১৫ তারিখে দিয়ে দেব, স্যার।

—ঠিক আছে।

সৈয়দ শামিম রেজার মুখের ওপর শক্ত রেখাগুলো ক্রমশ নরম হয়ে যেতে থাকে।

বেলা চারটে

এক প্রকাশকের দোতলায় বসে সৈয়দ শামিম রেজা একা গল্প লিখছে।

প্রকাশকের দোকানে এসে অফিসের গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। আলম আজ একটু খুশি। কতদিন বেচারার ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়। শামিম রেজাকে ছেড়ে,

গাড়ি অফিসের গ্যারেজে রেখে, তারপর ফিরতে হয় তাকে বাড়িতে। এখন রোজার দিন। নটা-তিনটে অফিস। আজ তার স্যার অফিসের পরেই প্রকাশকের দোকানে গিয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছেন।

সাইরেনের শব্দ এখান থেকে শোনা যায় না। কিন্তু যথাসময়ের আগেই এফতার এল। তরুণ প্রকাশক সজল এল। সজল ভালো-নাম। তার সঙ্গে একজন তরুণ লেখক। অনেকদিন আগে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে শামিমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। নাম ভুলে গেছে শামিম। আর একটি তরুণী।

সদ্য-লেখা গল্পের ওপরে কলমটা ক্যাপ-খোলা অবস্থায় পড়ে ছিল। তরুণ লেখকটি কোনো কথা না-বলে কলমটা তুলে কি যেন লিখতে লিখতে কম্পিউটারে কর্মরত শিবনাথের দিকে চলে গেল। শামিম লক্ষ্য রাখছিল যে-হাতে লেখকটি একটি মোবাইল ধরে আছে সেই হাতেই কলমটি রয়েছে।

ঠিক সেই সময়েই ফোন বেজে উঠল।

শামিমই ফোনটি ধরল। মিনা ফোন করেছে।

শামিম বলল—হ্যাঁ, মিনা। সোমার বিক্রিপাতি কেমন হলো আজ, জানিয়েছে?

মিনা ফোনের ওপার থেকে বলল—ঐ রোজ যেমন ঐরকমই।

—তাহলে তো ভালোই। আবার কী। টেলিফোনে কথা বলছিল শামিম, আর তার চোখ ছিল গল্পকারটির হাতের দিকে। বলল—দ্যাখেন, কী অবস্থা! তারপর জোরে—এই যে নবীন লেখক, আমার কলমটি আপনার হাতে।

মিনা বলল—কী বলছ?

শামিম বলল—না, তোমাকে না। এখানে একজন লেখক এসেছেন, আমার কলম তার হাতে। ক্যাপ খুলে তিনি হাতে নিয়েও নিয়েছেন।—আসলে অসম্ভব বিরক্ত হয়েছিল সৈয়দ শামিম রেজা। তার কলমে অন্য কেউ লিখলে, সেই কলমে সে আর লিখতে পারে না।

এফতার করে, চা খেয়ে, আবার লেখা ধরল শামিম।

সজল লক্ষ্য করেছিল যথেষ্ট গম্ভীর হয়ে গেছেন সৈয়দ শামিম রেজা বিষয়টাও তার নজর এড়ায়নি হয়তো।—চলেন আমরা যাই দোকানে—বলে সজল তরুণী মেয়েটি আর তরুণ গল্পকারটিকে নিয়ে গেল।

শিবনাথের সঙ্গে একটা অন্তরঙ্গতা আছে শামিমের।

শামিম বলল—দেখেছেন শিবনাথ?

শিবনাথ বলল—দেখলাম তো। রোজ আমার তিনটে করে কলম হারানোর পর থেকে সামনে আর কলম রাখি না। তারপর বলল—এখান থেকেই একজনের *গল্পসমগ্র* বেরোচ্ছে। তিনি আপনাকে অনুরোধ করেছেন আপনাকে দিয়ে ভূমিকা লেখানোর জন্য। তবে নাম-করা লেখক না অবশ্য।

শামিম চুপ করে থাকল। গল্প ছাড়া সে এসব ভূমিকা-টুমিকা লিখতে চায় না।

রাত আটটা

রাত আটটায় *অন্যদিন* পত্রিকা অফিস থেকে মোমিন রহমান গল্পের জন্যে বাড়িতে লোক পাঠাবে।

ঠিক রাত আটটায় দু-তিন পৃষ্ঠা লেখা অসম্পূর্ণ গল্পের পাণ্ডুলিপি প্যান্টের পকেটে ভরে সৈয়দ শামিম রেজা নেমে এল রাস্তায়। কার্তিকের খোলা আকাশের নিচে। এফতারের পরে রাস্তায় এখন ভিড় একটু কম হলেও, আছে। লোকজন আছে ইতস্তত। রিকশা, কার, ট্যাকসি-ক্যাব, সি.এন.জি., বাস্।

নেমে সামনে দাঁড়ানো একটা রিকশায় কোনো কথা না-বলে উঠে পড়ল শামিম।

রিকশাঅলা ইচ্ছামতো জায়গা নাহলে যাবে না—এরকম কঠিন মুখভঙ্গি করে বলল—কই যাইবেন?

সৈয়দ শামিম রেজা বলল—তোমার যেদিকে ইচ্ছা চালাও।

[২০০৪]

ভাদ্রের একটি দিন

সেটা ছিল বছরের সবচেয়ে গরমের দিন। যাকে বলে ভাদ্দুরে গরম, তার চূড়া ছুঁয়েছিল। ভাদ্রমাস পড়তে-না-পড়তে একি অবস্থা! গুমোট গরম, এক ফোঁটা বাতাস নেই। আকাশে যদ্দুর চোখ যায় এক-চিলতে কালো মেঘ নেই—শুধু খাঁ খাঁ নীল মরুভূমির বালির মতো বিস্তারিত, শ্যামল ওয়েসিসের চিহ্নমাত্র নেই, পিচঢালা রাস্তা থেকে আগুনের হলকা উঠছে। রাত্রিগুলো গরমে হাঁশফাঁশ-করা, এমনকি ভোরবেলার শরীর থেকেও যেন স্নিগ্ধতার শিশিরকণা উবে গেছে। আর বেলা ন-টা বাজতে না-বাজতেই চচড়ে হয়ে উঠছে রোদ।

কিন্তু সে-দিন বুঝি ভাদ্দুরে গরমও চূড়াতে পৌঁছেছিল। সকালবেলা থেকেই এমন গুমোট পড়েছিল যে, খালি গা হলেও স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছিলো না, যেন গায়ের এক-পরদা চামড়া উঠিয়ে ফেলতে পারলে শরীর জুড়ত। বাতাসের লেশমাত্র নেই, গাছের একটা পাতাও এতটুকু নড়ে না। ওপরে নির্বাক নীল নির্মম মহাকাশ, তাতে দিগন্ত অব্দি যদ্দুর চোখ চলে এক-টুকরো কালচে মেঘের ছায়া পর্যন্ত নেই। পিচপথ থেকে ভাপ উঠছে, পথঘাটগুলো এমনভাবে পড়ে আছে যেন সুযোগ থাকলে তারা উঠে অন্য কোথাও চলে যেতো দু-দণ্ড শান্তির জন্যে। রাস্তাঘাটে আজ লোকজন লক্ষণীয় রকমে কম। যে যার বাড়ির ভেতরে ঘরের ভেতরে ফুল স্পীডে ফ্যান ছেড়েও হাঁশফাঁশ করছে। ফ্যান কি চলছে? ফ্যানে কি বাতাস হচ্ছে ঠিকমতো? হাত-পাখা চলছে। গাছতলায় শান্তি নেই, কেননা কোথায় গাছের ঝিরিঝিরি শিরিশিরি?

এমন দিনেও দিনভোর কাজ করতে হয়েছে আমার। সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা। দুপুরে লাঞ্চের জন্যে এক-ঘণ্টা বিরতি। ফ্যান ফুল স্পীডে চালিয়ে দিয়ে ঘাড় গুঁজে আমি ছবি আঁকি জুতোর কৌটো স্নো পাউডার ক্রীম শাড়ি ব্লাউজ ব্রা ছাতা জুতো রাজ্যের জিনিশের। একটার পর একটা। আর প্রত্যেকটির সঙ্গে চাই নারীমুখ নারীশরীর। সেটা আমার ভালোই লাগে। ক্রমাগত নারীমুখ নারীশরীর আঁকতে না-হলে এত করতে পারতাম কি? বিশেষত এই গরমে! ব্লেডের মতো নিটোল নারীমুখ যেন ভেতরে নিয়ে আসে অসীম শান্তিসুখ, আবার কোথায় কেটে গিয়ে বিরামহীন রক্তক্ষরণ হতে শুরু করে।

আমি একটি বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানে কাজ করি। প্রতিষ্ঠান বলতে অনেক বেশি বলা হয়ে গেল। আর্ট সেকশন কপি রাইটিং সেকশন ডিরেক্টর বিভিন্ন ঘর টেলিফোন

অপারেটর টেলিফোন ইন্টারকম দেয়াল থেকে দেয়াল অব্দি টানা কার্পেট সোফা ঝলমলে দেয়াল সেক্রেটারিয়েট টেবিলে ছবির মতো সাজানো ঘর—না, সে-সব কিছুই নেই। 'মড্ আর্ট'-এর আছে সর্বসাকুল্যে একটিমাত্র ঘর, রাস্তার ওপরে একটু টানা। তারই একপাশে বসে টেবিলে ঝুঁকে আমি কাজ করি। আর ঠিক দরোজার সমুখেই আছে আর-একটি চেয়ার-টেবিল পাতা, তার উপরে ঘরের দ্বিতীয় ফ্যানটি, সেখানে বসে প্রতিষ্ঠানের প্রধান তার টেবিলে। সারাক্ষণ চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে তাঁর মোটর সাইকেলে। বলতে গেল এই প্রতিষ্ঠানের জুতো শেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ অব্দি সব-কিছু তাকে একাই করতে হয়। আর একটা ছেলে আছে,রহিম, সব সময় ফাইফরমাশ খাটার জন্যে। আছে একজন তরুণ কবি, সপ্তায় দু-তিন দিন আসে, বাংলা কপি-রাইটারের কাজ করে, এবং মইনুদ্দীন শাহেবের সঙ্গে যতবার দেখা হয় ততবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে টাকা চায়। সপ্তায় দু-তিন দিন আসে আর-একজনও, এক তরুণ অধ্যাপক, ইংরেজি কপি-রাইটার। পয়সাপাতির প্রশ্নও তোলে না সে, মইনুদ্দীন শাহেবও মহানন্দে তাকে দিয়ে কাজ করান। অধ্যাপক সপ্তার তিনদিন নিয়ম মতো চলে আসে, তার অনেক সময় করবার মতো কোনো কাজই থাকে না, একদিন নিয়ম মতো আসেনি বলে সে মইনুদ্দীন শাহেবকে এমন দীর্ঘ গম্ভীর কৈফিয়ৎ দিতে থাকে যে, কাজ করতে করতে আমি না-হেসে পারি না। তরুণ কবিটি সপ্তায় একদিনও ঠিক আসে কিনা সন্দেহ, এলেই টাকা চায়। আবার সে এলে মইনুদ্দীন শাহেবও চ্যাঁচামেচি শুরু করে দ্যায় গাদা-গাদা জাম জমে আছে বলে, তরুণ কবিটি চ্যাঁচায় ঠিকমতো টাকা-পয়সা দেওয়া হচ্ছে না তাকে এই অভিযোগ তুলে। রহিম ছোটে চা আনতে। 'মড্ আর্ট' জমে ওঠে তখন। তেমন দরকার পড়লে মোটর-সাইকেল হাঁকিয়ে মইনুদ্দীন শাহেব নিজেই চলে যায় তরুণ কবি বা অধ্যাপকের ডেরায়।

নিতান্তই ছোট্ট বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান আমাদের। স্বাধীনতার পরে রাতারাতি যে-সব রাশিরাশি বিজ্ঞাপনসংস্থা গজিয়ে উঠেছে, তেমন না। সাইনবোর্ড আঁকা থেকে তাবৎ কাজ আমরা করি। ১৯৭৯ সালের জন্যে একটা ক্যালেন্ডার তৈরি করবার ভার আমরা পেয়েছি, ছোট একটা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে—এটাই হচ্ছে আমাদের সাম্প্রতিক সুসংবাদ। আর আমাদের সারাক্ষণ অর্থপ্রার্থী কবিকে দিয়ে একটি স্কিপ্ট লিখিয়ে সরকারি দপ্তরে জমা দেওয়া হয়েছে, গৃহীত হলে ছোট্ট একটা প্রচার ফিল্ম তৈরির ভার দেওয়া হবে আমাদের ওপরে। গৃহীত হলে তো কবিকে মোটা অংকের টাকা দেওয়া হবেই, গৃহীত না-হলেও কবিকে তার শ্রমের জন্য কিছু টাকা মইনুদ্দীন শাহেব দেবে জানিয়েছে। কবি খেটেখুটে স্কিপ্টটা তো দাঁড় করিয়েছে—এখন দেখা যাক। মোটামুটি বলা যায়, মড্ আর্ট-এর দিনকার ভালোই যাচ্ছে।

কিন্তু এই গরমে কি কাজ করা যায়! পূর্ণ বেগে ফ্যান চলছে ঠিকই, কিন্তু বাতাস যেন গা পর্যন্ত এসে লাগছে না। মাঝখান থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে। তবু আমার খুপরি-ঘরের চেয়ে তো ঐটুকু ভালো। ছোট্ট ঘরের ভাড়া গুনতে হয় আড়াই শো টাকা। ফ্যান নেই—ইচ্ছে করে যত রাত্রি সম্ভব দেরি করে বাড়িতে ফিরি।

দিনের বেলাতেও আগুন হয়ে-থাকা ঘর। কাজের একটা বেটি আছে, রাত্রিবেলা শুধু খাই বাসায়, আর সকালবেলায় নাশতা। শখ করে ভর্তি হয়েছিলাম আর্ট কলেজে, তাও আবার কমার্শিয়াল বিভাগে না—ফাইনে আর্টসে। ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন আব্বা। বলেছিলেন—ছবি এঁকে খাওয়া জুটবে না, ম্যাট্রিক পাশ করেছিস ভালো ভাবেই, সায়েন্স না পড়তে চাস পড়িস নে, কিন্তু আর্ট কলেজ ছাড়, তা নাহলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও—। আব্বা এখন মরহুম, তাঁর কথা মানিনি, কিংবা মেনেছিলাম, প্রথম যৌবনের তেজে বেরিয়ে গিয়েছিলাম বাড়ি থেকে, বন্ধুবান্ধবের অভাব ছিল না। এক বন্ধুর বাপের স্টেশনারি দোকান ছিল। নিউমার্কেটে, তার সেলসম্যান হলাম। আমার তেজে অবাক হয়ে গেল সবাই, আমি-যে নিজের পায়ে নিশ্চিত দাঁড়াব—সে বিষয়ে আর কারো সন্দেহ মাত্র রইল না। কিন্তু শেষ-অব্দি আব্বার কথাই ঠিক হলো বুঝি, ছবি আঁকা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াল। ছবি আঁকার জিনিশপত্রের দাম আকাশচুম্বী, কিনব কি করে? তারপরে, সময় পাই কোথায়? তবু আমি কি হেরে গেছি একদম? না, এখনো ভালো না-খেয়ে, ভালো শার্ট-প্যান্ট না-বানিয়ে রঙের একটা টিউব একটি তুলি, স্প্যাচুলা, কাগজ, বোর্ড, এটা-ওটা জিনিশ কিনে নিই। সারাদিন খাটার পরে এখনো রাত জেগে নিজের ছবি আঁকি। অদ্ভুত ভালো লাগে সেই মুহূর্তগুলো, যখন ছবি আঁকতে বসি। আমার অল্প পাওয়ারের বাতি-অলা ঘরে যেন ছবির রঙের ভেতরে থেকে ঝলমলে ঝাড়লণ্ঠন জ্বলে ওঠে। ছোট্ট আমার ঘরটা হয়ে ওঠে ব্যাবিলনের শূনোদ্যান। নিজেকে মনে হয় প্রকৃত শিল্পী, যে জীবিকার জন্যে এক-ধরনের ছবি আঁকে, আর নিজের জন্যে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। আমাদের কবি একদিন বলেছিল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বড় গল্প-লেখককেও নাকি ডিটেকটিভ বই লিখতে হয়েছিল বেনামে স্রেফ বেঁচে থাকার জন্যে। কলেজে স্যাররা বলতেন, পৃথিবীর কত বড়বড় শিল্পীকেও কত সামান্য কাজ করতে হয়েছে। একটা উজ্জ্বল টানের জন্যে, একটা রঙের অভাবিত আশ্চর্য সফল কনট্রাস্ট বা কম্বিনেশন সৃষ্টির জন্যে, নিজেকে মনে হয় দেবতার মতো। রাত্রি ভরে ওঠে স্বপ্নে, ভোরবেলা বাস্তবতা শুরু হয়।

'মড্ আর্ট'-এর অফিস বা দোকান যাই বলুন, সেখান থেকে বেরোতে বেরোতে অনেক বেলা হয়ে গেল। যে-বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান আমাদের, বছরভোর তো রোজই আর সন্ধে অব্দি কাজ থাকে না। কাজ না-থাকলে মইনুদ্দীন শাহেবও খুব একটা বসিয়ে রাখে না। এবং কাজের চাপ থাকলে বাড়তি কোনো কাজ করলে, মইনুদ্দীন শাহেব দু-দশ টাকা আলাদা করে দিয়েও দ্যায়।

রোদ পড়ে গেল, বেরোলাম। বাইরে এক-ফোঁটা বাতাস নেই জেনেও, সারাদিন এই গরমে ঘাড় গুঁজে একটার পর একটা ঈদ কার্ড তৈরি করেছি। শ' খানেক ঈদ কার্ড কোথাও সাপ্লাই দিতে হবে।

বিকেলবেলা। বেরিয়ে হাঁটছিলাম। পাঞ্জাবিটা ময়লা হয়ে এসেছে, স্যান্ডেলের একটা স্ট্র্যাপ গেছে ছিঁড়ে, কাঁধের থলিটার মধ্যে রাজ্যের এটা-ওটা। গরমে তবু আর প্রায়-বন্ধ ঘরে টেকা যাচ্ছিল না। আর বাড়িতে ফিরেও লাভ নেই—এই আসন্ন

সন্ধেবেলা, গুমশোনো গরমে, ফ্যানহীন আলোবাতাসহীন ঘরের মধ্যে। শাহবাগের 'রেখায়নে' একটা আড্ডা বসে আমাদের। কয়েকজন বন্ধুবান্ধব আসে। চা নাশতা সিগারেট এইসবে সময়টা ফুঁকে দিয়ে কারফিউ-এর আগে বাড়ি ফিরে আসি।

গরমে সারাদিনের পরিশ্রমে ভাবনাহীন ক্লান্ত ধ্বস্ত হেঁটে চলছিলাম। হঠাৎ ফুটপাতের ঠিক গা ঘেষে আমার পাশে একটি গাড়ি মসৃণভাবে এসে দাঁড়াল।

—আরে, জামাল ভাই!—আমি একটু চমকেই উঠি।

—কোথায় যাচ্ছ? জামাল ভাই ড্রাইভারের সীট থেকে আমার উদ্দেশে বলে, উঠে পড়ো।—দরোজা খুলে দিয়ে জামাল ভাই বলে—এখন কি কাজ আছে নাকি তোমার কোনো?

বললাম—না। কিছুই না।

—তাহলে চলো আমার ওখানে। এই গরমে আরাম পাবে।—জামাল ভাই খুব ফুর্তিতে আছেন মনে হয়।

—আমেরিকা থেকে কবে ফিরলেন জামাল ভাই?

—এই তো। মাস তিনেক হয়ে গেল। তোমার খোঁজখবর নিয়েছি। তোমার লম্বা চুল, লম্বা ঝুলি—এসব দেখেই মনে হচ্ছিল চেনা-চেনা। তো যাক, কি করছ তুমি বলো।—গাড়ি চালাতে চালাতে জামাল ভাই জিগেস করেন। সংক্ষেপে বলি। জামাল ভাই, জামাল আহসান, একটুখানির জন্য আমার টিচার হতে পারেননি। আমরা যেবার আর্ট কলেজ থেকে বেরোই, তারপরই অল্প কিছুকালের জন্যে জামাল ভাই ওখানে অধ্যাপনা করেন। কিছুকাল বাদে কি-একটা স্কলারশিপ নিয়ে তিনি সেবার ইউরোপ ঘুরে বেড়ান। দেশে থাকতেই—ছাত্রাবস্থাতেই—জামাল আহসান সাধারণ প্রদর্শনীগুলোতে অংশ নিতেন; দুটি একক প্রদর্শনীও হয়েছিল; এথেন্সে, লন্ডনে আর নিউইয়র্কে তিনটি একক প্রদর্শনীও হয়েছে তার—এবং বেশ নামও হয়েছে।

গাড়ি ধানমন্ডিতে একটি বাড়িতে ঢুকে যায় লেকের ওপরকার ব্রিজ পেরিয়ে। বাইরের গুমোট থেকে ঘরের ভেতরে ঢুকতেই যেন একটা ঝাপটা লাগল। এয়ার কন্ডিশন্ড্ ঘর—কোথায় বোতাম টিপতে মৃদু মিঠে শীতে ঘর ভরে গেল। ঘরের ভেতর উন্মুখ আলো জ্বলছে। দাঁড়ানো পাখা। দাঁড়ানো আলো। মেজেঢাকা সূর্যাস্ত -সোনালি কার্পেটে। দেয়ালে জামাল ভাইয়ের আঁকা তৈলচিত্র।

—বসো।

সোফার আরামে ডুবে গেলাম। মৃদু মিঠে শীত স্নায়ুর ভেতরে দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। এখন বাইরের উষ্ণতম দিনও আমার কিছু করতে পারবে না। বাইরে শহর গরমে ঝলশে যাক। না, এ তো বোশেখ মাস না—ভাদ্র মাস, ধিকিধিকি গরমে সেদ্ধ হচ্ছে। এখানে এক শীতের দেশ তৈরি করা হয়েছে। দেয়ালের রঙ, জামাল ভাইয়ের আঁকা ছবির বর্ণালি, কার্পেটের রঙ, দাঁড়ানো বাতির শর্ষে-হলুদ রঙ, মৃদু গুঞ্জিত পাখা—সব মিলিয়ে মনে হয়, এক-টুকরো স্বর্গের ভেতরে ঢুকে পড়েছি।

জামাল ভাই কোত্থেকে একটা চ্যাপ্টা মোটা বোতল নিয়ে আসেন। তাঁর নিঃশব্দ কাজের ছেলেটি ফ্রিজ থেকে বরফ বের করে নিয়ে আসে। লেবু। তিনটে সেভেন-আপ।

—বুঝলে, এই গরমে জিন্-ই সবচেয়ে ভালো।—জামাল ভাই তিনটে পেঁয়াজের খোসার মতো পাতলা গেলাশ সাজাতে থাকেন।

নিঃশব্দ ছেলেটি ভেতর থেকে নিয়ে আসে গরম ভাপ-ওঠা মুরগির মাংসের প্লেট।

আমার পাজামাটার গোড়ালির কাছে ধুলো-কাদার দাগ লেগে আছে। পাঞ্জাবিটা ময়লা। মুখে দু-দিনের বাসি দাড়ি। মাথার চুল জট পাকিয়ে আছে। এই ঘরের ভেতরে ঢুকে দূর থেকে আমি যেন আয়নার মধ্যে নিজেকে পা থেকে মাথা অব্দি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। অথচ আগে খেয়াল হয়নি। ঘরটা কি আয়না?

তিনটে গেলাশ কেন? ভাবছিলাম। আর ভাবতে-ভাবতেই ভেতরের দরোজা খুলে গেল। এক মহিলা। নিতম্ব-কামড়ে-ধরা জিন্সের ট্রাউজার, গায়ে ব্লাউজের ধরনের একটা পোশাক যার নাম আমি জানিনে, মাখনের মতো শাদা ও কোমল গাত্রত্বক, লালচে ধূসর দীর্ঘ চুল, আশ্চর্য সুন্দর মুখের কারুকার্য। আমি বিহ্বল, বাকরহিত হয়ে গিয়েছিলাম।

জামাল ভাই অসামান্য সপ্রতিভ। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—এসো, এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এ হচ্ছে কেটি—তোমার কেটি মির্জা নয়, কিন্তু তার চেয়ে কম নয়—

—আহ, কী বলছ—কেটির কণ্ঠে মাখন-গলা বাংলা শুনে অবাক হয়ে যাই। ইনি তাহলে বাঙালি মেয়ে! ভাবাই যায় না। দুরন্ত ফিগার! দুরন্ত গায়ের রঙ!

—আর এ হচ্ছে শাহাব, একজন ইয়ং পেইন্টার, ইয়ং অবশ্য বুঝতেই পারছো, কিন্তু যাকে বলে বিক্ষুব্ধ, সংগ্রামশীল।

আমি হাত তুলে একটুখানি সালামের ভঙ্গি করি। কেটি কেবল আমার দিকে সহাস্যে তাকায়।

—চিয়ার্স!—আমাদের তিনজনের হাতে জিনের গেলাশ উত্তোলিত হয়। চকিতে চোখ পড়ে আমার, কেটির বাহুমূলে লালচে সোনালি রোম।

কেটি দীর্ঘাঙ্গী, পরিপূর্ণ, তিরিশোত্তর। এ ধরনের মেয়েদের সম্বন্ধে কিছুই জানি না আমি। এমনিতেই মেয়েদের সম্বন্ধে কতটুকুইবা জ্ঞান আছে আমার! তার ওপর এ বোধ হয় একেবারে হাই সোসাইটির রমণী। জামাল ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কই বা কি, আমি ভাবতে যাই না। যদ্দুর জানি, জামাল ভাই দেশে থাকতে বিয়ে করেছিলেন একটি আর্টিস্ট মেয়েকেই, পরে কানাঘুষায় যদ্দুর শুনেছি, তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। পরে, আর তাঁর বিয়ে করার খবর পাইনি। কেটিকে দেখেও তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী বলে কিছুতেই মনে হচ্ছে না।

—তারপর বলো দেশের আর্ট-ওয়ার্ল্ডের খবর।

—কী আর! আমি বলি।

—আমি বেশ কিছু ছবি এঁকেছি মনে কোরো না যে, বসে আছি। কিছু টাকারও দরকার। একদিন দেখাব আমার স্টুডিও—এ বাড়িতেই। আজ থাক। কি আবহাওয়া এদেশের! অসম্ভব কাজ করা। তোমার, ছবি রক্ষা করাও মুশকিল। আমি স্টুডিওটা এয়ার কন্ডিশনড করিয়ে নিয়েছি। ও ছাড়া ছবিও টেকে না। কাজ

করাও অসম্ভব। আবেদিন স্যার তো মরে গেছেন, য়্যা? গ্রেট লস ঠিকই। কিন্তু আবেদিন স্যারের ভূমিকা যতটা শিল্পী হিসেবে আর চেয়ে বেশি পায়োনিয়ার হিশেবে, সংগঠক হিশেবে, তা নাহলে কাজ কি তিনি খুব বেশি করেছেন? এবং যাকে বলে, উল্লেখযোগ্য? এসে শুনলাম, কামরুল ভাই একদিন নিয়েও গেলেন, হ্যাঁ, কামরুল ভাই কিন্তু অসংখ্য কাজ করেছেন—করছেন। এরকম উদ্দীপনা কিন্তু দেখেছি তোমার ইউরোপীয়ান শিল্পীদের মধ্যে। কাইয়ুমের একটা একক একজিবিশন হয়েছে। তাই না? একটুখানির জন্য দেখা হলো না। কাইয়ুম কিন্তু অনেকটাই ডিজাইন-সর্বস্ব। তবে রঙের বোধ আছে অসামান্য। কিন্তু শুধু রঙ দিয়ে চোখের সুখ দিয়ে কোথাও পৌছোনো যাবে কি? রঙের সঙ্গে চাই অর্থও। যেমন নিউইয়র্কে দেখেছিলাম শাগাল-এর একটা রিট্রোসপেকটিভ একজিবিশন। দেশে ফিরে—তুমি চিন্তা করতে পারো আমি কত ছবি এঁকেছি, একটা একজিবিশন না-করলেই নয়। পুরোনো ছবিও কিছু জোগাড় করা যাবে এর-ওর কাছ থেকে। আমার ছবিগুলো দেখাব তোমাকে একদিন। আমি আবার ছবির নাম-টাম দিতে পারি না, সাদেক খানকে ডেকে আনতে হবে একদিন। ও আবার নাম-টাম দিতে ওস্তাদ।

জামাল ভাই দেশ-বিদেশের চিত্রশিল্প সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বিশ্লেষণ দিয়ে যেতে থাকেন। আমি হু হ্যাঁ করে যাই। বাইরে যে আজ বছরের দুঃসহতম গরম পড়েছে সেকথা নিঃশেষে ভুলে যাই। সোফার কোমলতায় ডুবে গিয়ে মচমচে করে ভাজা মুরগির মাংস চিবোতে থাকি, ঘরের আবহাওয়ার চেয়ে শীতলতর জিনের গেলাশে একটু-একটু চুমুক দিতে থাকি, ছবির মতো সাজানো ঘর দরোজা দেয়াল দেয়ালের পেন্টিং দেখতে থাকি, লক্ষ্য করি কেটির অলস বিলাসী শরীর। কেটি একবার উঠে, গান চালিয়ে দিল। পাশ্চাত্য সংগীতের ঝন্‌ঝনাতে ভরে উঠল ঘর। আর আমি দেখলাম, কেটির জামায় ও প্যান্টের, বুকের ও নিতম্বের ওপর লেখা রয়েছে : LOVE । ভেতরটা আমার কিরকম করে উঠল। রাজহাঁসের মতো এক জোড়া বুক, রাজহাঁসের মতো এক জোড়া নিতম্ব নিয়ে যেন ভেতরে কোনো পুকুরের উদ্দেশে চলে গেল কেটি। আমি আমার দৃষ্টি লুকোলাম না।

জামাল ভাই বললেন, 'তোমার পেছনে তাকিয়ে দ্যাখো।'

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, দেয়ালে ঠিক আমার মাথার কাছে এক নগ্ন নারীর বিশাল পেন্টিং। নারী না-বলে কামিনী বলাই উচিত, এমন ইন্দ্রিয়উদ্দীপক ও আমন্ত্রণকারী তার চোখের দৃষ্টি আর শরীরের ভঙ্গি। ছবিটাও কার চিনতে দেরি হলো না।

জামাল ভাই বলছিলেন—তোমাদের বোধহয় ন্যুড পেন্টিং এখনো আগের মতো অবস্থা। মডেল-ফডেল পাওয়া যায় না। অথচ ওদের দেশে কত বড় বড় ঘরের মেয়েরা স্বেচ্ছায় মডেল হচ্ছে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই।

ভেতরে আমার কি হিংসা-ঈর্ষা কাজ করেছিল? তা নাহলে আমি নিজে কিছু বোঝার বা ভাবার আগেই কেন বলে ফেললাম বাঁকা হেসে—আপনার তো মডেলের অভাব নেই।—বলে ফেলে আমার অবশ্য লজ্জাই লাগল। তবু তখনই আমার মনে হচ্ছিল, জামাল ভাইএর এই শীততাপনিয়ন্ত্রিত মূল্যবান আশবাবে

সাজানা ঘর-বাড়ি ভেঙেচুরে তছনছ করে ফেলি। শালার স্বর্গ সুখে থাকা বের করে দিই। কেটি নামের এই তালশাঁসটি নিশ্চয় তোমার বাড়িতে থেকে ভ্যারেন্ডা ভাজছে না।

—তারপর তোমার খবর বলো।—জামাল ভাই বসার জায়াগা পাল্টালেন। ছবি-টবি আঁকছ তো? যাই করো, মূল কাজ কিন্তু ছেড়ো না। অল্প হলেও রোজই কিছু করা চাই। দ্যাখো না, আমি—

আমার মাথাটা একটু ঝিমঝিম করে উঠল। তারপর আবার ঠিক হয়ে যায়। চোখে আবার দেয়াল দেয়ালের পেন্টিং সোফা অন্যান্য আশবাব ফিরে আসে, কান বিদেশি গানের কথাগুলো ধরবার চেষ্টা করে।

রাত প্রায় এগারোটার দিকে শিল্পী জামাল আহসানের বাড়ি থেকে বেরোই। বেরোতেই একটা ধাক্কা লাগে যেন—সেই গুমশোনা গরম, গাছের পাতা নড়ছে না। সেই বীভৎস অস্বস্তিকর আবহাওয়া। শুধু রাস্তা অনেক-জনবিরল হয়ে এসেছে। সারি সারি ল্যাম্পোটের নিচ দিয়ে গরমে আবার সেদ্ধ হতে হতে হেঁটে চলি।

আমার মনে কোথায় যেন একটা গ্লানি—হীনতা—অপরাধবোধ লেগে আছে। জামাল আহসানের বাড়ির নিষ্কলঙ্ক কার্পেটই যেন আমার পায়ের পাজামার স্যান্ডেলের ধুলো লেগে নষ্ট হয়েছে। অসম্ভব গ্লানি বোধ হয়। রোজ অনেক রাত অব্দি জেগে জেগে ছবি আঁকি, আশ্চর্য আনন্দ পাই, নিজেকে মনে হয় দেবতার মতো, মনে হয় সারাদিনের জীবিকার খাটুনির পর এই মুহূর্তগুলোকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না আমার কাছ থেকে। এ মুহূর্তগুলো নিতান্তই আমার, প্রতিদিনের ধুলো-কাদার ভেতর থেকে বাঁচিয়ে আনা সোনার মুহূর্ত। কিন্তু আজ আর ছবি আঁকতে কিছুতেই মন বসবে না আমার। মনে হচ্ছে সবটাই ফাঁকি, সবটাই খামাখা, নিজেকে ভোলোনো। বাপ-মা-ভাই-বোন সবাইকে বঞ্চিত করে নিজেকে বঞ্চিত করে এই যে অসম্ভব দাম দিয়ে রঙ তুলি কিনছি—এ সব কিছুই না। শিল্প আমার—আমাদের মতো মানুষের জন্যে না।

কেন জানি আজ বারবার মনে পড়ছে সাইকা-র কথা। আর্ট কলেজে আমাদের সঙ্গেই পড়ত। বেইলি রোড ওদের বিশাল বাড়িতে কতবার গেছি। তখন ছেঁড়া পাজামাও মনে হতো গর্বের জিনিশ। মনে হতো আমি আর্টিস্ট—এটাই সবচেয়ে বড় কথা। দারিদ্রকেও মনে হতো রূপকথা। সাইকাও কয়েকবার এসেছিল আমার তখনকার আস্তানায়। আমার এলোমেলো জীবন, এলোমেলো ঘর, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া—সব কিছু মিলে একটা মুগ্ধতা লেগেই থাকত সাইকা-র চোখে। আর্ট কলেজের বাগানে বসে ছবি এঁকে, গল্প করে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। একবার কলেজ থেকে পিকনিকে গিয়ে সাইকা-র আরো অনেক কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম। সাইকা-কে আমাকে নিয়ে কলেজের মধ্যে একটা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই সাইকা ফাইনাল পরীক্ষার তিন মাস আগে আমার আস্তানায় এসে খুব স্বাভাবিক উচ্চারণ করেছিল, শিগগিরই তার বিয়ে। সব রঙ মুহূর্তে আমার চোখ থেকে মুছে গিয়েছিল। আমি আয়নার মতো পরিষ্কার নিজেকে দেখতে

পেয়েছিলাম। ছেঁড়া পাঞ্জাবি, ময়লা পাজামা, কাঁধে শস্তা থলি। না, সাইকা-র সঙ্গে বিয়ে তো দূরে থাক, ঠিক প্রেমের কথাও তো হয়নি। শুধু আমরা কাছাকাছি চলে আসছিলাম। সাইকার আর ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়া হয়নি, বিয়ের পরে-পরেই স্বামীর সঙ্গে—বিদেশে চলে গেল। আর আমি রয়ে গেলাম। পরীক্ষা একেবারে-খারাপ হলো তা নাহলে কলেজেই আমার চাকরি হতো, স্যাররা সেরকম আভাস-আশ্বাসও দিয়েছিলেন। সাইকা-কে দোষ দিই আর না-দিই সেদিন—সবটা যেমন শূন্য বোধ হয়েছিল আজো তেমনি নিজেকে শূন্য ফাঁপা আত্মপ্রবঞ্চক মনে হচ্ছিল।

একটা শূন্য, সব-হারানো মন নিয়ে ধানমন্ডি থেকে হাঁটতে হাঁটতে সায়েন্স ল্যাবরেটরি পেরিয়ে এলিফ্যান্ট রোডে এসে পড়লাম। ফুটপাত ধরে হাঁটছিলাম। দোকানপাট প্রায় সব বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় একজন-দুজন লোক। এই গরমে আমার ঘরের ভেতরটা নিশ্চয় চুল্লির মতো হয়ে আছে। হঠাৎ হঠাৎ তীব্র বেগে এক-একটা গাড়ি চলে যাচ্ছিল। তাদের হেডলাইটের হিরের চোখ ঝরে পড়ছিল। সেই আলোয় নিজেকে আবার আয়নার মতো দেখতে পাই—গরমে ঘামে চুল উশকো-খুশকো, ময়লা পাঞ্জাবি, ময়লা পাজামা, ময়লা থলি কাঁধে, ছেঁড়া স্যান্ডেল। জামাল আহসান শালা কি তার ঐশ্বর্য দেখাতেই নিয়ে গিয়েছিল আমাকে! শালা, আবার আর্টিস্ট! ফাঁকিবাজ!

নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে পথ হাঁটছিলাম। শাহবাগের কাছে এসে একটা থেমে-থাকা রিকশায় চোখ পড়তেই মনে হলো—আ, এই আমার নিয়তি। আজ রাতের জন্যে। সমস্ত-কিছু ভুলে থাকা ছাড়া কিছুতেই নিস্তার পাব না আজ।

রিকশাঅলার সঙ্গে দরাদরি করি বটে, কিন্তু মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি, এই নারীকে নিয়ে যেতে হবে আজ। একটা বাড়ির পেছন দিকে আমার ছোট্ট খুপরিটা, তার একটা মস্ত সুবিধে যে সেই গলিপথে আর কারো দৃষ্টি পড়ে না। এর আগেও আমি এক-আধ সময় মেয়ে নিয়ে গেছি, বাড়িওয়ালা বা পাড়াপড়শি কিছুই টের পায়নি, ভোরবেলা বের করে দিলেই হয়।

ঘরে ফিরে কাপড়চোপড় থেকে মেয়েটাকে মুক্ত করতে আমার আর তর সয় না। শাড়ি সায়া ব্লাউজ ব্রা স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকে আমার আধ-ভাঙা একমাত্র বসার বেতের চেয়ারটিতে। এই কানাগলির ছোট্ট ঘরের মধ্যে উঁকি দিতে কে আসছে আর এই রাতে। সবগুলো জানালা-দরোজা হাট করে খুলে দিই। বাতাস নেই বাইরে, তবুও অন্তত বাতাসের জন্যে আমার অনুভূতিটা খোলা থাক।

মেয়েটি নগ্ন হয়ে গেলে অবাক হয়ে যাই তার শরীরের ঐশ্বর্য দেখে। এই স্লিম শরীরে এরকম মোটর গাড়ির হেডলাইটের মতো স্তন, এরকম তানপুরার মতো বিশাল নিতম্ব কল্পনাই করতে পারিনি। সারা ঘর আলো হয়ে যায় যেন, আর তখনই ইচ্ছাটা আমার হয়। রঙ-তুলি দিয়ে এই শরীরটাকে ধরে রাখার। আর তখন ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো, বছরের উষ্ণতম দিনে, প্রথম এক ঝলক মিষ্টি হাওয়া বয়ে যায় যেন এমনকি এই ঘরের ভেতরেও।

সারা ঘরে জিনিসপত্র ছত্রখান। তার মধ্যে দাঁড় করানো ইজেল। রঙ-তুলি নিয়ে আমি প্রস্তুত হই। ন্যুড! জামাল আহসান করুণা করছিল না আমাদের?—

যারা ন্যুড মডেল খুঁজে পাই না। মনে করো না আঁকবার জন্যে নগ্ন নারীশরীর কেবল তুমিই পাও। আর যে দুরন্ত শরীর, হেডলাইটের মতো স্তন, তানপুরার মতো নিতম্ব কেটির চেয়ে একি কোনো অংশে কম? এই নারীর বুকে পাছায় 'ভালোবাসা' লিখে রাখতে হয় না। কেননা একে ভালোবাসতেই হয়। এ শরীর তোমার কেটির চেয়ে অনেক অকৃত্রিম অনেক প্রাকৃতিক।

—একটু দাঁড়িয়ে থাকো ওখানে, হ্যাঁ ঠিক ঐ ভঙ্গিতে—বলতে বলতে রঙ-তুলি নিয়ে আমি প্রস্তুত হই।

কিন্তু তখনই আর্তচিৎকারে চমকে উঠি। আর যেন ঘরের ভেতরের চীৎকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই বাইরে খেলে যায় নীল রঙের বিদ্যুৎ। আর তার পরক্ষণেই গুরগুর করে আকাশ ডেকে ওঠে।

ভালো করে কিছু বোঝার আগেই দেখি, মেয়েটা সরে দাঁড়িয়েছে শাড়ি-টাড়ি হাতে করে—, না ছবি আঁকতে পারবেন না আমার—

—কেন, ক্ষতি কী—আমি অবাক হয়ে যাই—আমি কার ছবি আঁকলাম না-আঁকলাম কে দেখতে আসছে!

—শিল্পী! আর্টিস্ট!—ফোঁশ-ফোঁশ করে ওঠে মেয়েটি। বিদ্রূপে ঠোঁট বেঁকে যায়।—খাওয়া জোটে না, পরা জোটে না, আবার শিল্পী আমি প্রথমে ভেবেছিলাম আমাকে বলছে—অপমানে কান লাল হয়ে যায় আমার, কিন্তু পরক্ষণেই ভুল ভাঙে আমার। খাওয়াতে পারে না, পরাতে পারে না, রঙ কিনে আনছেন উনি, তুলি কিনে আনছেন। এখন, এখন কোথায় গেল সব। কোথায় তোমার সাধের ছবিগুলো! অমর কীর্তি সব! এখন বাচ্চাগুলো আমার ঘাড়ে ফেলে রেখে নিজে তো দিব্যি মরে ভুত হয়ে গেছ!—একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে মেয়েটি, আমার অবাক দৃষ্টি লক্ষ্য করে বলে—আমার স্বামীর কথা বলছি। আমাকে ন্যাংটো করে ছবি আঁকত রাতভোর। বলত, এসব ছবি চিরকাল থাকবে। সেইসব ছবি আমি দশ-বিশ টাকায়—এই সময় বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। ঠাণ্ডা বাতাস এলো।

ঈশ্বরের পৃথিবী কি শান্ত হয়েছে?

—আপনি আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছে করেন—আপনার যেভাবে ইচ্ছে—শুধু আমাকে নিয়ে ছবি আঁকবেন না—আঁকবেন না—যেন হাহাকার করতে-করতে সেই উলঙ্গ নারী ছুটে গেল বাইরে, এক চিলতে খোলা জায়গায়, বৃষ্টির অবিরল ধারার ভেতরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল ॥

[১৯৭৮]

যখন ফুটে উঠল তারা

আমাকে তো দেখছেন? সমস্ত মাথার চুল শাদা হয়ে গেছে। সমস্ত গোঁফ শাদা হয়ে গেছে। আমার এই বেঁটে মোটা কালো ধড়ের ওপর শক্ত মাথাটা আয়নায় দেখে আমার নিজেরই মনে হয় ঠিক একটা ষাঁড়ের মতো আমি। মোষ বা শুয়োরের কথাও মনে হয়। তবু কোনোটাই ঠিক উপমা না। আমার যথার্থ উপমা একটা ষাঁড়। জীবনের কাচঘরে হঠাৎ ঢুকে পড়ে সব ভেঙেচুরে তছনছ করেছি।

ষাট বছরের এই জীবনটাও তো কেটে গেল কাদাজলে হাবুডুবু-খাওয়া একটা ষাঁড়ের মতো। বেমক্কা যেখানে সেখানে ঢুঁশ মেরেছি।

তার জন্যে কি আমিই দায়ী? জীবনটাকে কি আমি নিজেই এলোমেলো করে ফেললাম? নাকি কেউ একজন মাথার ওপর থেকে কাজ করে চলেছে? একটা রাখালের মতো আমাকে তাড়িয়ে এনে ডুবিয়ে দিয়েছে জীবনের নোংরা নষ্ট আশাহীন জলাভূমির ভেতরে?—এখন মনে হয়, কিছুই ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না, এই ষাট বছরের পাকাচুল নিয়েও। দেখতে দেখতে জীবনটা একটা আঁধির মতো বয়ে গেল যেন। সেই আঁধির ভেতরে খড়কুটো ধুলোবালি কাঁকর এসে চোখমুখ ভরিয়ে ফেলল। কিছু ভালো করে বোঝার আগেই সব শেষ হয়ে গেল যেন।

অপরাধ কি আমারই?

অনেক কিছুর মতো একটা বিষয় বুঝি না। যত বয়েস বাড়ছে তত ছেলেবেলার দিনগুলো কৈশোরের দিনগুলো প্রথম যৌবনের দিনগুলো ঝলমল করে উঠছে। দিন দিন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। কী সুখী ছিল সেই দিনগুলো—সাতক্ষীরার সেই ডাক ঘুড়ি ওড়ানোর দিনগুলো, খালের দু-পারে বন্ধুদের সঙ্গে সকাল দশটা-এগারোটায় একবার, আবার বিকেলে-সন্ধেবেলা হাঁটা, আম-জাম-কাঁঠালের বাগানে বসে থাকা, কাঁকরোল খেতের ভেতরে এসে পড়া, ফ্যানহীন গুদোমঘরে বসে 'হাজার দস্তান'-এর মতো লম্বা একটা ছবি ঘেমে শুরুয়া হয়েও মন্ত্রমুগ্ধভাবে দেখা।

আব্বা তো এখানে-ওখানে চাকরি করতে রিটায়ার করার পরে সাতক্ষীরাতেই স্থায়ী হলেন। ঢাকায় বাড়িও করা হয়েছিল আমাদের। মোহাম্মদপুরে। কিন্তু থাকতাম সেই সময় কিছুকাল আজিমপুর কলোনিতে—আব্বার সরকারি চাকরি

সূত্রে। আজিমপুর পুকুরে আমার একমাত্র ছোট ভাই জাহিদ ডুবে মারা গিয়েছিল। তারপরই আমার দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী আব্বা কিরকম যেন হয়ে গেলেন, শরীরও ভেঙে গেল, আব্বার চাকরির ২৫ বছর পুরে গিয়েছিল, স্বেচ্ছায় রিটায়ারমেন্ট নিয়ে নিলেন। মোহাম্মদপুরের বাড়িটি ভাড়া দিয়ে, আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি, আমার জন্যে একটা ঘর বরাদ্দ করে, দেশে চলে গেলেন। সবটাই এত দ্রুত করলেন যে বোঝাই যাচ্ছিল, জাহিদের এই হঠাৎ পুকুরে ডুবে মরা ব্যাপারটিকে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। যেন মনে হচ্ছিল আব্বা নিজে দায়ী জাহিদের মৃত্যুর জন্য। আব্বা নিজেকে যেন অপরাধী মনে করতেন। অথচ জাহিদের মৃত্যুর পরই জনশ্রুতির মতো শোনা গেল, আজিমপুবের ঐ পুকুরে বছর বছর লোক মারা যায় কোনো অজ্ঞাত আধিদৈবিক কারণে। তার সঙ্গে আমার অন্য একটা সন্দেহও ছিল, পরিষ্কার সন্দেহ জাহিদের কয়েকজন বন্ধুই ওর মৃত্যুর জন্যে দায়ী। সত্যি কথা বলতে কি, ওর বন্ধুরাই ওকে মেরেছিল। তা নাহলে ওদের কি জানা ছিল না সাঁতার জানে না জাহিদ?

আজ ষাট বছর পার হয়ে আমার নিজেরও মনে হয় জাহিদের মতো আমিও সাঁতার জানি না। তা নাহলে জীবনে এমন হাবুডুবু খাই!

কী জানি কেন যত বয়েস হচ্ছে, জাহিদের চেহারা আমার মনে আরো পরিষ্কার হয়ে ভেসে উঠছে। আমি ছোটবেলা থেকেই বেঁটে মোটা। আর জাহিদ ছেলেবেলাতেই ফর্শা, ছোটবেলা থেকেই লম্বা হয়ে উঠছিল। কলেজে যখন পড়ছে, যখন মরে গেল, তখনই তো আমার চেয়ে লম্বা, আর দিন দিন কী যে সুন্দর হয়ে উঠছিল! ওর ঐ রূপই কাল হয়েছিল নাকি? কানাঘুষোয় শুনেছিলাম, কলোনিরই কোন মেয়ে ওর প্রেমে পড়েছিল, এই নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব। সত্যি-মিথ্যা ওপরঅলা জানেন।

জাহিদের অকস্মাৎ মৃত্যু আমাদের সারা পরিবারটিকে প্রবলভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল। আব্বার কথা তো বলেছি। ঢাকায় থাকতেই বড় আপার বিয়ে দিয়ে দিলেন, আমার ছোট এক বোনকে সাতক্ষীরায় নিয়ে যাওয়ার পরে।

আমাকেও বদলে দিয়েছিল জাহিদের মৃত্যু। আমারও অনেক বন্ধু ছিল। আমি মুখে ওদের কিছু বললাম না, কিন্তু ওদের আর বিশ্বাস করতাম না। সেটা ছিল ষাটের দশকের প্রথমদিকে। পাকিস্তান আমল। এক বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসা শুরু করে দিলাম। ইউনিভার্সিটিতে থাকতেই। তখন আইয়ুব খানের আমল। বাতাসে টাকা উড়ছে। আমরা মাঝে মাঝে পশ্চিম পাকিস্তানে যেতাম। আমরা একটি ইংরেজি পত্রিকা বের করেছিলাম। *ফোকাস*। ওর জন্যে বিজ্ঞাপন আনতেই পশ্চিম পাকিস্তানে যেতাম আমরা মূলত। করাচি তখন ছিল অন্যরকম। বিস্তর বিজ্ঞাপন পেতাম। অল্প বয়সে এত টাকা! তবু আমরা সচেতন ছিলাম। যৌনকেন্দ্রগুলোতে ঢুঁ মারতাম ঠিকই কিন্তু হিশেব রেখে। ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই আমরা বিপুল টাকা করলাম। আব্বা ততদিনে রিটায়ার করে সাতক্ষীরায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।

আমার আর সাতক্ষীরায় যাবার সময় হচ্ছিল না। পত্রিকার একটা বিশাল 'স্পেশাল সাপ্লিমেন্ট'-এর জন্যে আব্বার কাছে কিছু টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিলাম। আব্বা সাফ জানিয়ে দিলেন টাকা তিনি দিতে পারবেন না। পত্রিকার আর নিজের প্রয়োজনে মোহাম্মদপুরের বাড়িঘর টাকা আমি নিজেই নিচ্ছিলাম—আব্বাকে পাঠানো হচ্ছিল না। আব্বা বোধহয় এজন্যেই বিরক্ত হয়ে ওরকম একটি রূঢ় চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু কোথাও কিছু না, তারপরই টেলিগ্রাম পেলাম 'ফাদার সিরিয়াসলি ইল। কাম শার্প।' ব্যাপারটাও ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমার কোনো বিয়ে-ফিয়ের আয়োজন করেননি তো? তাও ভাবলাম সেকেলে এই ব্যাপারটা খুব কমন ছিল। পরদিনই আমাদের বিশেষ সংখ্যার বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্যে করাচি যেতে হবে। টিকিট কাটা হয়ে গেছে। করাচির কোনো কোনো হোটেলে বিক্রিত কয়েকটি শো টানছে। একটা হোটেলে দেখলাম মিউজিকের সাথে সাথে সঙ্গমের ভঙ্গি। করাচিতেই একটা মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম একটু। সে যাত্রা দু'সপ্তা থাকার কথা। দু'সপ্তার মধ্যে দিবারাত্রি কাজ করে বিজ্ঞাপনও জোগাড় করা গেল। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সংহতির বাণিজ্যিক সুবিধাটুকু আমরা কাজে লাগিয়েছিলাম। মনের আনন্দে আরো সপ্তাখানেকের বেশি পার করে দিলাম। আব্বার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে যাই। আমাকে যখন এই টেলিগ্রামটি পাঠানো হয়েছিল তখন তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন। তারপরও সাতক্ষীরা যেতে আমার সপ্তাখানেক দেরি হয়ে যায়। ঢাকায় ফিরে প্রেসে ম্যাটারগুলো না ধরিয়ে কী করে যাই! এত টাকার বিজ্ঞাপন তো আবার নষ্ট হয়ে যাবে।

আম্মা জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করলেন। ছোট বোনটি কথাই বলল না। দু-দিন থেকেই ফিরে আসতে হলো ঢাকায়। ঢাকায় বড় আপার বাসা যাবার পরে দেখলাম, তাঁরও রাগ। বলল, 'পরের ছেলে যেটুকু কর্তব্য করেছে, তুমি তো তাও করোনি।' পরের ছেলে মানে তার স্বামী। আসলে দুলাভাই আমার ভালোমানুষ। দুলাভাই ঠিকই করেছিলেন। ভদ্রলোক অতি আশ্চর্য, আমাকে বললেন, 'মাকিদ, রাত্রিবেলা খেয়ে যাও। তুমি তো আসারই সময় পাও না।' আপা কিছু বলল না। আমি চলে এলাম।

বড় আপা বলেছিল পরিষ্কার। ছোট বোন হাসনাও বলেছিল ইঙ্গিতে। ভগ্নিপতি কিছু বলেনি। হ্যাঁ, মা তো খোলাখুলি বলেছিলেন। কিন্তু সবার কথা এই যে, মোহাম্মদপুরের বাড়িটা আমি একাই অধিকার করেছিলাম। একমাত্র জীবিত পুত্র হিশেবে কী-হিশেবে, সেটা ব্যাখ্যা দিতেও চাই না। বাড়িটা আমার হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের এম. এ. ক্লাসের সহপাঠিনী জেবুন্নিসাকে বিয়ে করেছিলাম। ওর ডাক নাম রাখী। একটা প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের আগেই আমার পত্রিকার পার্টনার এবং দীর্ঘকালের বন্ধু হাশেমের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ প্রায় একই সঙ্গে ঘটেছিল। আমার এবং হাশেমের যৌথ এ্যাকাউন্ট ছিল।

হাশেম একদিন বলল—কি ব্যাপার মাকিদ, আমাদের দুজনার এ্যাকাউন্টে একটা টাকা নেই। আর এদিকে স্পেশাল সাপ্লিমেন্টের সমস্ত টাকা তুমি নিজের নামে আলাদা এ্যাকাউন্ট করে জমা দিয়েছ। তুমি একা চলে গিয়েছিলে করাচিতে। সেখান থেকেই সব ব্যবস্থা করেছ। মাকিদ, আমাদের ক-বছরের অসাধারণ ব্যবসা নাহয় বাদই দিলাম—তোমার সঙ্গে আমার এতকালের বন্ধুত্ব তুমি সব ভুলে যেতে পারলে? তুমি এত বড় বিট্রে করলে আমার সঙ্গে?

আমি বললাম—দ্যাখো, হাশেম, আমার হঠাৎ টাকার দরকার পড়ে গিয়েছিল। তাই করেছি। তোমার টাকা আমি দিয়ে দেবো।

হাশেম আর কোনো কথা না-বলে চলে গেল। আমার মতো হাশেমও জানত কোনোদিন আমি আর তাকে টাকা দেবো না।

তারপরই রাখীকে বিয়ে করলাম। বোনরা কেউ আসেনি। মাকে নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছিলাম। তারপর পৌঁছেও দিয়েছিলাম সাতক্ষীরায়।

ভালোই চলছিল। ব্যবসা। পারিবারিক জীবন।

কিন্তু কে জানত বছরখানেক বাদেই বাচ্চা হতে গিয়ে রাখী এরকমভাবে মারা যাবে? বাচ্চাটাও মারা গিয়েছিল।

বিয়ের পরে রাখীকেও আমি সময় দিতে পারতাম না—অন্তত বিয়ের আগে যেটুকু দিয়েছিলাম সেটুকুও নয়। কিন্তু সে যে হঠাৎই নেই হয়ে যাবে, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

আব্বার অভিশাপ কি? আম্মার বদদোয়া? প্রতারিত বোনদের গালাগাল? প্রতারিত হাশেমের বেদনা।

বিয়ে আর করব না ঠিক করেছিলাম। জীবনও চালাচ্ছিলাম সেইভাবে। কিন্তু ততদিনে আমার অবস্থা বেশ ভালো হয়ে গিয়েছিল। একটা টয়োটা গাড়ি পর্যন্ত কিনে ফেলেছিলাম। মতিঝিলে একটি অফিস নিয়েছিলাম। বয়সও তো বেশি হয়নি তখন। প্রস্তাবের পর প্রস্তাব আসতে লাগল। রাখীর সন্তান মরে গিয়েও আমাকে মুক্ত করে গেছে। আচ্ছা, রাখী বিয়ের পর থেকে কিরকম চুপ হয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে আমার দিকে এমনভাবে তাকাত যেন তার চোখ বলত : 'এ কে? একে তো আমি চিনি না? এর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তো ইউনিভার্সিটির বারান্দায় কি চীনা হোটেলের আলো-আঁধারের মধ্যে গল্প করিনি? এ কে?' তার চোখ বলে উঠত এই কথা, রাখী মুখ ফুটে কোনোদিন কিছু বলেনি। সে কি ভেতরে ভেতরে অনেক ঘৃণা করতে শুরু করেছিল? বিশেষ করে যেদিন সে জেনেছিল আমি অফিসে আমার সেক্রেটারি হিশেবে একটি সুন্দরী খ্রিস্টান মেয়েকে চাকরি দিয়েছি এবং তারপর অফিস থেকে ফিরতে আমার কোনো কোনো দিন দশটা-এগারোটা হয়ে যায়? সে কি তার ঘৃণার জন্যেই নিজেকে সরিয়ে নিল—তার সন্তানকেও সঙ্গে নিয়ে গেল? শুধু তার সন্তান—আমার সন্তান নয়—যদি একটা ছেলে কি মেয়ে থাকত রাখীর গর্ভজাত?

বিয়ে করেছিলাম আবার। আগে একবার বিয়ে হয়েছিল নিনার। চট্টগ্রামের এক অধ্যাপকের সঙ্গে। পরে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। বাপ ইঞ্জিনিয়ার। নিজে ইকনমিক্সে এম. এ. পাশ। একটা অফিসে চাকরি করত। আমি সতর্ক হয়ে গিয়েছিলাম। নিনার জন্যে অনেক সময় দিতাম। মাঝে মাঝে আউটিঙেও যেতাম। প্রথম ছেলে হলো। তারেক। তারপর আরো এক ছেলে। বারেক। নিনার একটা মেয়ের শখ ছিল খুব। আমারও। কিন্তু আমাদের ইচ্ছের ওপর কি নির্ভর করে আমাদের জীবন?

সবই চলছিল ঠিক। কিন্তু নিনার মন পাইনি আমি। তা নাহলে সতেরো বছর ঘরসংসার করে সে কি ডিভোর্স লেটার পাঠিয়ে দিতে পারে? আমার প্রথম জীবনের, এমনকি প্রথম বিবাহ-পরবর্তী নারীসঙ্গের অভ্যেস অনেকদিন ছেড়েছিলাম। কিন্তু ছেলেরা বড় হওয়ার পর, কখন অজ্ঞাতে যে আবার তৈরি হয়ে গিয়েছিল তা নিজেরও মনে পড়ে না। কিন্তু নিনা তো রাখী না। সে তার বাপের বাড়ি গিয়ে ওঠে। ডিভোর্স নোটিশ পাঠিয়ে দ্যায়। ছেলেরা ততদিনে বড় হয়ে গেছে। ছেলেরা জানি না কেন ছিল মায়ের পক্ষেই। এইসব বিচ্ছেদের সময়ই বারেক চলে যায় কানাডায়। আমি বুঝে গিয়েছিলাম সে আর ফিরবে না এদেশে। তারেক নিজস্ব একটা ব্যবসা ধরেছিল।

তারপর তো তারেক বিয়ে করে আলাদা হয়ে যায়। সেটাও তত খারাপ লাগেনি আমার, যত আহত হয়েছিলাম আমার সঙ্গে নিনার ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর তার বিয়ের সংবাদে।

আমার বিয়ের বয়েসও ছিল না। ইচ্ছাও ছিল না আর। সংসার সবার কপালে সহ্য হয় না।

কিন্তু আমি কি জীবনযাপনপ্রণালী বদলে ফেলেছিলাম? এত সহজ না। একটা বৃত্তের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম। সেই চাকার ভেতরে নিজের ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ঘুরেই যাচ্ছিলাম। ব্যবসা ছেলের হাতেই চলে গিয়েছিল। কিন্তু সে আমাকে চেয়ারম্যান করে রাখে প্রতিষ্ঠানের। তারপর তাও বাদ দ্যায়। আমার ধারণা, তার মায়ের পরামর্শে। নিনা আমার প্রধানতম শত্রুতে পরিণত হয়েছিল।

আমার সেই যৌবনের বন্ধু হাশেমও ব্যবসায়ী হিশেবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সে আমার সঙ্গে শত্রুতাও করেনি, বন্ধুতাও রাখেনি। আমার সঙ্গে সে বাক্যালাপ করত না। আমি কোনো ব্যবসায়িক কনফারেন্সে ওর সঙ্গে দেখা হলে 'কেমন আছ?' জিজ্ঞেস করলে সে একটিমাত্র বাক্য ব্যবহার করত 'ভালো।' বলে সরে যেত কঠিন মুখে।

* * *

এখন বৃদ্ধ হয়েছি।

এখন আমার কোনো সঙ্গী নেই। বউ নেই। ছেলেরা নেই। আব্বার তৈরি বাড়িটার দোতলার ভাড়া আর ব্যাঙ্কের কিছু টাকা আমার সম্বল। কিন্তু তাতে আমি

সুখীই আছি একরকম। বরং মাঝে মাঝে মনে হয়, কি অকারণেই-না এক সময় ছুটোছুটি করতাম। এত টাকার দরকার আছে নাকি মানুষের জীবনে? এখনো তো দিন ঠিকই চলে যাচ্ছে।

আমার গাড়িটা এখন চালায় তারেক—তাতে আমার সুবিধেই হয়েছে। কোনো তাড়াহুড়ো নেই। একা একা ঘুরে বেড়াই রাস্তায়। কত কিছু দেখবার আছে। বাড়ির কাছে একটা পার্ক আছে। ছোট পার্ক। দু-পাশের রাস্তায় গাড়ির স্রোত। বিকেলবেলা যখন আস্তে আস্তে হেঁটে সেই পার্কে গিয়ে একটা বেঞ্চিতে বসি, তখন ভালো লাগে খুব। ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করে খেলা করে। ওদের মনে হয় প্রজাপতির মতো। বয়স্ক নারী-পুরুষ কেউ কেউ পার্কের ভেতরে চক্কর দেয়। তাদের দেখি। ঘাস দেখি। গাছ দেখি। সবুজ দেখে চোখ জুড়ায়। তারপর যখন সন্ধে নামে, পার্কটি যেন হঠাৎ ফাঁকা হয়ে যায়। শিশুরা চলে যায়। লোকজনও কমে যায়। যে-আকাশটা এতক্ষণ চোখেই পড়েনি, সেই আকাশটায় নজর চলে যায়। আকাশের রঙ স্বচ্ছ নীল থেকে ঘন-নীল হতে থাকে ক্রমশ। আর একটা-দুটো করে তারা ফুটে উঠতে থাকে। তারা! তারা! অগণন সোনালি রূপালি তারা। তারায় তারায় ভরে যায় সমস্ত আকাশ। দিনভোর কোথায় ছিল এত তারা! না, ওরা তো ঠিকই ছিল। শুধু অন্ধকার নাহলে দেখা যায়নি ওদের।

আগে মনে হতো : দিনটা কেন আরো লম্বা হয় না, তাহলে আমি আরো বেশি কাজ করতে পারতাম,আরো টাকা আয় করতে পারতাম! এখন মনে হয় কখন রাত্রি আসবে, নীল ঘননীল রাত্রি, ভেলভেটের মতো আকাশ, হিরেজহরতের মতো অগণন তারা, সোনার নৌকোর মতো চাঁদ। শুধু পার্কের বেঞ্চিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা যায় ঘাস আর গাছ আর আকাশ আর রাত্রি দেখে। আর ভেবে ভেবে। মাথামুণ্ডুহীন ভেবে। না সংসারের কথা, স্ত্রী-পুত্র-বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়-স্বজন না—এই বিশাল বিশ্বচরাচর এই বিপুল মানবপ্রবাহের কথা ভেবে।

রাত্রিবেলা গাড়িতে ফিরে ছোকরা চাকরের হাতে তৈরি হাতে-গড়া রুটি আর সামান্য তরকারি খেতে টেলিভিশনটা চালিয়ে দিই। কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান দেখার জন্যে নয়। যে-কোনো অনুষ্ঠান হোক। টিভি চলতে থাকে। আমি খাটে আধো শোয়া হয়ে টিভির স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। রাত্রির শেষ সংবাদের পর, জাতীয় সংগীতের পর, তারপর টিভি বন্ধ করে শুতে যাই। অনেকক্ষণ ঘুম আসে না। মাঝে মাঝে ঘুমের ওষুধ খাই। তারপর ঘুমিয়ে পড়ি একসময়।

মাসে দু-মাসে তারেকের উত্তরার বাসায় যাই। সেখানে একটিই আকর্ষণ তারেকের ছেলে ঝিনুক। বৌমার বাপের বাড়ি চট্টগ্রামে। তারেক কিছুদিন চট্টগ্রামে ছিল। সেখানেই ঝিনুকের জন্ম। এখন ওরা ঢাকায়। ছোট্ট ঝিনুকের জন্য খেলনা নিয়ে যাই, চকোলেট নিয়ে যাই। তারেকের সঙ্গে সব সময় দেখা হয় না। আমার সঙ্গে দেখা হলে সে হয়তো ভদ্রতা করে দু'একটা কথা বলে। কিন্তু আমার প্রতি

তার যে কোনো আগ্রহ বা কৌতূহল আছে তা মনে হয় না। পরের মেয়ে তারেকের বৌ বরং আমাকে রাতে খেয়ে যেতে বলে। আমি অবশ্য খাই না। এক কাপ চা-এর বেশি কিছু খাই না। ঝিনুক আমাকে জড়িয়ে ধরে। আমি হয়তো জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা দাদুভাই, সারাদিন কি করলে বলো তো আজ? ঝিনুক গড়গড় করে বলে যায়—ম্যাও দেখলাম, আব্বুর সঙ্গে বল খেললাম, বিস্কুট খেতে খেতে আম্মুর সঙ্গে পায়রা দেখলাম, পানি খেলাম, শিশুপার্কে গেলাম, মোটর-সাইকেলে চড়লাম...।

তার কথার অর্ধেকই বুঝতে পারি না।

তারপর একমাস ধরে ঝিনুকের কথাগুলো মনের ভেতরে চলতে থাকে, বিশেষ করে রাত্রিবেলা শোবার পরে—ঘুম আসার আগে। 'পানি খেলাম' এটাও তাহলে একটা কাজ? আমি অনেক দিন পরে নিজের মনে হা হা শব্দ করে হেসে উঠি। তারপর ঘুমিয়ে পড়ি একসময় ॥

[১৯৯৭]

ছবি ও মানবী

আমাকে আপনারা চেনেন। আমার কিছু নাম-ডাক আছে। আমি একজন চিত্রশিল্পী। এদেশের অনেক বিখ্যাত লোকের বইয়ের প্রচ্ছদ আমারই করা। আমার ছবির একাধিক প্রদর্শনী হয়েছে। দেশের বাইরেও আমি গিয়েছি দু'একবার। জয়নুল আবেদিন স্যারকে আমরা পেয়েছিলাম আমি যখন আর্ট কলেজের ছাত্র, স্যার তখন প্রিন্সিপাল। আমরা চোখের সামনে দেখেছি, আবেদিন স্যার কিভাবে আর্ট কলেজে গড়ে তুলছেন, তখন সময়টিই ছিল অন্যরকম। আমাদের প্রথম যৌবন। বাতাসে কৃষ্ণচূড়া আর পলাশের রঙ ছড়িয়ে ছিল। দেখতে দেখতে বয়েস হয়ে গেল আমাদের। চুলে পাক ধরল। আমাদেরই বন্ধু-বান্ধব মরেও গেল কেউ কেউ, কেউ কেউ এই বয়সেই কঠিন অসুখে ভুগছে, আবার অনেকে এদেশের প্রথম কাতারের শিল্পী আর সংস্কৃতিবিদ হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে একা যখন থাকি, তখন এসব ভেবে অবাক লাগে।

একা একা তো বটেই। হ্যাঁ, বিয়ে-থা করা হয়নি আমার। একা-একাই জীবন কেটে গেল, যাচ্ছে। মাঝে মাঝে—বিশ্বাস করুন—ভারি একাকী মনে হয় নিজেকে। আত্মহত্যা করার কথাও ভেবেছি মাঝে মাঝে। উদ্যোগের অভাবে তা করা হয়নি। কিন্তু বিমর্ষ হতে তো বারণ নেই। মাঝে মাঝে অসম্ভব বিষণ্ণতায় ভুগি। ভুলে থাকবার জন্যেই আমাকে মদ পান করতে হয়। একটা দোকান-বাড়ির তেতলায় আমি থাকি। রাস্তার ওপরেই, এক তলার দোকান, দোতলার দোকান, তেতলায় আমার এই একটিমাত্র ঘর। বড় বাথরুম আছে। রান্নার ঘর আছে। একটা বয়স্কা কাজের মেয়ে লোক আছে। ঘড়ির কাঁটার মতো সকাল-বিকেল আসে। রান্না করে দিয়ে চলে যায় সব টেবিলের ওপর গুছিয়ে রেখে। খুব সকালবেলা আসে। আটটার মধ্যে নাশ্‌তা রেডি, দুপুরের খাবার রেডি। আমি নাশ্‌তা খেয়ে অফিসে চলে যাই। দুপুরে ঘরে ফিরে ভাত খাই। বিকেলে আবার মেয়েলোকটা আসে। রাতের খাবার তৈরি করে। পরের দিনের অনেক কাজ এগিয়ে রাখে। রাস্তার দিকে মুখ-করা এক চিলতে বারান্দা আছে। রাত্রিবেলা ইজিচেয়ারটা টেনে নিয়ে সেই বারান্দায় বসে থাকি অনেক সময়। আলো নিভিয়ে। অন্ধকারে। নিচের রাস্তার কোলাহল, গাড়ি-ঘোড়ার আওয়াজ কমে আসে ততক্ষণে। মাঝে মাঝে ঝড়ের গতিতে এক-একটা ট্রাক চলে যায়। তার শব্দ কিন্তু নৈঃশব্দ্যকে আঘাত করে না—ঐ শব্দকে নৈঃশব্দ্যেরই একটা ছন্দ বলে মনে হয়।

ইজিচেয়ারে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবি। আব্বার কথা মনে হয়, আম্মার কথা মনে হয়, ভাই-বোনের কথা মনে হয়। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় এঁদের জমি ছাড়তে হয়েছে চিরদিনের মতো। আব্বা ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের ভালো চাকরি করতেন। কলকাতার পার্ক সার্কাসে বাড়িও ছিল আমাদের। আব্বার কী খেয়াল হয়েছিল, পার্ক সার্কাসের বাড়ি ভাড়া দিয়ে আমরা এসে উঠেছিলাম চৌরাস্তার এক চমৎকার শানশওকতঅলা ফ্ল্যাটে। সেটাই কাল হয়েছিল। কলকাতায় দাঙ্গা যেদিন চূড়ান্ত-রকম ছড়িয়ে পড়ে, আমি পার্ক সার্কাসে এক বছর বাড়িতে আটকা পড়েছিলাম। ওরা—বন্ধু, তার বাবা-মা রাতে কিছুতেই আমাকে ফিরতে দিলেন না। চতুর্দিকে অগ্নিশিখা, 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি। পরদিন সকালে বেরোতে পারলাম না। দুপুরের পর যখন শহর ঠাণ্ডা হয়েছে খবর পেলাম, বন্ধুকে নিয়ে আমাদের বাড়ির উদ্দেশে বেরোলাম। হেঁটেই। কোনো যানবাহন ছিল না, থমথম করছে সব। কলকাতা শহর চেনা যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল শহরের উপর দিয়ে একটা বিপুল ঝড় বয়ে গেছে। আমাদের বাড়ির ফ্ল্যাটের দরোজা ভেজানো ছিল। ভেতরে গিয়ে দেখলাম পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে যারা প্রিয়জন আমার—বাবা-মা, ভাই-বোন তারা প্রত্যেকেই রক্তের ভেতর শুয়ে—মৃত। আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। যা করবার আমার বন্ধুটা করেছিল। রাত্রিবেলা, অন্ধকারে, ইজিচেয়ারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে থেকে এদের কথাই ভাবি। বাবা-মা, ভাই-বোন যদি বেঁচে থাকত তাহলে কী হতো। আমার জীবনটা ফুলে-ফলে ভরে উঠত। বিয়ে-যে করা হয়নি, তার কারণ কেউ আমাকে তেমনভাবে বলেইনি। আত্মীয়-স্বজনের কথা বলছি। ঢাকায় চলে আসার পর আমাকে সম্পূর্ণ নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়েছে। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তেমনভাবে সম্পর্ক রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কোনো সহায়তাও পাইনি। কোনো নারীর সঙ্গে তেমনভাবে আর যুক্ত হওয়া হয়ে ওঠেনি। একাকীই জীবন কেটে গেল—যাচ্ছে। না। যাচ্ছে বললে ঠিক হবে না। যাচ্ছিল বলাই উচিত। কেননা কয়েক বছর আগে আমার প্রথম চিত্রপ্রদর্শনীতে শিল্পকলা একাডেমীতে পনেরো দিন ধরে হয়েছিল—একজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। রূপা। ঢাকার একটি মাসিক পত্রিকায় মেয়েটি কাজ করে। পড়াশোনাও করছে—একই সঙ্গে সাংবাদিকতা। মেয়েটি আমার প্রদর্শনীতে এসেছিল। তাদের পত্রিকায় ক্যামেরাম্যানকে নিয়ে। দুপুরবেলা। প্রদর্শনীর প্রায় শেষ দিক তখন। ভিড় ছিল না তখন। সেদিন আমি অফিস থেকেই চলে এসেছিলাম শিল্পকলা একাডেমীতে। বাসায় ফিরিনি আর। মেয়েটি আমাকে দেখে এগিয়ে এল। বলল—আপনিই তো মাসুদ আহমেদ, তাই না?

বললাম—হ্যাঁ।

রূপা আত্মপরিচয় দিয়ে বলল—দেখুন, আমরা তো ছবি-টবি অত বুঝি না। আমাদের পত্রিকায় আপনার এই প্রদর্শনীর ওপর একটা লেখা যাবে। লেখাটা আমিই তৈরি করব। আপনি যদি একটু সাহায্য করেন ছবি বুঝতে, সুবিধে হয় তাহলে—। আমি বললাম—নিশ্চয়ই, নিশ্চয় সে তো আমার সৌভাগ্য।

একটা বিষয় আমাকে বলতেই হবে আমাদের দেশের অনেক শিল্পীর মতো প্রচারের জন্যে আদেগলেপনা আমার নেই। আমার ছবির প্রদর্শনীও অবশ্য একজন মন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন—কিন্তু সে অনেকটা প্রথামাফিক। প্রচারের ব্যাপারে আমার একটা থিয়োরি আছে। তা হচ্ছে যে, যেটুকু প্রচার সহজভাবে হয়, সেটুকুই ঠিক চেষ্টা–তদবির করে প্রচার দরকার নেই। এতে আমার কোনো ক্ষতিও হয়নি। আমার চেয়ে অনেকে খ্যাতি অর্জন করেছেন বেশি ঠিকই, কিন্তু আমিও একেবারে অপরিচিত নই।

রূপা মেয়েটা দেখলাম বেশ সহজ, স্বাভাবিক। আমি অবশ্য মেয়েদের সঙ্গে খুব স্বচ্ছন্দভাবে মিশতে পারি না। কিন্তু রূপা এমন সহজ-স্বচ্ছন্দ যে, আধ ঘণ্টার মধ্যেই যে আমার আড়ষ্টতা কাটিয়ে দিল। আমার সঙ্গে সে এমনভাবে কথা বলতে লাগল যেন আমি তার বহুদিনের চেনা। আমি ভেতরে ভেতরে একেবারে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। এমনিতেই মেয়েদের সঙ্গে তেমন মিশিনি—আমাদের সময়ে সে-সব সুযোগই ছিল না। আর এখনকার মেয়েরা তো একদম অচেনা। আমার কাছে বিদেশিনী বলা যায়। রূপা এমন সহজ করে দিল সমস্ত পরিবেশ যে, আমি আজ তার হাতের পুতুলে পরিণত হয়ে গেলাম। সে যখন প্রস্তাব দিল—মাসুদ ভাই, আপনার সঙ্গে আমি কোথাও—চা খাওয়া যাক—আমি তখন 'নিশ্চয়, নিশ্চয়' ছাড়া আর কিছু বলতে পারলাম না। রূপা তার ক্যামেরাম্যানকে বিদায় করে দিল।

আমরা একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসলাম। এবং—বিশ্বাস করবেন না—এক ঘণ্টার মধ্যে আমার মনে হতে লাগল রূপার সঙ্গে যেন আজই অনেক অনেক দিনের ঘনিষ্ঠতা। এমনি একদিন রূপা জিজ্ঞেস করল, মাসুদ ভাই—ভাবি কী করেন? এই একটা প্রশ্ন শুনে আমার এই বয়েসেও চোখ-কান লাল হয়ে যায়। আমাকে বলতেই হলো যে, আমার আর বিয়ে করা হয়নি।

—সে কী! রূপা সত্যি অবাক হয়ে গেল। এবং আমি লক্ষ্য করলাম যে, কত ছেলেমানুষ—সদ্য কৈশোরকে অতিক্রম করেছে। কিন্তু সে কিছুতেই অপ্রতিভ হয় না। মুহূর্তের মধ্যে তার চোখে-মুখে দুষ্টু-হাসি খেলা করতে লাগল। বলল—কোনো এ্যাফেয়ার ছিল নাকি? খিলখিল করে হেসে উঠল—ছ্যাঁক দিয়েছে কেউ? তারপরই যোগ করল—আমি অবশ্য পত্রিকায় সে সব লিখবনা—কথা দিচ্ছি। শুধু আমার কৌতূহল মেটানোর জন্যেই জিজ্ঞেস করছি। তার কালো চোখে কৌতূক আর দুষ্টুমির ঝিলিক।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম—না—না—সেসব কিছুই না—এই হয়নি আর কি—মানে বিয়েটা ঠিক করা হয়ে ওঠেনি—

তারপরই আচমকা রূপা জিজ্ঞেস করল—আপনি কোথায় থাকেন?

বললাম। তারপর স্বাভাবিক সৌজন্যবশত বলতেও হলো—একদিন আসুন।

রূপা কিন্তু সিরিয়াস। বলল—কবে?

তখন রূপাকে বললাম—আমি তো একটা অফিসে চাকরি করি।

—ও। রূপা বলল—তাহলে তো আপনার অফিসেই দেখা হতে পারে।

—আর্ট কলেজে যখন পড়ি তখন একটাই লক্ষ্য ছিল : একজন চিত্রশিল্পী হব। বিশ্ববিখ্যাত না হই, দেশ-বিখ্যাত হবো। আমাকে নিজের রুজি নিজেই জোগাড় করতে হয়েছিল তখনই। আবেদিন স্যার এবং অন্য স্যাররাও আমার দুরবস্থার কথা জানতেন এবং টাকা-পয়সা উপার্জনের কিছু ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। জীবনের বাস্তবতা—কঠোর বাস্তবতা—আমি জানতাম। কিন্তু তবু আমার একটা স্বপ্নই ছিল চিত্রশিল্পী হওয়ার। ধানগাছ, খুশি কৃষক-দম্পতি, গ্রামের বাড়ি-ঘরের ছবি এঁকে একটা আধা-সরকারি অফিসে আমাকে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে, তা ভাবিনি। বইএর আর পত্রিকার প্রচ্ছদ আগেও আঁকতাম।—কিন্তু আমার স্বপ্নের আঁকাজোকা যে বাদ পড়ে যাবে, তা ভাবিনি কখনো। কিন্তু ক্রমাগত তাই হচ্ছিল। আবেদিন স্যারেরই দাক্ষিণ্যে এই আধা-সরকারি চাকরিটা পেয়েছিলাম। কিন্তু স্যার তখনই বলেছিলেন—দেখো তোমার আঁকা ছেড়ে দিও না যেন। তবে ছবি আঁকার—নিজস্ব ছবি আঁকার আসল উৎসাহদাতা ছিলেন কামরুল হাসান। কামরুল ভাই তখন ডিজাইন সেন্টারে চাকরি করেন। মাঝে মাঝে যেতাম। কামরুল ভাই খুব উৎসাহী মানুষ। বলতেন—দ্যাকো, শুধু চাকরি করছ না তো। ও পেটের ধান্দা। ও তো করতেই হবে। আমাকেও তো করতে হচ্ছে, কিন্তু আমি রাত জেগে ছবি আঁকি। অফিসেও সময় পেলে নিজস্ব ছবির কাজ করি—কত স্কেচ করেছি দ্যাখো—বলে খাতা খুলে দেখাতেন। দেখতাম এই শিশুর মতো মানুষটিকে—যিনি আসলে ছবি আঁকা ছাড়া আর কিছু জানতেন না। কামরুল ভাইয়ের প্রেরণাতেই রাত জেগে জেগে কিছু কিছু ছবি আঁকা ধরেছিলাম আবার। তার ফলেই আমার ঐ প্রথম একক প্রদর্শনী দেরিতে হলেও সম্ভব হয়েছিল। আর্ট কলেজে আমি ছিলাম হাশেম খান—রফিকুন নবীদের সহপাঠী। ওদের মতো নাম-ধাম আমি করতে পারিনি ঠিকই—কিন্তু আমার একটি নিজস্ব জগৎ ছিল। আর আমার সৌভাগ্য এই যে, জয়নুল আবেদিন—কামরুল হাসান আমাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কামরুল ভাই বলতেন—তোমার জীবনে এত দুঃখ, কিন্তু তোমার ছবিতে এত স্বপ্ন কেন? আর দ্যাখো, এ্যাবস্ট্রাক্ট ছবি কোথাও নিয়ে যেতে পারে না—আমি কামরুল ভাই-এর সারল্য আর দৃষ্টিকোণ জানতাম বলেই একটু আহত হলেও কিছু বলতে পারতাম না। বলতে পারতাম না—কামরুল ভাই, আপনার ছবিতে যে-স্বাস্থ্যবতী নারী দেখি, তারা কি বাংলাদেশের?—তারা তো আসলে স্বপ্নের জগতের আপনার স্বপ্নের কল্পনার নিজস্ব দেশের—কিন্তু কামরুল ভাইকে আমি বুঝতাম। তাঁর স্বপ্ন, তাঁর যন্ত্রণা। ভিন্ন জগতের হলেও কামরুল হাসানকে আমি মনে করতাম প্রকৃত শিল্পী।

রূপা যেন আমার প্রচারের ভার নিয়েছিল। ফোন করে যেদিন সে প্রথম আমার অফিসে এল, সেদিন তার হাতে ছিল তাদের পত্রিকার সদ্যপ্রকাশিত দুটি সংখ্যা। হাসিমুখে তেমনি সহজস্বচ্ছন্দভাবে রূপা বসল আমার অফিসে। রূপাকে সেদিন দুপুরে আমার সঙ্গে যেতে বললাম। অফিসের কাছে একটা ছোট চিনে রেস্তোরাঁয় আমরা গেলাম। এখানে মাঝে মাঝে স্থানবদলের জন্যে কিংবা অনেক সময় অফিসে বসেই সারাদিন অন্য কাজ করি বলে—এই রেস্তোরাঁয় খেয়ে নিতাম। চিনে

রেস্তোরাঁয় বয়-বেয়ারারা আমার চেনা। গল্প করতে করতে তিনটে বেজে গেলেও তাই আমাদের উঠতে হলো না। রূপা—জানি না কেন আমার সঙ্গে কথা বলে খুব আনন্দ পাচ্ছিল। গল্প করছিলাম চিত্রকলা নিয়েই। জয়নুল আবেদিন—কামরুল হাসান—আমার সতীর্থদের গল্প। রূপা কিছু কিছু টুকেও নিচ্ছিল। বলল—আমাদের পত্রিকায় না—অন্য একটা পত্রিকায় আপনার একটা দীর্ঘ ইন্টারভিউ ছাপব—আপনার সঙ্গে এই কথা বলার ভিত্তিতে। আপনার আপত্তি নেই তো?

—না—না, আপত্তি কিসের? আমি বললাম।—প্রচার যত হয় ততই তো লাভ—আমি হাসছিলাম।

রূপাও হাসছিল।—আমারও লাভ আছে। ওরা খুব ভালো টাকা দ্যায়। আপনার বদৌলতে আমি কিছু টাকা পাব। তারপরেই হেসে যোগ করল—আপনারও লাভ—আমারও লাভ। আচ্ছা, আমাদের দু'জনেরই লাভ, কিন্তু কথাটায় আরেকটা বানান জানেন তো?' বলে তার নিউজপ্রিন্টের প্যাডের ওপর বলপেনে বড় বড় করে লিখল : LOVE।

আমি স্তম্ভিত হয়ে কিছু বলতে পারলাম না। রূপা দেখি আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসছে। হাসতে হাসতেই বলল—আমি আপনার প্রেমে পড়ে যাচ্ছি না তো? কিংবা আপনি আমার? তা নাহলে এতক্ষণ ধরে হোটেল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে—

আমি লজ্জায় লাল হয়ে উঠলাম।

রূপা আমার বয়সের অর্ধেকের চেয়েও ছোট। যথাসময়ে বিয়ে করলে ওর বয়সি মেয়েই থাকতে পারত আমার। আমার মধ্যে—ও কী দেখেছিল জানি না। কিন্তু দিনে দিনে আমার কাছাকাছি চলে এসেছিল। ওকে 'আপনি' বলাই আমার পক্ষে কষ্টকর ছিল, সেজন্যে যেদিন ওকে 'তুমি' বলার অধিকার পেলাম সেদিন নিজেকে খুব হালকা মনে হলো। কোথায় কোথায়-না ও আমাকে নিয়ে গিয়েছিল—সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে, লেকের ধারে, চিড়িয়াখানায়, ঢাকার নির্জন সব রেস্তোরাঁয়। এমনকি ও একদিন আমাকে বলল—চলো, ঘুরে আসি কদিন ঢাকার বাইরে থেকে। আমার সাহসে কুলোয়নি। কিন্তু ঐটুকু মেয়ে আমাকে অনায়াসে 'তুমি' বলছে—লোকজনের সামনে অবশ্য না—আমি ভেতরে ভেতরে অবাক হতামই—এই ভেবে দুঃখিতও হতাম যে, আজকালকার ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই যোজনযোজন ব্যবধান ঘটে গেছে।

কিন্তু রূপার সাহসের কোনো শেষ ছিল না। যে দোকান-বাড়ির তিন তলায় আমি ভাড়া থাকতাম, সেটা আমার এক বন্ধুদের বাড়ি। আর্ট কলেজে পড়তে পড়তেই পড়া ছেড়ে দ্যায় সে—আমাদের সঙ্গে পড়ত—পরে হয়ে ওঠে ব্যবসায়ী—বছরের অধিকাংশ সময় থাকত বিদেশে। সে-ই বন্ধু হিসেবে আমাকে ঐ ঘর ভাড়া দ্যায়। সে জানত, আমার স্বভাব-চরিত্র ভালো—অন্তত কোনো মেয়ে আমার ঘরে আসবে না। সে জন্যে নিরুপদ্রবেই কাটাচ্ছিলাম। মাস গেলে ভাড়াটা বন্ধুর বিধবা মায়ের হাতে দিয়ে আসার পরে আর আমার কোনো দায়-দায়িত্ব থাকত না। রূপাই প্রথম মেয়ে, সে আমার বাসায় আসে। আগে থেকেই ফোনে

এ্যাপয়েন্টমেন্ট করা থাকত, সে সোজা চলে আসত উপরে। দোকানপাট চতুর্দিকে, বড় রাস্তার ওপরে বাড়ি, সারাক্ষণ রাস্তা গমগম করছে—কে আর অত খোঁজ রাখে?—আমি ভাবতাম।

কিন্তু ভাবছিলাম—রূপার সহজ-স্বাচ্ছন্দ্য আর সাহসের কোনো তুলনা ছিল না। একদিন আমার ঘরে ওকে বললাম—তোমার একটা ছবি আঁকতে ইচ্ছে হয়, রূপা।

—ছবি? আঁকো। বলে হাসতে লাগল—ন্যুড নাকি?

রূপার সংস্পর্শে আমারও সাহস বেড়ে গিয়েছিল। বললাম—ন্যুড হলে তো খুব ভালো হয়।

রূপা তখনও হাসছে খুব। বলল—উর্ধাঙ্গ হলে আপত্তি নেই।

আমার তখন সাহস বেড়ে গেছে খুব। ওর সঙ্গে থেকে কথাও শিখেছি।

বললাম—তাহলে তো আর ন্যুড হলো না?

রূপা বলল, অপরূপ মুখ ভঙ্গি করে—উহ—বসতে পেলে শুতে চায়। আমার মতো মেয়ে তোমাকে এটুকু সুযোগ দিচ্ছে তা কি কম হলো? বিশেষ করে তোমার মতো ভীরু-ভিতুর ডিমের জন্যে এই তো বেশি। আমি যদি তোমাকে বিয়ে করতে চাই, তোমার তো রাজি হওয়ার সাহসও হবে না।

না। সত্যি, সেই সাহস আমার হয়নি।

কয়েকদিন—না কয়েক মাস—আমার পৃথিবী ওলোটপালোট করে দিয়ে রূপা একটা জলপরির মতো জীবনের জলস্রোতে মিশে গেছে। যেমন হঠাৎ একদিন ওকে চেয়েছিলাম। তেম্নি হঠাৎই আমার জগৎ থেকে ও সরে গেল। নামি আমিই সরিয়ে দিলাম?

নিয়মিত আমার অফিসে আসছিল রূপা। দুপুরবেলা সেজেগুজে হঠাৎ একটা ঝলমলে নক্ষত্রের মতো এসে পড়ত আমার ঘরে। বস্ এসে বললেন, সেদিন রাতেই আমার বন্ধু ফিরে এসেছিল দু'দিন আগে—আমার বাড়িঅলা বন্ধু আমার ঘরে এসে বলল—মাসুদ, আম্মা বলছিলেন এবার তেতলাটা তৈরি করে ফেলতে—তুমি তো থাকলেও অনেকদিন—এখন নিশ্চয় তোমার অন্য কোথাও খুব একটা অসুবিধে হবে না।—বন্ধুটি সত্যিই আমাকে ভালোবাসত—সে আরো কঠিন কথা বলতে পারত, বলেনি।

আমি কি ভুল করেছিলাম কোনো?—পরদিন দুপুরবেলা রূপা আসতে, আমি তাকে খুব মোলায়েম করেই ঘটনা দুটি জানিয়েছিলাম।

রূপা সেই যে গেল, আর আসেনি কখনো। আর আমার স্বভাব এমন, আমিও একবারও তার খোঁজ করিনি। রাত্রিবেলা এখন বারান্দার-অন্ধকারে-ইজিচেয়ারে শুয়ে আমার কয়েকজন মৃত প্রিয়জনের সঙ্গে আরএকটা মুখও ভেসে আসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে শুয়ে কত কল্পনার জাল বুনি।

নগ্নবক্ষা রূপার সেই ছবিটা কিন্তু আমি এঁকেছিলাম। রূপারই নির্বন্ধে। রূপা বলছিল—ইশ, একটা ছবি আঁকারও সাহস নেই? তুমি আবার একটা আর্টিস্ট! রূপা বলছিল—কিন্তু আঘাত করবার জন্যে নয়, আমার ভেতরে সাহস জাগিয়ে দেবার

জন্যে যেন। কয়েকদিনের সীটিঙে আমি রূপার একটি নগ্নবক্ষা কিন্তু নিম্নাঙ্গ-আবৃত একটি পূর্ণদৈর্ঘ ছবি এঁকেছিলাম। তার পাশে আলোকিত রাত্রি, শহরের ছাদের পর ছাদ। আমার স্থান থেকে যেমন দেখা যায়।

ভীরু আমি—ভীরু আমি—কল্পনার জগতের অধিবাসী আমি। রূপাকে কি আমি নিজেই প্রত্যাখ্যান করেছিলাম? রূপাকে কি আমি নিজেই প্রত্যাখ্যান করিনি?

একদিন অনেক রাতে অন্ধকার বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে ঘরের ভিতরে ফিরে এসে আলো জ্বেলে দিলাম। সামনেই রূপা। নগ্নবক্ষা কিন্তু তার নিম্নাঙ্গ ছায়ায় ঢাকা। ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে—হাসছে তার অমলিন ঝর্ণাধারার হাসি। আমার আঁকা রূপার ছবিটা কই? রূপার ছবিটা? সেটা সামনেই থাকে। কিন্তু ছবিটা আমি খুঁজে পেলাম না। একটা শূন্য ক্যানভাস দাঁড়িয়ে থাকে। দেখলাম শুধু—কোনো আঁকাজোকা নেই তাতে। পলকে আমি দেখে নিয়েছিলাম। কেননা নগ্নবক্ষা হাসিমুখ রূপার চোখ থেকে শরীর থেকে আমি চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। আমাকে দেখে রূপা হেসে এগিয়ে এল। তারপর দরোজার দিকে এগোল। আমি তার পিছন পিছন। দরোজা খুলে রূপা সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। আমি তাকে ধরতে গেলাম। রূপা ততক্ষণে মধ্যরাত্রির জনমানবশূন্য রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। আর কখন সে যেন সম্পূর্ণ নির্বসন হয়ে গেছে। আমি তার পিছনে হাঁটছিলাম। কিন্তু তাকে কিছুতেই ধরতে পারলাম না ॥

[১৯৯২]

গল্প ১৯৭৩

১। ফাল্গুনের আশ্চর্য সুন্দর বিকেলবেলা : রোদ পড়ে এসেছে, তাপ নেই, রোদের রঙ সোনালি মধুর মতো, চমৎকার ফুরফুরে বাতাস বইছে কাঁচি-ছাঁটা কাগজের নকশার মতো, আকাশ নীলিমা হয়ে আছে।

২। আমার মনে বিষাদ, অনন্ত বিষাদ লেগে আছে। কোনো কারণ নেই এই বিষাদের, তবু বিষাদ আমার নিত্যসঙ্গী।

৩। ফাল্গুনের অসম্ভব-সুন্দর বিকেলবেলার পথ ধরে লোক হাঁটছে রিকশা স্কুটার ট্যাক্সি মোটর ছুটে চলছে। হাঁটছে—চলছে—ছুটছে সব যেন কাচের ভিতর দিয়ে যেন কাচের উপর দিয়ে। পথের ধারে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে তবু মাথা নেড়ে স্বাগত জানাচ্ছে বসন্ত : কালো পিচ-পথের উপর শুকনো হলুদ পাতা সবুজাভ-হলুদ পাতা পুষ্পবৃষ্টির মতো এসে পড়ছে যেন।

৪। আমি রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না, আমি সামাজিকতায় বিশ্বাস করি না। তাই কি আমি বেছে নিয়েছে একটি ঘরের চতুষ্কোণ? কিন্তু ঘরেরও জানালা আছে, দরোজা আছে। সেই দরোজা-জানালা দিয়ে বহিঃপৃথিবীর আলো-হাওয়া আসে : লাল আলো, কালো হাওয়া, শাদা আলো, সবুজ হাওয়া।

৫। রাজচূড়ার হৃদয় স্যন্দমান কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে কি কোথাও?

৬। যুবকটিকে আজ বেশ কয়েকদিন পরে দেখা গেল শেভ করতে বসতে : তার সুমুখে একটা ফাট-ধরা পারা-ওঠা আয়না, শেভিংক্রীম ব্রাশ, রেজার, ব্লেড, ডাট-ভাঙা কাপ-এ পানি। রেজার-এ ব্লেড ভরার আগে ব্লেডের ধার পরীক্ষা করছে তার হাত। নিটোল শাণিত ব্লেড, দীর্ঘ কোমল সুদর্শন আঙুলগুচ্ছ। ফাট-ধরা আয়নায় একটি মুখের ছবি : চোখের তলায় কালি, স্বপ্নবিদ্ধ চোখ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি। আয়নায় যুবকের আননখানি দ্বিখণ্ডিত হয়ে আছে।

৭। ফুটপাতের উপর কোমল আমমুকুল ঝরে আছে। আমমুকুলের ঘ্রাণের সঙ্গে পেট্রোলের গন্ধ মিশে আছে।

৮। কতদিন পরে বেরোচ্ছি? ভুলে গেছি। কতদিন আমার বিষাদসঙ্গীকে ছেড়ে অনেক দিন বেরোচ্ছি বাইরে। ফাল্গুন ছোট্ট চঞ্চল দুষ্টু মেয়ের মত, ঢুকে পড়েছে আমার রুদ্ধ ঘরের ভিতর, রুদ্ধ মনের ভিতর। একঝলক খুশিরও হাওয়া লাগিয়ে দিয়েছি ভিতরটাতে। কি খুশি! বিদেশি খুশির স্বাদ পেলুম অনেকদিন পরে।

৯। যুবকটিকে দেখা গেল ওয়ার্ডরোব-এর সাঁটা আয়নার সুমুখে চমৎকার ফিনফিনে পাঞ্জাবি পরছে।

১০। পুকুরের স্বচ্ছ নীল আয়নায় ফাল্গুনী নিসর্গ ছায়া মেলে আছে।

১১। যুবকটি চুল আঁচড়াচ্ছে—বারেবারে—মনের মতো করে—একবার আঁচড়ানো হয়ে গেলে এলোমেলো করে ফ্যালে—

১২। পুকুরের জলে বাতাস ক্রমাগত ঢেউ তুলছে—জলশরীরে ক্রমিক কুঞ্চন—বাতাসের ভাষা—জলের উপর দিয়ে জলপোকাদের অবিশ্রাম চলাফেরা—

১৩। মুখের খুশির আভা, সুন্দর উড্ডীন চুল, ফিনফিনে পাঞ্জাবি—যুবকটিকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল পথে। গেট-এর কাছে আমমুকুলের সোনালি-হলুদ পরিপূর্ণ একটি মঞ্জুরী রঙিন বাল্বের মতো জ্বলছে। বাতাস তাকে সংবর্ধনা করলে মুখের উপর আদরের আঙুলে বুলিয়ে, পথপাশের গাছগুলি ডালপালার বাহুতে হিল্লোল তুলে স্বাগত জানালে, একটি হিরণ রৌদ্ররেখা এসে তার মাথায় ক্ষণিক মুকুট পরিয়ে দিলে, একমুঠো রঙিন ধুলো উড়ল।

১৪। অনেকদিন পরে আজ মানুষকে ভালোবাসতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে।

১৫। পুকুরের পানির ভিতরে ছিপ ফেলে বসে আছে একজন লোক, ছিপ টেনে তুলতে দেখা গেল কারুকাজ-করা এক সিন্দুক। দুজন তরুণ তরুণীকে নিয়ে বানানো দ্বীপের দিকে যেতে-যেতে একটি নৌকো গিয়ে ঠেকলো চাঁদের শরীরে। একটি মাছরাঙা মাছ মনে করে আছে। মেরে জল থেকে তুলে নিয়ে গেল একটি সোনার টুকরো। প্রতিফলিত পানির ভিতরকার বাড়ির ভিতর দুজন ঘর বেঁধেছে।

১৬। যুবকটির পাশ দিয়ে রিকশা-গাড়ি-লোকজন চলে যাচ্ছে, যেন আনন্দ যাপন করতে বেরিয়ে পড়েছে সবাই। সকলের মন যেন রৌদ্র-হাওয়ায়-নীলিমায় ভরা। যেন পৃথিবীতে কোথাও দুঃখ নেই, ক্ষোভ নেই, চিন্তা নেই, হিংসা নেই। অফিস থেকে লোকজন বেরিয়েছে, হেঁটে গাড়িতে-বাসে-রাস্তার বাড়ির দিকে চলেছে, কিন্তু কেরানির হাতে কালি লেগে নেই আজ, টাইপিস্টের মাথার ভিতরে ক্রমাগত এক একটি অক্ষরের মুদ্রণের খটাখট শব্দ হচ্ছে না। প্রতিটি মুখে খুশির ছবি সুখের ছবি। বাজার-দর হট-হট করে বেড়ে চলেছে, যেন এতে কারো কোনো এসে যায় না, যেন সেকথা তিলতম মনে নেই কারো। প্রতিটি মনে শান্তিকল্যাণ, প্রতিটি মুখে আনন্দসুন্দর।

১৭। আমমুকুলের গন্ধ এসে নাকে লাগল। ফ্যানশা ভাতের গন্ধ এসে লাগল চেতনায়। বাসি-ভাত লেবু দিয়ে মেখে খায়। একটি ছেলে—পুকুরঘাটের রানায় বসল ক্ষণিক—বিরাট বাদাম-গাছ বিরাট বাদাম-পাতা এসে পড়েছে—সজনে ফুলের রেণুর ঝরন—উঠে পড়ল সে—খালপাড়ে গেল—নৌকো বাঁধা আছে, গোলপাতা নিয়ে নৌকো যাচ্ছে ঝোপঝাড়-ভরা খালের উপর ঝুঁকে-থাকা গাছের তলা দিয়ে—গাঁ থেকে বাঁকে করে দুধ নিয়ে আসছে—ওখানে ঘরের ভিতর শব্দ তুলে বৃত্তাকারে ঘুরে যাচ্ছে চোখ-বাঁধা বলদ, তেল ক্ষরিত হচ্ছে একটি ময়লা টিনে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে আরো দু তিনটি ছেলের সঙ্গে। পেট্রোলের গন্ধ এসে লাগল

নাকে। রাজধানীর ফুটপাত দিয়ে হেঁটে চলেছে যুবকটি কোনো এক ফাল্গুনের বিকেলের পথ ধরে।

১৮। প্রত্যেকটি মানুষের মুখ আলাদাভাবে পড়ে যাচ্ছে সে, আজ আর মনে হচ্ছে না জনতা এরা, আজ এরা প্রত্যেকটি মানুষ এক একটি ব্যক্তিতে পরিণত, প্রত্যেকের আলাদা সুখ-দুঃখ, আলাদা আনন্দ-বেদনা, আলাদা রুচি-অরুচি।

১৯। একটি লাল দমকল-গাড়ি চলে যায় ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে যেন এই ফাল্গুনী বিকেলের আনন্দধ্বনি শহরময় বাজিয়ে দিচ্ছে সে। মানুষজনের ভিতরে নীল লাল আগুন জ্বলছে।

২০। একটি নগ্ন ডালপালাময় পলাশগাছ রাস্তার মাঝখানকার আইল্যান্ডে দাঁড়িয়ে। তার শিরা-উপশিরাময় দিবারাত্রি রণন চলছে ফাল্গুনের, প্রস্তুতির, অরক্তিম আসন্নতার।

২১। রাশিরাশি ঝরা পাতা পড়ে আছে কালো পিচ-পথে—শাদা ফুটপাতে।

২২। যুবকটি এসে দাঁড়াতে শাহবাগের মৃত ফোয়ারা থেকে হঠাৎ শতধারে পানির রজতধারা উচ্ছ্রিত হতে থাকে।

২৩ বেলা পড়ে আসছে, রোদের রঙ পেঁয়াজি-সোনালি হয়ে উঠছে—সেই স্বচ্ছ রোদের ভিতর একটিও পোকার অবলেশ নেই। তার ভিতর উড়ছে ঝরা পাতা, ছেঁড়া কাগজ, ভাঙা চাঁদ।

২৪। যুবকটি অগ্রসর হয়ে যেতে থাকে—তার পায়ের নিচে শহর, ফুটপাতে, ঝরাপাতা, ভাঙা চাঁদ, ছেঁড়া কাগজ, টুকরো অতীত, বাদামের খোলা।

২৫। হঠাৎ একটি ধুলোর ঘূর্ণি উঠল। ঘূর্ণিহাওয়া একটি বুড়ো মানুষের হাত থেকে কালো ছাতা কেড়ে নিয়ে দশহাত উঁচুতে উঠিয়ে দিলে, যে-কালো ছাতাকে ঘিরে চক্কর দিয়ে গেল ঝরা পাতা আর ছেঁড়া কাগজ। হেসে ফেলল বুড়ো লোকটি। দূরের কাছের অনেকগুলি কালো চোখে আশ্চর্যতা আর আকস্মিক মজা-পাওয়ার চকচকে সোনালি বল ড্রপ খেয়ে চলে যায়। আকস্মিক আশ্চর্য ব্যাপারটি চোখে পড়েনি যেসব ছড়ানো-ছিটোনো পথচারীদের তারাও জিগেস করে জেনে নিয়ে কিংবা শুধু শুধুই হাসছে সবার দেখাদেখি!

২৬। যুবকটি হেসে এগিয়ে যায়। একটি চার-চাকার গাড়ির কাছে গিয়ে থামে। একমুঠো বাদাম কেনে। আশ্চর্য আনন্দ পায়। কতদিন এমন লঘু হর্ষে এমন দ্বিধাহীনভাবে এমন ছেলেমানুষের মতো বাদাম কেনেনি। শক্ত খোসা ভেঙে ভিতরের শক্ত কোমল বাদাম মুখে পুরে দ্যায়।

২৭। বায়তুল মোকাররমের সুমুখের বিশাল খোলা বাঁধানো চাতাল। একজন ক্যানভাসার বক্তৃতা দিয়ে চলেছে তার ওষুধের, তাকে ঘিরে বেশ বড়সড়ো একটি বৃত্ত। সেই বৃত্তের একপাশে এসে দাঁড়াল যুবকটি।

২৮। একটি বাস একেবারে রাস্তার সঙ্গে লেগে ঘেঁষতে বেঁকে চলে যায়। তার একতলা-দোতলার প্রত্যেকটি জানালায় এক-একটি সহাস্য মুখ বসানো, সিঁড়ির উপর দরোজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে যারা তাদের মুখে আলো-হাসি। বাসটি রাস্তার

সঙ্গে এমন ঘেঁষটে যায় যে রাস্তার সঙ্গে লেগে সুন্দর আগুনের ফুলকি জ্বলে-জ্বলে উঠতে থাকে—জ্বলে নিবে যায় শব্দহীন।

২৯। ফুটপাতে পিঁপড়ের মতো লোকজন—কেবলি এদিক-ওদিক চলছে—যেন। সবাই খামোকাই এদিক-ওদিক ঘুরে ফিরছে—যেন কারো কোথাও যাবার নেই—কারো কোনো কাজ নেই—জীবনযাত্রার অমল হর্ষেই, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার নির্মল আনন্দ পান করার জন্যেই ক্রমাগত যাতায়াত করছে—

৩০। কালো একটি ছাতার ভিতরে অগুন্তি রঙিন রুমাল উড্ডীন :

৩১। একটি কিশোর ছেলে লাফিয়ে নামল চরে শাদা, নতুন, নরম মাটিতে। চরের ভিতর চমৎকার একটি ঝিল, ঝিলের পাশে পাশে সবুজ মাঠ এক হাজার পাখি বসে আছে—উড়ছে—উড়ে উড়ে বসছে।

৩২। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে দেখে এগিয়ে যাচ্ছে যুবকটি—রাশি রাশি বোতাম, অসংখ্য তালা, প্লাস্টিকের গেলাশ পেয়ালা লবণদানির রাশি, স্যান্ডেলের স্তূপ, একশো লাল-নীল-সবুজ ফিতে, একশো রুমাল, একজন ভিখিরি, একটি ছোট শাদা ওজন-মাপা যন্ত্র, ধাবমান হরিণের মতো অসংখ্য পা, টিনের পাতের ওজন-মাপা যন্ত্র, ধাবমান হরিণের মতো অসংখ্য পা, টিনের পাতের উপর পাঞ্জার ছাপ, ভিড়ের ভিতরে একটি মেয়ে, কলাআলা, একশো হাজার, হঠাৎ একজন ছুরির মতো একটি কলম বের করে দ্যায় : কলম লাগবে স্যার, পার্কার, একশো গেঞ্জি ও অন্যান্য অন্তর্বাস, একশো তোয়ালে, চশমা-ঘড়ি-কলমের ছোট কাঁচি-আর-কাঠের চৌকো বাকশো, নতুন বাংলা পঞ্জিকা ও ক্যালেন্ডার, পেপারব্যাক গ্রন্থরাজির মেলা, চকচকে ম্যাগাজিনগুচ্ছ—ফুটপাত ধরে ভিড় ঠেলে ঠেলে এগিয়ে যায় যুবক।

৩৩। যুবক গুলিস্তান সিনেমার উল্টোদিকের রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে ভিড় এড়িয়ে, বিকেলের বাতাসে তার পাৎলা পাঞ্জাবি ওড়ে, চুলের গুচ্ছ ওড়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কালো কামান দ্যাখে, চলিষ্ণু সিনেমার বিজ্ঞাপন দ্যাখে, দূর থেকে পোস্টার পড়বার চেষ্টা করে খেলাচ্ছলে, ওপাশের বিশাল হোর্ডিঙে খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রীর পটল-চেরা চোখের সুহাস্য মুখাবয়ব, সুরেখী শরীরিণী নর্তকী, চৌমাথায় যানের যাতায়াত ও ক্রেংকার দ্যাখে শোনে, দ্যাখে পথচলতি যাত্রীদের।

৩৪। সূর্য কখন অস্তে চলে গেছে—তবু চতুর্দিকে শাদা আলোর আভা বিকীর্ণ হয়ে যায়। তারই মধ্যে আলো জ্বলে উঠেছে রাস্তার, দোকানশ্রেণীর, গুলিস্তান-শব্দটির লাল জ্বলমান, নিয়ন-লাইট জ্বলছে নিভছে বিজ্ঞাপনের বাতাস আরো স্বচ্ছ আরো ফুরফুরে হয়ে প্রায় হরিণের মতো লঘু হয়ে উঠেছে।

৩৫। যুবকটি ভিতরে পথ করে করে ফুটপাত ধরে ফিরে চলেছে আবার। আহ! ভিড় ভালো মানুষের সকল ভালো আত্মার মুক্তি ভালো।

৩৬। কখন আস্তে আস্তে নীলাভা ছড়াতে শুরু করেছে সন্ধ্যার শাদার সঙ্গে মিশেছে নীলের আভা, আকাশের হালকা-নীল ক্রমশ গভীর-নীল হতে শুরু করেছে, আকাশে একটি-দুটি ঝকমকে সোনালি তারা উঠেছে, আর আশ্চর্য, সন্ধ্যা হতে না-হতে পরিপূর্ণ চাঁদ উঠে এসেছে প্রায় এই শহরের জন্যেই, যেন শুধু এই সন্ধ্যার জন্যেই।

৩৭। জুতোপালিশ কি ডাকছে তাকে? ঘাড় ঘোরাতে গিয়ে একজন তার নরম পাঞ্জাবির কোণ চেপে ধরল কঠিন হাতে। অন্য একজন। আর একজন।

আরো দু তিনজন এসে পিছনে দাঁড়াল।

কামানো নীলচে-ফরশা গালের উপর পাঁচটি গাঢ়-নীল দাগ পড়ল।

—কি? কি হয়েছে! প্রথমে বিস্ময়।

—শা-লা!

—কি হয়েছে আমার গায়ে হাত তুলছেন কেন? বিস্ময় কেটে যায়।

—বা-ন-চো-ত।

—কি হয়েছে বলবেন—এক-একটি ঘুষি কথা সম্পূর্ণ করতে দিচ্ছে না। খবরদার—একটু কি পিছিয়ে গেল ভিড়? হাত ওঠার আগেই তার পাঞ্জাবি ফেঁশে গেল পুরোনো ন্যাকড়ার মতো, তার গেঞ্জি একজনের মুঠোর ভিতর গুটিয়ে গিয়ে হ্যাঁচকা টানে তার শরীর থেকে অতি মোলায়েমভাবে অর্ধেকটা বেরিয়ে এল একজনের মুঠির ভিতর কানের পাতা চিরে গেছে, নাকের উপর ঘুষি এসে পড়ায় নাক থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে, স্যান্ডেলের এক-পাটি ছুটে গিয়ে পড়ল কোথায়। শালা! বাঞ্চোত! রঙবাজির জায়গা পাও নাই? পেরিয়ে কাতর উচ্চারণ অর্ধেক স্ফুট হতে লাগল—ভাই! ভা-ই মারবেন না আমাকে... ভা-ই আগে বলুন কি...আগে... দেখুন....আমি...জানি না...ও-হ আল্লা—! কেননা দ্রাম করে একটি ঘুষি ফেটে পড়ল মেরু দণ্ডের উপর, মেরুদণ্ডের ভিতরে বজ্রপাতের শব্দ, স্বপ্নের ভিতরে বিস্ফোরণ, চোখের নিচে চোয়ালের উপর একটি আতীব্র ঘুষি এসে পড়ল, আহ...আম্মা...মা...

৩৮। ফুটপাতের উপরে একটি ম্যানহোলের ব্যাদান লোভী কুকুরের মতো তাকিয়ে আছে।

৩৯। আমি কোথায়?

৪০। দাঁড়ানো অবস্থা নেই—কখন এক-সময় বসে পড়েছে—'পথের উপর বসে পড়ছি আমি' তখনো এই বোধ। আর তখন মাথা লক্ষ্য করে কয়েকটি ঘুষি। 'মা-র-বে-ন না ভা-ই।'—কি হ-য়ে-ছে?' তার কণ্ঠ থেকে নগ্ন, আত্মার ভিতর থেকে উচ্চারিত হলো যেন, কিংবা সমবেত দর্শকশ্রোতার মধ্য থেকে এই অস্ফুট গুঞ্জন উঠে যেন বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে গেল। পরমুহূর্তে মাথা বাঁচাবার অজ্ঞান চেষ্টায় যুবকটি শুয়ে পড়তে যেতেই কয়েকজন তাকে প্রায় আদর করার মতো আলগোছে ধরে বসিয়ে দ্যায়।

৪১ কোথাও কি অপরাধ জমা হয়ে আছে? আমি কি কোনো অপরাধ করেছি? অন্য-কারো অপরাধ কি আমার উপর এসে পড়েছে?

৪২। কাছাকাছি কয়েকটি দোকান সশব্দে বন্ধ হতে লাগল, দোকানিরা এক-পলক ভিড়ের ভিতরে থেকে দেখার চেষ্টা করে আপনাপন বাড়ির দিকে চাবি বাজিয়ে রওয়ানা দিলে, মুহূর্তের মধ্যে এদিকের সব দোকানপাট ছুটির দিনের চেহারা ধারণ করলে।

৪৩। এখন তাকে বসিয়ে রেখে বুক-পিঠের উপর পর-পর মুষ্টাঘাত এসে পড়ছে। মায়ের ছবি উজ্জ্বলতায় জ্বলে উঠে মুছে গেল—মিলিয়ে গেল আবছা আব্বার মুখ—ভাইবোন দ্রুত ভিড় করে এসে মুছে গেল—যে-মেয়েটিকে ভালোবেসেছিল কিশোরবেলা, সে এসে দাঁড়াল না মনের ভিতর—সাধের বইপত্র পড়ে রইল দূরে—ফিরে এল মায়ের ছবি। ঠোঁটের উপর লাল একটি বিশাল বুদ্বুদ তৈরি হলো এক মুহূর্তের জন্যে। সেই বুদ্বুদে জনতার কোনো ছায়া পড়ে না, পরমুহূর্তে বুদ্বুদটি নিশ্চিহ্ন হয়ে ঠোঁটের কষ বেয়ে দু'ফোটা রক্ত ঝরে পড়ল। চোখের এক-পাশ ফুলে উঠল, ঘাড়ের কাছে মট করে ভেঙে গেল নাকি—হাড়। তারপর গোল হয়ে ঘিরে থাকা লোকজনের দিকে অর্থহীন চোখে তকিয়ে রইল ফুটপাতের পাশে নর্দমায়। তৃপ্তিদায়ী ঠাণ্ডা কাদাজলের ভিতরে মাথা ধোয়।

৪৪। শাদা ট্রাফিক-পুলিশ, ট্র্যাফিক-আইল্যান্ড থেকে নেমে বুটের খটখট শব্দ, তুলে এগিয়ে আসছে, তার মাথায় শাদা হ্যাটের উপর ফাল্গুনের একটি সবুজ পাতা লেগে আছে প্রজাপতির মতো। ভিড় পাতলা হতে শুরু করেছে। সরে যাচ্ছে একটি-দুটি করে লোকজন।

৪৫। ডিআইটি বিল্ডিংয়ের আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল চাঁদ! এখন ডিআইটি বিল্ডিঙের শীর্ষে মৃত-রঙের আকাশে উঠে এসেছে গোল পরিপূর্ণ চাঁদ। ফাল্গুনের আশ্চর্য সুন্দর সন্ধ্যা এখন। এক-তিল অন্ধকার নেই কোথাও। সূর্য দিয়ে গেছে দিনটাকে। পথে পথে ছুটে চলেছে ফাল্গুনের লঘু হরিণের মতো বাতাস ময়দানের উপর দিয়ে প্রবহমান, পথে পথে পাতা উড়ছে, পাতা চলছে, পাতা ঘুরছে, বাতাস বেজে চলেছে একটা লঘু শিকলের মতো ॥

[১৯৭৩]

জ্যোৎস্নায় ভূত

হ্যাঁ আমি, আমিই আপাকে খুন করেছি। বলছি সব। শোনেন।

দোকান থেকে সেদিন ছুটি নিয়েছিলাম। মালিক জানতেন আমাকে। আমার মতো বিশ্বাসী লোক পাওয়া মুশকিল বলেই মালিক নূরুল ইসলাম আমাকে একটু খাতিরই করতেন। হঠাৎ হঠাৎ ছুটি চাইলে না করতেন না। তো মালিকের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে আমি ইসলামপুর থেকে গেলাম সদরঘাটে। দিলুর কাছে। দিলুর আসল নাম জিল্লুর রহমান। কি করে যেন দিলু হয়ে যায়। আমরা ঐ নামেই ওকে ডাকতাম। পুরোনো বইপত্র বেচত। ইয়াং ছোকরা। ঠেকা-বেঠেকায় আমি ওকে টাকাপয়সা দিতাম। মানত খুব আমাকে। ওর বাপ-মা ঢাকাতেই কোনো বস্তিতে থাকত ছেলেমেয়ে নিয়ে। ও থাকত আলাদা। শস্তা একটা মেসে। সেই মেস আমি আপনাদের চিনিয়ে দিয়েছি।

তো সেদিন মালিকের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে আমি প্রথমে যাই দিলুর কাছে। সদরঘাটে।

দিলুকে বললাম—চল আমার লগে। এক জায়গায় যামু।

তখন সাড়ে দশটা বাজে মাত্র। দিলু তখনই দোকান খুলেছে। বলল—ইদ্রিস ভাই, অখনই তো দোকান খুললাম।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম—প্যাঁচাল পাড়িস না। জরুরি কাম আছে। বইপত্তর গুটাইয়া ফ্যাল।

দিলু আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আমার কথার গুরুত্ব বুঝল। দিলু ছিল আমার বংশবদ। আমি বললে এমন কোনো কাজ নেই, যা সে করতে পারত না। বাকশের মধ্যে বইপত্র তুলে ফেলে তালা লাগাল দিলু। পাশে বুড়ো বই-বিক্রেতাটাকে চাচা বলে ডাকত। বলল চাচা, আমি একটু ঘুইরা আইতাছি।—বলে আমার সঙ্গে চলে এল। আমরা সদরঘাটের একটা হোটেলে ঢুকে চা-সিঙ্গাড়া খেলাম। তারপর বাসে উঠে মৌচাকে নেমে মগবাজার হেঁটে যাই।

মৌচাক থেকে মগবাজারের দিকে হেঁটে যাবার সময় দিলুকে বললাম—একটা মাইয়ামানুষ আমারে বহুতদিন জ্বালাইছে। আজ টাইট দিমু। তুই শুধু একটা কাজ করবি। কাজের বুয়াটারে ম্যানেজ করবি। দরকার হইলে...। বুঝলি?

দিলু একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল।

আমি বলেছিলাম—পারবি তো?

হেঁটে যেতে যেতে দিলু শুধু তাচ্ছিল্যভরে বলেছিল—কি কন!

বলেছি তো, আমার জন্য দিলু পারত না এমন কোনো কাজ নেই।

হ্যাঁ, মগবাজারে নাজমা আপার চারতলা ফ্ল্যাটে মাঝে মাঝে যেতাম।

নাজমা আপার সঙ্গে পরিচয় হলো কিভাবে?

সে কী আজকের কথা।

মেঘনা নদী যখন আমাদের শেষ ঘরটাও গ্রাস করল, তখন আমি ঢাকায় এসেছিলাম। একেবারেই ছেলেমানুষ তখন। ঢাকায় এসে অনেক খুঁজে পেতে আমাদের চাঁদপুরের এক ভদ্রলোকের কাছে গিয়েছিলাম। উনি আর ওয়ালি আশরাফ শাহেব—নাজমা আপার আব্বা—এক অফিসে চাকরি করতেন। চাঁদপুরের সেই ভদ্রলোকই আমাকে আশরাফ শাহেবের বাড়িতে কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ওয়ালি আশরাফ শাহেব সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর দেশে চলে গিয়েছিলেন। খুলনায়। ওনার ঐ একই মেয়ে। নাজমা। আর তিন ছেলে। ছেলেরা প্রতিষ্ঠিত। বড় ছেলে ডাক্তার। সৌদি আরবে আছে। অন্য দুই ছেলে ঢাকায়। নাজমা আপার বাসাতেই তার ছোট ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল একবার। ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ওনার স্ত্রী বেঁচে আছেন। ঐ ছোট ছেলের কাছে আছেন। খুলনার বাড়ি-ঘর বেচে দিয়েছেন বলে শুনেছি।

আশরাফ শাহেবের বাড়িতেই আমি থেকেছি বছরের পর বছর। ওখানেই বালক থেকে বড় হয়েছি। আমার সামনেই আশরাফ শাহেবের ছেলেরা মানুষ হয়েছে। মেয়ের বিয়ে হয়েছে। ওদের বাড়িতে আমি ছিলাম অনেক দিন। গায়ে-গতরেও বেড়ে উঠলাম। বাড়ির চাকরের মাইনে আর ক'টা টাকা। আমারও পোষাচ্ছিল না। ওদেরও। তখন আমি একটা দোকানে চাকরি নিই। তারপর ইসলামপুরের ঐ দোকানে। বিশ্বাসী লোক বলে আমার সুনাম ছিল সব জায়গায়। আমার কোনোদিন কোনো অসুবিধা হয়নি। আমার মনিব বা মালিকরাও আমাকে খাতির করতেন।

ঢাকায় আশরাফ শাহেবের যদ্দিন ছিলেন, মাঝে মাঝে যেতাম তারপর। নাজমা আপার বাড়িতেও যেতাম। এমনও হয়েছে আশরাফ শাহেবের বাড়িতে গিয়েছিলাম। আশরাফ শাহেবের স্ত্রী—আমি তাঁকে খালাম্মা বলতাম—তিনি আমাকে দেখে বলে উঠেছেন—ও। এই তো ইদ্রিস এসে গেছে। বাহ, খুব ভালো হয়েছে। ইদ্রিস বাবা, তুমি একটু চা-টা খেয়ে এই টিফিন-ক্যারিয়ারটা একটু কষ্ট করে দিয়ে এস মিনুর বাড়িতে। আমি নিতে না-চাইলেও রিকশা ভাড়া দিয়ে দিতেন। আমি টিফিন-ক্যারিয়ার ভরতি খাবার-দাবার নিয়ে নাজমা আপার বাড়িতে দিয়ে এসেছি। যাদের দৌলতে ঢাকা শহরে জায়গা পেয়েছি, তাদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে পারিনি। বরং তাদের জন্যে কিছু কাজ করে তারি তৃপ্তিবোধ করতাম।

সরাসরি কি নাজমা আপর বাসায় যেতাম না? যেতাম। যখনই যেতাম, নাজমা আপা কখনোই খালি মুখে আসতে দিতেন না। সব সময় বলতেন—আসিস আবার।

কয়েক বছর হলো নাজমা আপারা মগবাজারে এই ফ্ল্যাটে চলে এসেছেন। দুলাভাই, লতিফ শাহেব, খুব ভালো মানুষ। ইঞ্জিনিয়ার। অসম্ভব ব্যস্ত। নিজস্ব ব্যবসাও আছে। আপার কাছেই শুনেছি। সকাল-বিকাল যখনই গেছি, দুলাভাইয়ের সঙ্গে দেখা হতোই না বলতে গেলে।

দেখতে দেখতে অনেক বছরই হয়ে গেছে। নাজমা আপার দুই ছেলে হয়েছে। ছেলেরা স্কুলে যাতায়াতও শুরু করেছে। নাজমা আপাও এখন আর তরুণী নেই। মুটিয়ে গেছেন। দেখেও এখন মনে হয় গিন্নিবান্নি আমি নিজেও বিয়ে করেছি। আমার একটা ছেলে আছে। আমরা নাজমা আপার ফ্ল্যাটে মাঝে মাঝে যাওয়ার জন্যে দারোয়ানও আমাদের পরিচিত। চারতলা বিল্ডিঙের সামনে দারোয়ান বসে থাকে একটা টুলে। বাড়ির সামনে একটু চাতাল। মাঝে মাঝে ওখানে পায়চারি করে।

সেদিনও আমাকে দেখে দারোয়ান হাসল।

বললাম—দারোয়ান ভাই, ভালো আছেন তো?

—হ্যাঁ। হাসল দারোয়ান। একটু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল দিলুর দিকে।

বললাম—এর একটা চাকরি দরকার। আপার কাছে নিয়ে আসলাম তাই।

—যান। দারোয়ান বলে।

বেল্ বাজাতে নাজমা আপাই দরোজা খুলে দিলেন। বললেন—আরে, ইদ্রিস যে আয়। এ কে?

—আপা, এর জন্যই আজ আসছি। ওর একটা চাকরি দিতে হইব। আপনে রাখেন যদি খুব ভালো হয়—

—ঠিক আছে। আয়, ভেতরে আয়। বোস তো আগে। আপা বললেন।

আমি ড্রয়িং রুমে সোফাতেই এক কোনায় জড়োসড়ো হয়ে বসলাম। দিলু দাঁড়িয়েই ছিল। আপা বসতে বলায় এদিক ওদিক চেয়ে একটা মোড়া টেনে বসল।

নাজমা আপা গলা উঁচু করে বললেন —জোহরা, এখানে দুই কাপ চা আর বিস্কুট দিয়ে যাও।

বললাম—আপা, বাচ্চারা কই?

—ওরা স্কুলে গেছে। দুটোর সময় ছুটি হবে। আমি গিয়ে নিয়ে আসব। নাজমা আপা বললেন।

—বাহ! আম বললাম—বনি-রনি তাহলে বড় হয়ে যাচ্ছে—

নাজমা আপা হাসলেন—ছোটটা যা দুষ্টু হয়েছে না? স্কুলে যেতে যেতে এখন একটু দুষ্টুমি কমেছে। কিন্তু মাথা খুব—

আমি হাসছিলাম। দিলু হাসছিল।

কথা তো বলতে হয় কিছু। দুলাভাই এ সময় থাকবেন না জেনেই তো আমার যাওয়া।

বললাম—দুলাভাই তো অফিসে বোধহয়।

নাজমা আপা বললেন—হ্যাঁ, চাকরি ছেড়ে দিয়েছে তো। এখন নিজের কোম্পানিতে নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। আগে তো দুপুরে আসত। এখন তাও

না। সকালবেলা বেরোয়, ফেরে মাঝরাতে। এর মধ্যে তোর দুলাভাই তো গাড়ি কিনেছে রে!

—বাহ! দুলাভাই তাহলে গাড়ি কিনে ফেলেছে। আপনার তাহলে গাড়ি হলো, আপা। হাসিমুখে বললাম আমি।

—গাড়ি হয়েছে। কিন্তু গাড়ি চড়ার সময় কোথায়। তোর দুলাভাই সময় পেলে তো? আপা বললেন।—তবে গাড়ি হয়েছে, ভালো হয়েছে। বনি-রনিকে একটা ভালো স্কুলে দেয়া যাবে সামনে বছর—

আমি বললাম—হ্যাঁ, গাড়ি যখন আছে, ওদের স্কুলে আনা নেয়া করতে পারবে—

এই সময় জোহরা চা-বিস্কুট দিয়ে গেল।

আমি দিলু সম্পর্কে আবার বললাম—আপা, ওর যদি একটা চাকরি হতো—আপনার এখানে হলে সবচেয়ে ভালো হয়—

—না। আমার দরকার নেই। তোমরা বোসো। আমার ননদ সেদিন বলছিল তার একটা কাজের লোক দরকার। আমি দেখি একটু ফোন করে। তোরা চা খা ততক্ষণে। বলে আপা ভেতরে ফোন করতে গেলেন।

আমি আর দিলু নিঃশব্দে চা-বিস্কুট খেলাম। চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে দেখি, দিলু আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি চোখ ঘুরিয়ে ওকে দেখালাম রান্নাঘরের দিকে।

নাজমা আপা এই সময়ই শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন—ইদ্রিস, আমার ননদ বলল ওর একেবারেই ছোট একটা ছেলে বা মেয়ে দরকার। এ আবার একটু বড় কিনা। তবে আমি দেখছি। কিছুদিন পরই তুই আসিস বা ফোন করিস।

তারপর নাজমা আপা বললেন—আজ খুব খটখটে রোদ উঠেছে। জোহরা, আচারের বোয়েমগুলো বের করে দে তো! ইদ্রিস, তুই একটু ওকে নিয়ে ছাদে গিয়ে আচারের বোয়েমগুলো রোদে দিয়ে আয়। বলে ভেতর থেকে ছাদের চাবি এনে দিলেন।

নিয়তি। এখন ভাবি, নিয়তি। সমস্ত ঘটনাই যেন এখন মনে হয় আগে থেকে সাজানো। আমার কোনো উপায় ছিল না। নাজমা আপারও কোনো উপায় ছিল না। নিয়তিই নাজমা আপাকে খুন করেছে। নিয়তিই আমাকে খুনী বানিয়েছে। দিলুকে আমি আগে থেকে তেমন কিছুই বলি নাই। বলেছিলাম শুধু, দরকার হলে ওকে ঐ বাড়িতে চাকরের কাজ করতে হবে কিছুদিন—আর যদি খুব দরকার হয় তাহলে জোহরাকে শেষ করে দিতে হবে। ছাদে গিয়ে আচারের বোয়েমগুলো সাজাতে সাজাতে শুধু রুদ্ধশ্বাসে বলেছিলাম—আজই।

—আজই? দিলু আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। আমি আর কোনো কথা বলিনি।

নিচে এসে আবার সোফায় বসলাম। দিলু বসল মোড়ায়। সেদিনকার খবরের কাগজটা সামনেই ছিল। খবরের কাগজ পড়ার অভ্যেস নেই আমার। কিন্তু বাংলা

তো পড়তে পারি। কাগজটা টেনে নিলাম। কাগজ পড়ছিলাম, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

রান্নাঘর থেকে নাজমা আপা এসে বললেন—ইদ্রিস, এসেই যখন পড়েছিস একটু বসে যা। আমি চট করে গোসলটা করে আসি। দেরি হবে না।

তারপর বললেন—এই মেয়েলোকটা এ্যাদ্দিন আছে আমার কাছে। কিন্তু ওর হাত-চোট্টা স্বভাবটা গেল না। চোখে চোখের রাখতে হয়।

তারপর বললেন—তোদের মতো বিশ্বাসী লোক আজকাল আর পাওয়া যায় না। কী বলব আমি আর।—হাসলাম। ওটাই ছিল নাজমা আপার শেষ কথা। নাজমা আপা শোবার ঘর ভেজিয়ে রেখে শোবার ঘরের সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকে গেলেন। না, আমি দেখিনি। কেননা শোবার ঘরের দরোজা তো ভেজানো ছিল। কিন্তু স্পষ্ট শব্দ শুনলাম। বাথরুমের দরোজা বন্ধ করার শব্দ।

বাথরুমের দরোজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা মাত্র আমি সোফা ছেড়ে উঠলাম। দিলুকে ইঙ্গিত করলাম। রান্নঘরে যাওয়ার জন্য দিলুকে চকিতে উঠে গেল।

দিলু উঠে গিয়ে রান্নাঘরের দরোজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল কিছুক্ষণ। তারপর আবার এসে বসে মোড়ায়। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে।

তখনি আমি উঠে যাই। ভেজানো শোবার ঘরের দরোজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে যাবার আগে পকেট থেকে ছুরিটা বন্ধ বের করে দিলুকে একবার দেখিয়ে হাত উঁচু করে বুড়ো আঙুলের ইঙ্গিত করি ওকে রান্নাঘরে যেতে। শোবার ঘরের ভেতরে ঢুকে দরোজাটি ভেজিয়েই দিই আবার। ছুরি হাতে বাথরুমের দরোজায় দাঁড়িয়ে থাকি। ভেতরে ঝরঝর করে কল থেকে পানি ঝরে পড়ছিল। ঝরঝর বন্ধ হওয়ার পরেই বুঝলাম, এইবার গা মোছা হওয়ার পরেই কাপড় পরা চলছে—এখনি দরোজা খুলবে। ছুরি হাতে আমি প্রস্তুত। খুট করে বাথরুমের দরোজা খুলে যেতেই আমি ভেতরে ঢুকে মুখ চেপে ধরলাম। নাজমা আপা তখন তো রীতিমতো মোটাসোটা এক মহিলা—মেয়েমানুষ। কিন্তু যেন তুলোর বলের মতো গড়িয়ে পড়লেন মেঝেয়। কি করে যে বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। কলটা খুলে দিলাম। ঝরঝর করে পানি ঝরে পড়তে লাগল। ঝকঝকে চওড়া বাথরুমের মেজেতে ফরশা নাজমা আপা উলঙ্গ হয়ে পড়ে থাকল। আমি তার মুখ চেপে ধরে আছি একহাতে, অন্যহাতে উদ্যত ছুরি তাঁর মুখের সামনে। আমার বহুকালের উত্তেজনা—অথচ আমি বিবাহিত পুরুষ—বহুকালের উত্তেজনা প্রশমিত হতে কিন্তু কয়েক মিনিটও লাগল না। তবু সময়ের হিসাব আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আমার উত্তেজনা প্রশমিত হতে-না-হতে ছুরিটা আমূল বিদ্ধ হলো নাজমা আপার শরীরে।

প্যান্টের বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে যখন বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসছি, তখনই আঁৎকে উঠলাম। 'আপা' বলে শোবার ঘরের দরোজা ঠেলে ভেতরে ঢুকছে জোহরা। তখনই দেখলাম, জোহরার পেছন থেকে দিলু তার মুখ চেপে ধরে জাপটে ধরে ঘাড়ে প্রাণপণ কামড়ে ধরেছে। আমার হাতের রক্তাক্ত ছুরিও জোহরার ঠিকই নজরে পড়েছিল। আর একটু হলেই সে পরিত্রাহি চীৎকার করে উঠত। আর আমরা বিপদে পড়তে পারতাম। তার চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছিল।

জোহরা জ্ঞান হারিয়ে মেঝেয় পড়ে গিয়েছিল। আমরা ভেবেছিলাম, ও মরে গেছে। তা নাহলে ওকেও মেরে ফেলতাম ঠিকই। তবে তখন তো জানতাম না—পাপ বাপকে ছাড়ে না। কিরকম একটা ঘোরের ভেতরে ঘটে গিয়েছিল সব।

কেন খুন করলাম নাজমা আপাকে?

তা জানি না। বেরোনোর আগে কিছু টাকা আর গয়না দু'জনের পকেটে নিয়ে নিয়েছিলাম ঠিকই। তবে, টাকা পয়সা বা গয়নাগাঁটির জন্যে খুন বোধহয় করিনি।

মোটামুটি বেঁচে থাকতে চেয়েছি। চুরি-বাটপারি আমি কোনোদিন করিনি। নাজমা আপার শেষ কথাটা মনে আছে তো আপনাদের?—তিনি বলেছিলেন, তোদের মতো বিশ্বাসী লোক পাওয়া যায় না আজকাল। কিংবা ইসলামপুরের দোকানের মালিককেই জিজ্ঞেস করে দেখুন আমার কথা।

তবে, আমার একটা রাগ ছিল নাজমা আপার ওপর। অনেক দিনের রাগ।

আমি তো নাজমা আপাদের বাসায় কাজ করতাম। আমি তখন বড় হচ্ছি। নাজমা আপা আমাকে মানুষ মনে করত না। আমি সেই অনেক কাল আগের আশরাফ শাহেবদের কথা বলছি। গোসল করতে যাবে আপা। দরোজা ভেজানো থাকত। কখনো আমাকে গরম পানি আগে দিতে বলত না আপা। বাথরুমে ঢুকে যাবার পর চেঁচিয়ে বলত—ইদ্রিস, গরম পানি দিয়ে যা। শীত-গ্রীষ্ম আপা গরম পানি দিয়ে গোসল করত। আমি গরম পানির ডেকচি নিয়ে বাথরুমের ভেতরে আপার পরনে শুধু পেটিকোট আর ব্রা। আপার আব্বার বাড়িতে আগে বাথরুম ছিল ঘরের বাইরে। রাত্রিবেলা আপা উঠলে—আমি বারান্দায় শুতাম—আপা আমাকে ডাকত। আপা ভয় পাবে বলে বাথরুমের সামনেই দাঁড়িয়ে থাকতে হতো আমাকে।

আমি তখন বড় হয়ে উঠেছি। আপা কলেজে যাবে বলে তার জন্যে রিকশা ডেকে দিতে হতো। আমি রিকশা ডেকে আপাকে তুলে দিতাম। পাড়ার ছেলে-ছোকরারা আপাকে শুনিয়ে শুনিয়ে অসভ্য কথা বলত। সে-সব শুনে আপার কি প্রতিক্রিয়া হতো জানি না—আমার গা-মাথা ঝিমঝিম করত।

একদিন আপা কোথায় বেরোবে আমাকে ঘরে ডাকল। আমি ভেবেছি, রিকশা ডাকতে বলবে। কিন্তু আপা বলল—দেখি, এটা লাগিয়ে দে তো—বলে পিছনে ফিরে দাঁড়াল। আপার তখন খালি গা। ব্রা-র হুক লাগিয়ে দিতে বলছিল। মুহূর্তের মধ্যে আমার শিরা-উপশিরায় রক্তস্রোত যেন চমকে উঠল। আমি ব্রা ফেলে আপাকে জড়িয়ে ধরতে গেলাম। আমার হাত চলে গিয়েছিল আপার বুকে। মুহূর্তের মধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে পায়ের স্যান্ডেল খুলে এমন জোরে আমাকে মেরেছিল আপা যে, আমি উল্টে পড়েছিলাম। তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে আপার ঘর থেকে মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসি।

তারপর খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম, আপা না বলে দ্যায় সবাইকে। বাড়ি ছেড়ে পালাব কিনা তাও ভাবছিলাম। আমার চোখ-মুখ বোধহয় কয়েকদিন লাল হয়ে ছিল। আপা কি জানি কেন কাউকে বলেনি। আমিও ঐ বাড়িতেই থেকে গেলাম।

নাজমা আপা কি বদলে গিয়েছিল তারপর? আমাকে আর লোভ দেখায়নি?—না, দেখিয়েছে। কিছুদিন বন্ধ ছিল সব। তারপর সব আগের মতো।

কিন্তু আমি জেনে গিয়েছিলাম, আপা যে-সীমা বেঁধে দিয়েছে তার এক কদম বাইরে যাবে না।

বিয়ে হওয়ার পরে, দুই ছেলের মা হয়ে যাওয়ার পরে, নাজমা আপা সব ভুলে গিয়েছিল। আমিও সব ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু কী যে হলো সেদিন। ভূত চেপে গিয়েছিল আমার মাথায়। আশ্চর্য, আপা বাথরুমের কথা বলতেই আমার মনে পড়ে গিয়েছিল আরোকটি বাথরুমের কথা।

না, না, দারোয়ান কিছু জানে না। দারোয়ানের কোনো দোষ নাই। দারোয়ান সন্দেহ করবে কেন। তার সামনে দিয়েই দিলু আর আমি বেরিয়ে এসেছিলাম। আমাদের হাতে তো কোনো ব্যাগ-ট্যাগ ছিল না। অল্প গয়নাগাটি আর টাকাপয়সা আমরা দু'জনের পকেটে ভাগ করে নিয়েছিলাম। গরিব মানুষ, তাই গয়নাগাটি টাকা পয়সার লোভ সামলাতে পারিনি ॥

[১৯৯৭]

পঞ্চেন্দ্রিয়

সন্ধেবেলা

গলা বসে গেছে, তবু রহমান যে-রকম নাছোড়বান্দা টাইপের মানুষ, তাতে না-গেলে চলবে না কিছুতেই। মুস্তফা তাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে রিকশায় চড়ে বসল।

রহমানের আজ জন্মদিন। আগে এসব পালন করত না। মুস্তফা যেমন জীবনে তার জন্মদিন উদ্‌যাপন করেনি—তেম্নি। কিন্তু যত বয়েস বাড়ছে রহমানের কী যেন হয়েছে—প্রত্যেক বছর জন্মদিন পালন করবেই। এমন কোনো ঘটা করে কিছু না। ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধু। তাদের অনেককেই চেনে না মুস্তফা। রহমানের ঐ জন্মদিনেই আলাপ হয়। আবার প্রত্যেক বছর নতুন নতুন লোক দ্যাখে। একজন শুধু নিয়মিত হাজিরা দ্যায়। দেবে না?—মুস্তফা তার ছেলেবেলার বন্ধু। তার কাছে কী বলে না রহমান, সবই বলে, তার যত লেখা বেরোয় এই লোকটিই লিখে দ্যায়, বিনিময়ে তাকে কিছু টাকা দ্যায় রহমান। এই একটা বাতিক হয়েছে তার, লেখালেখি করলে সমাজে নাকি সম্মান বাড়ে, তাই টাকা দিয়ে কী-সব লেখায়, ছাপাও হয়, পত্রিকায় দেখেছে দু-একবার গোলাম রহমানের গল্প। দেখে মন ভরে উঠেছে মুস্তফার—তার ছেলেবেলার বন্ধু গোলাম রহমান কত গুণের দ্যাখো : একজন গল্পলেখকও বটে।

মুস্তফাকে তাই গোলাম রহমানের জন্মদিনে যেতেই হচ্ছে। সাদিয়া খুব মজা করে দুপুরে ভাত খাবার পরে শরবত বানিয়ে খাচ্ছিল, গেলাশে সোনালি রঙের শরবত টলমল করছে, দেখে লোভ হয়েছিল ভারি মুস্তফার, বলেছিল—বাহ, খুব মজাসে শরবত খাচ্ছ, আমাকে একটু দাও না!

সাদিয়া বলল—খাবে তুমি? তোমার তো আবার চা ছাড়া ভালো লাগে না কিছু। ঠিক আছে, দিচ্ছি। কিন্তু বরফ দিতে বোলো না আবার—তাহলেই তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে, তোমার যা ঠাণ্ডার ধাত!

পাগলকে সাঁকো নাড়ানোর কথা বারণ করা আর কী।

মুস্তফা বলল—কিচ্ছু হবে না। বরফ ছাড়া শরবতের স্বাদই খোলে না। আর বাদাম-পেস্তা একটু কুচি করে মিশিয়ে দাও।

কী হয়েছে, সাদিয়া খুব ঘামে, সাদিয়ার সব সময়ই গরম লাগছে—ঠিক মুস্তফার উল্টো। যত বয়েস হচ্ছে, তত দুজনের স্বভাবের এই মূল পার্থক্য ধরা পড়ছে দিনে দিনে। এম্নিতে তারা ঝাড়াঝাপ্‌টা একদিকে—বেদনাও আছে। দুই

ছেলেই ইঞ্জিনিয়ার। বড় ছেলে খুলনায় কাজ করছে, শ্বশুরবাড়িতে থাকে। ছোট ছেলে বিয়ে করে আমেরিকায় সেই-যে গেছে, আসেনি আর, সেখানেই বাড়ি-ঘর কিনে সেটেলড্ হয়ে গেছে—টেলিফোনে খোঁজ-টোজ নেয় মাঝে মাঝে। মুস্তফা তার ফোন ধরে না—সাদিয়াকে ডেকে দ্যায়।

বরফ খেলে মুস্তফার যা হয়, তা-ই হয়েছে। গলা বসে এখন কথাই বলতে পারছে না।

বয়েস হয়েছে এখন, খুব-একটা কেয়ার করে না মুস্তফা কে কী ভাবল তাই নিয়ে, তাছাড়া ঠাণ্ডাও তো পড়ছে, অঘ্রান মাসের আজ কত তারিখ যেন। গলায় একটা মাফলার জড়িয়ে নিয়েছে।

'মালঞ্চ' থেকে বন্ধুর জন্যে একটা ফুলের ঝাঁপি কিনে নিল। ইস্কাটনের গলিতে যখন ঢুকল, তখন সন্ধে উতরে গেছে অনেকক্ষণ। ভিড়ভাড়াক্কা কমলে যাবে, এরকমই বলে রেখেছিল রহমানকে।

পাঁচ তলা বাড়ির একতলার ভাড়াটে রহমান। গলির ভেতরে বাড়িটা হলেও বেশ সুন্দর এ এলাকাটা। ছিমছাম। গেটেই কলিং বেল। ঘণ্টার শব্দে হাসিমুখে বেরিয়ে এল রহমান।

—এলে? তুমি যে আলসে, আমি তো ভাবলাম আসবেই না। এসো। এসো।— গেট খুলে দিল রহমান।

গলায় মাফলারের দিকে ইঙ্গিত করল মুস্তফা। ঠোঁটে একটা আঙুল ছোঁয়াল। অর্থাৎ কথা বলতে পারছে না। এত বয়েস হলো, রহমান কিন্তু খুব আমুদে। খুব প্রাণবন্ত। হেসে বলল—পুরোনো বন্ধুর উপস্থিতিই যথেষ্ট। এসো।

ঘরের সামনে একটা ঢাকা বারান্দা। অনেক টব। ফুলের গাছ। রহমান সব সময়ই শৌখিন। নাকি এটা বাড়িওয়ালারই ব্যবস্থা? রহমান বছর দু-তিন হলো আছে এই বাড়িতে। এর আগেও এসেছে এখানে। জন্মদিনই এখানে বার দুয়েক উদ্‌যাপিত হলো না?

ঘরের দরোজা খুলে দিল রহমান। রহমানের হাতে ফুলের ঝাঁপিটি সমর্পণ করল। তারপর মুস্তফা সোফায় গিয়ে বসল। বড় সোফার একপাশে। জুতো দরোজার সামনে খুলে রেখেছে, মোজা পরে আছে।

বসেই নজরে পড়ল, ওদিকে বসে আছে সেই লোকটি, যে গোলাম রহমানের গল্প লিখে দ্যায়।

চোখ পড়তে লোকটি জিগেস করে—কেমন আছেন?

জবাব তো দিতে পারবে না মুস্তফা। তার হয়ে হেসে বলে রহমান—মুস্তফারা হচ্ছে সুখী লোক। অল্পেই এটা হয়, সেটা হয়। গলা বসে গেছে। কথা বলতে পারছে না। দুই ছেলে ইঞ্জিনিয়ার—একটা ছেলে আমেরিকায় আছে না?—টাকা—টাকা পাঠায় তো নিশ্চয় অনেক। নিজে শৌখিন অধ্যাপক। বাপের বাড়িতে থাকে। দোকান আছে, ভাড়া পায়। আবার কী। স্বামী স্ত্রী কপোত-কপোতী। আমার মতো তো না—

বলতে বলতে রহমান ভেতর থেকে একটা প্লেট এনে দ্যায়। কেক, পেস্ট্রি, প্যাটিস ইত্যাদি।

—কোক্ খাবে? না। গলার বারোটা বাজিয়ে বসে আছ। দাঁড়াও, চা করে দিচ্ছি এখনি। গরম চা খাও। তোমার ঐ গলা বসা-টসা উবে যাবে। আমার তো সংসার নেই। আদা নেই। আদা-চা দিচ্ছে না তোমার বউ?

মুস্তফা ঘাড় কাত করে।

কথা বলতে না-পারায় একটা সুবিধা এখন বোধ করে মুস্তফা। কথা না-বললে যেন আর-একটু বেশি দেখা যায়, উপলব্ধি যেন আর-একটু প্রগাঢ় হয়। বোবারা কি আমাদের—সাধারণ কথা-বলিয়ে মানুষের চেয়ে বেশি গভীর? অন্তত মুস্তফার এখন তো তাই মনে হচ্ছে।

তৃপ্ত স্মিত হাসি মুখে বন্ধুর জন্মদিনের কেক-পেস্ট্রি খেতে খেতে রহমানের ঘরটার চতুর্দিকে চোখ চলে মুস্তফার। টেলিভিশন চালানো আছে কোনো চ্যানেলে, নাচ-গান হচ্ছে, একটু লো ভলিউমে রাখা। টি.ভি.টা রাখা আছে ঘরের কোনায়। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। তার পাশে একটা কাচ-ঢাকা শেল্ফ্। তার মধ্যে কিছু শো-পিস, কিছু বইপত্র। ঐ ঘরেরই এক পাশে ডবল বেতের খাট। একা-মানুষ রহমান, বড় খাট কেন? হয়তো বিয়ের সেই কবেকার পালংটিই আছে আজো। খাটের পাশে উঁচু হার্ডবোর্ডের আড়ালে ওপাশে একটা টেবিল। তার ওপর আছে আজকের জন্মদিনের অবশিষ্ট কিছু খাবার দাবার, প্লেট, মোমবাতি।

বেল্ বেজে উঠল।

উঠে গিয়ে দরোজা খুলে দিল রহমান। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল দুটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে, এক তরুণী আর একটি তরুণ। মেয়েটি রহমানের হাতে পাকেট দিল একটি। বলল—আব্বা, তোমার জন্যে—

—আমার জন্যে আবার কী আনতে গেলি—বলতে বলতে প্যাকেট ছিঁড়ে ফেলল রহমান।—বাহ!—একটা খুব বাহারি শার্ট।

রহমান এই বয়সেও কী চঞ্চল আর সজীব, দ্যাখো। চিড়িয়াখানার বাঘের মতো সারাক্ষণই ঘরের মধ্যে একবার এদিক একবার ওদিক করছে। তার তুলনায় অনেক স্থির, শান্ত। স্থির শান্ততার জন্যে না—এখন বোবা হয়ে অনেক বেশি দেখতে পাচ্ছে মুস্তফা। যেন তার বোধের একটা বন্ধ দরোজা খুলে গেছে।

—মুস্তফা, এই আমার মেয়ে-জামাই-নাতি-নাতনি।—রহমান ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।—আর এ আমার সেই কোন্ ছেলেবেলার বন্ধু—কলেজ লাইফের।

মেয়ে-জামাই সালাম দিল। বাচ্চারা খেলছে। রহমান ভেতরের টেবিল থেকে প্লেট আনতে গেল। মেয়েটি বলল—দাঁড়াও, আব্বা, আমিই আনছি।

—ঠিক আছে। তুইই আন্, রুমি। সবাইকে দে। বলতে বলতে রহমান স্টিলের আলমারি খুলে খাটের ওপর ঝটিতি কয়েকটি প্যাকেট বের করল। বলল—রুমি, এদিকে আয়। শোন্, এই তোর সালোয়ার-কামিজ, কবিরের প্যান্টের কাপড়, আর বাচ্চাদের কাপড়-জামা। তোদের ঠিকই আছে, বাচ্চাদের জামাকাপড়ের মাপ কী আর বুঝি আমি?—বলে মুস্তফার দিকেই তাকিয়ে হাসল।

আলমারির ওপর থেকে ব্যাগ বের করল একটা। নতুন ব্যাগ। খাটের ওপর রাখল। মেয়েকে বলল—এই ব্যাগের মধ্যে নিয়ে নে সব—

মুস্তফার দিকে তাকিয়ে বলল রহমান—তোমার ছেলেদের তো বিয়ে দাওনি এখনো, তাই না? মুস্তফা মাথা নাড়ল। রহমান বলল—আর আমি—দ্যাখো—নাতি-নাতনিও পেয়ে গেছি। বলেই—আয়—অনি, অনি—আয়, আয়, আমার কোলে আয়— বলে নাতনিকে কোলে নিল।

নাতনিকে কোলে নিয়ে স্টিলের আলমারিটা খুলল আবার।—এই যে তোমাদের জন্যে আর-একটি জিনিশ বলে চমৎকার একটি চকোলেটের বাকশো বাচ্চাটির হাতে ধরিয়ে দিল।

বাচ্চাকে কোলে নিয়ে মুস্তফার কাছে এসে দাঁড়াল রহমান। বলল—দ্যাখো দোস্ত, এই আনন্দ তুমি এখনো পাওনি, নাতি-নাতনির আনন্দ। বিয়ে দাও ছেলেদের। তারপরে বুঝবে। তোমার জীবন এখনো সম্পূর্ণ হয়নি।

খাওয়াদাওয়া করে ওরা সব উঠল।

রুমি বলল—আব্বা, যাই এবার—

রহমান বলল—তবু যে মনে করে এলি—

রহমান খাটের বালিশের নিচ থেকে মানি-ব্যাগ বের করল। কিছু টাকা গুঁজে দিল মেয়ের হাতে।

—রাখ্ এটা—আসিস আবার— রহমান বলল—তোরা এসে আমার জন্মদিনের আনন্দটা পুরো করলি—আসিস মাঝে মাঝে— তারপর জামাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, এসো, বাবা, আবার— জামাই ঘাড় নাড়ল। এগিয়ে দিল ওদের।

একটা পত্রিকার পৃষ্ঠা উলটোচ্ছিল মুস্তফা।

রহমান বলল—আজ আর কেউ আসবে না বোধহয়। যারা আসবার, বিকেলেই এসে গেছে, তুমি তখনো আসোনি। খট্ করে সোফার সেন্টার টেবিলের ওপর দুটো গেলাশ রাখল।

মুস্তফা তাকিয়ে দ্যাখে, রহমানের সেই ভাড়াটে-লেখক কখন উঠে চলে গেছে। রহমানের মেয়ে-জামাইরা এসেছিল যখন, সেই ফাঁকে কী?

সোফার দিকে আঙুলের ইঙ্গিত করে ভুরু উঁচোল মুস্তফা।

রহমান বলল—ও—বলে সেও হাতের ঝাপটায় দরোজা দেখাল। অর্থাৎ উঠে গেছে কোন্ ফাঁকে।

আচ্ছা, মানুষের কথার চেয়ে শরীরের ভাষা কী আরো বেশি বোঝাতে পারে না?—ভাবল মুস্তফা।

কতদিন আগে এক দৃশের কথা ছবির মতো মনে পড়ল মুস্তফার। বোধহয় তার কলেজ-জীবনের। নাকি ইউনিভার্সিটির? তখনো কিছুই বোঝে না ভালো করে। ঢাকা শহরটাও কত ফাঁকা ছিল। এখনকার ছেলেমেয়েরা কল্পনাও করতে পারবে না। তখন কত মাইল মাইল রাস্তা হেঁটেছে মুস্তফা। একদিন এক মাঠের মধ্যে দিয়ে পার হচ্ছে। গরমের দিন। মাঠের মাঝখানে ঠিক না, একপাশে,

কয়েকটা গাছের জটলা। জিরোনোর জন্যে সেখানে একটু বসল, নাকি জুতোর ফিতে খুলে গিয়েছিল? সেই সময়েই দৃশ্যটি তার চোখে পড়ে। দুটি পুরুষের মাঝখানে যুবতী এক নারী বসে আছে। একটি পুরুষ তার একটি হাত মুঠো করে ঘন ঘন নাড়াচ্ছে। আর মেয়েটি শব্দহীন হেসে গড়িয়ে পড়ছে। মেয়েটি কি বোবা ছিল?

দড়াম করে স্টিলের আলমারিটা খুলল রহমান। হুইস্কির বোতল বের করে নিয়ে এল রাখল সেন্টার টেবিলের ওপরে।

রহমান মুস্তফার পাশে সোফায় বসল।

বলল—এসো, জন্মদিনটা পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে সেলিব্রেট করি।—বলে দুই গেলাশে ঢালল।

—চিয়ার্স! রহমান বলল। দুই গেলাশ ছুঁইয়ে।

মুস্তফা মনে মনে বলল : দ্যাখো, কথা না-বলেও দিব্যি কেমন সবই চলে যাচ্ছে। খামোকাই আমরা কথা বলে মরি।

রহমান গেলাশে চুমুক দিয়ে বলল—দেখলে তো, এই আমার মেয়ে-জামাই। ছেলেটা তো আসে না। কী বলব, হারামজাদা বাপের মুখ দ্যাখে না। মায়ের রক্ত পেয়েছে। কুড়ি বছর হয়ে গেল, কত খোশামোদ করেছি সুমিকে—এল না তো এলই না। এ জীবনে আসবে না আর। ছাত্রাবস্থায়, বাপ-মা'র অমতে বিয়ে করেছিলাম—তার শাস্তি। আমার হয়তো কিছু অপরাধ ছিল। কিন্তু এত ক্ষমাহীন—এত ক্ষমাহীন!—বলে গেলাশে লম্বা টান দিল রহমান।

রহমানকে—মুস্তফার এখন মনে হচ্ছে—মুহূর্তে যেন বয়েস বেড়ে গেছে। একটু আগে সারা ঘরময় বাঘের মতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল, এখন মনে হচ্ছে সে-অভিনয়। রহমানের চোখে-মুখে এতক্ষণ ছিল তারুণ্যের আভা, তারুণ্যের দীপ্তি—এখন সে সব নিভে গেছে।

মুস্তফা ইঙ্গিতে বলল—কাগজে লেখার ভঙ্গি করল।

ঝটিতি পাশের শেল্‌ফের ওপর থেকে একটা প্যাড আর একটা বলপেন এনে দিল রহমান।

মুস্তফা তাতে গোটা গোটা হরফে লিখল : যা হয়েছে, হয়েছে। এসব ভেবে জন্মদিনটা মাটি কোরো না।

লেখা শেষ হতেই তাকিয়ে দেখে লাফিয়ে উঠল রহমান—ঠিক বলেছ মুস্তফা। বন্ধুর মতো কথা। বিশ বছরের পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। আমার জীবনের ঐ চ্যাপটার ক্লোজ করে দিয়েছি।—বলে মুস্তফার হাতে-লেখা প্যাডের কাগজটি টেনে দুমড়ে-মুচড়ে ঘরের ওপাশে গিয়ে দূরে ফেলে দিল কোথায়।

ঐ ভেতরের দিয়েই হার্ডবোর্ডের ওপাশে ইঙ্গিত করে মুস্তফা।

—ও, পেশাব করবে? এসো। রহমান আবার একটা তরুণ বাঘ হয়ে উঠছে। তার মুখের বলিরেখা দেখা যাচ্ছে না আর।

রহমানের পিছন পিছন গিয়ে টয়লেটে ঢুকল মুস্তফা। ছোট্ট সুন্দর বাথরুম তো। প্যান্টের চেন খুলতে খুলতে ভাবল মুস্তফা : আচ্ছা, একটি বাক্যও ব্যবহার

না-করে দিব্যি তো চালিয়ে নেওয়া যায় জীবন। একটিই তো জীবন মানুষের। কথা কথা কথা কথা কথা। এত কথার দরকার কী। নীরবতা কথার চেয়ে মূল্যবান।

টয়লেট থেকে বেরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাল মুস্তফা।

রহমান বলল—আরে, বোসো, বোসো। দাঁড়াও—বলে আবার দড়াম করে স্টিলের আলমারির একটা পাল্লা খুলল। বলল—কী বুড়োলোকের মতো সিল্কের পাঞ্জাবি-পাজামা পরে বেরিয়েছ। এই নাও, তোমাকে একটা লাল টি-শার্ট দিলাম। এটা পরে, ভালো জুতো পরে, বান্ধবীদের বাড়িতে যাবে।

মুস্তফা লিখল : 'আহা, কী দরকার ছিল!'

প্যাডের কাগজটা ছিঁড়ে ধরিয়ে দিল রহমানের হাতে। রহমান শুধু হাসল। তারপর কাগজটা দুমড়ে ছুঁড়ে দিল ভিতরের দিকে।

তারপর বলল—দাঁড়াও, ছোটবেলার দোস্তো। তোমাকে আমার জন্মদিনের সেরা সারপ্রাইজটা দেখাই।—বলে তরুণ বাঘের মতোই উঁচু হার্ডওয়ারের ওপাশ থেকে যাকে গলায় হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে নিয়ে এল সে এক সত্যিকার হরিণী। ঘরের মধ্যে বাজ পড়লেও বোধহয় এতটা অবাক হতো না মুস্তফা। আরেকটু হলেই বোধহয় কথা বলে ফেলত সে।

রহমান বলল—এই আমার এবারের জন্মদিনের সেরা উপহার। শ্রাবণী। শ্রাবণী এসেছে খুলনা থেকে। বেশিদিন হয়নি। একটা অ্যাড-ফার্মে চাকরি করছে আপাতত। একটা এন.জি.ও.তে ভালো চাকরির কথা হচ্ছে। তখন কি আর থাকবে এখানে? বলে রহমান শ্রাবণীর পিঠে আদরের চাপড় মারে। বলে—খাঁচা ছেড়ে বনের পাখি তখন উড়ে যাবে কোথায়।

মেয়েটি সরু গলায় বলল—এঁর পরিচয় দিলেন না?

রহমান বলল—মুস্তফা। আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমার উল্টো। ঘোর গৃহী মানুষ। আমার মতো সংসার-বিবাগীর সঙ্গে যে বন্ধুত্ব রেখেছে, এ-ই বেশি। রহমান শ্রাবণীর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে—তবে দ্যাখো, শ্রাবণী, তোমার বর্ষণে ওকে ভাসিয়ে নিতে পারো কিনা।

শ্রাবণী লজ্জা-টজ্জা পেল না মোটেই। মুস্তফার আর রহমানের দিকে যুগপৎ তাকিয়ে বলল—খেয়েছেন?

মুস্তফা ঘাড় কাত করল। অর্থাৎ খাওয়াদাওয়া হয়েছে।

রহমান রঙ্গ করে বলল—তোমাকে দেখে সব কথা হারিয়ে ফেলেছে। তারপর হাসি থামিয়ে বলল—তা না। ঠাণ্ডা লাগিয়ে বসে আছে বেচারা। কথা বলতে পারছে না।

শ্রাবণী বলল—আমি যাই। বলে ওপাশে চলে গেল।

রহমান পরিতৃপ্ত মুখে বলল—এই পাশের ঘরেই রেখেছি। এসব উড়ো পাখি। থাকবে আর ক-দিন? তবে আপাতত আমার খাঁচায় বন্দি।

মুস্তফা লিখল : 'তোমার জন্মদিন আনন্দে কাটুক।' বলে রহমানের হাতে কাগজটা দিল।

রহমান বলল—কাটবে। তবে সামনের জন্মদিনে ওকে আর দেখতে পাবে না। আমিও ঝুটঝামেলায় জড়াতে চাই না। তারপর বলল—আজ রাতটা আমার। তুমি তো শালা একটা গাধার জীবন যাপন করছ। বৌ আমারও আছে। না-ই থাকল আমার সঙ্গে। পাকাপাকি ডিভোর্স তো হয়নি। শোনো, দোস্তো, শুধু বৌ নিয়ে পুরুষমানুষের চলে না, তুমি আমার ছোটবেলার বন্ধু, চলে এসো কাল, শ্রাবণীর সঙ্গে কাটাও কিছুক্ষণ, তারপর রাত্রিবেলা বৌয়ের আঁচলের নিচে চলে যেয়ো। কী, রাজি? ছোটবেলার বন্ধুর জন্যে এটুকু স্যাক্রিফাইস করতে রাজি আছি আমি। কী? বলো কিছু। রহমান বন্ধুর কাঁধে হাত রাখল।

একমুহূর্ত ভাবল মুস্তফা। তারপর লিখল : 'আগামীকাল রাত আটটার আসছি।'

লেখাটা পড়ল রহমান। তারপর বন্ধুর হাত ঝাঁকিয়ে বলল—চলে এসো। তারপর রাত দশটা-এগারোটা যতক্ষণ পর্যন্ত থাকো। কাকপক্ষী টের পাবে না। তোমার বৌ তো দূরের কথা।

রহমানের বাড়ি থেকে যেন একটা তরুণ বাঘের মতো বেরিয়ে এল মুস্তফা। মনে হচ্ছে, অনেকদিন পরে যৌবন ফিরে এসেছে যেন।

রাত হয়েছে। হাঁটতেই ভালো লাগছে। চলন্ত গাড়ির আলোর ঝলকানি সাঁৎ সাঁৎ করে সরে যাচ্ছে তার ওপর দিয়ে। মুস্তফার পা-মাথা কি টলছে একটু? কিন্তু—তার মধ্যেও মনে হলো তার—শব্দহীন থাকলে কি একটু বেশি দেখা যায়?

সকাল

রোজকার মতোই ঘুম ভাঙল যথারীতি রিনার চ্যাঁচামেচিতে।

এক ঘুমে রাত সাফ। গতরাতে রহমানের বাড়ি থেকে অতখানি রাস্তা হেঁটেই ফিরেছে মুস্তফা। জানত খুব ভালো করেই, রহমানের একক নিঃসঙ্গ জীবনের কথা। কিন্তু তাঁর মধ্যেও এত বিচিত্রতা? এ কোন্ ধরনের জীবন যাপন করছে রহমান? তাকেও তো আমন্ত্রণ জানিয়েছে রহমান। যাবে নাকি মুস্তফা? নাকি যাবে না? শ্রাবণী তো রহমানের মেয়েরই বয়েসী। মুস্তফার নিজের মেয়ে থাকলেও তো ঐ বয়সেরই হতো। কিন্তু তাতে কী?

অকথ্য চ্যাঁচাচ্ছে রিনা।

রোজ সকালে শুনতে শুনতে কিছুক্ষণ পরেই রিনার সঙ্গে লেগে যায় তার। এ কী একটা অভ্যাস তার—সময় কাটানোর? একটি নৈশ কলেজে অধ্যাপনা করে মুস্তফা। দিনের বেলাটা কাটাবে কি করে সময়? রিনার ছেলেরা সব ঢাকার বাইরে, দেশের বাইরে। সেও কি সময় কাটানোর জন্যেই কাজের মেয়েটির সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দ্যায় রোজ? এবং তারপর, যখন প্রতিবাদ করতে যায় মুস্তফা, তখন ঝগড়াটা চলে যায় আর-এক পর্যায়ে—মুস্তফার বাপ-মা'র বিরুদ্ধে না-হক কিছু কথা শুনিয়ে দ্যায় রিনা। এই নিয়েই প্রতিদিন তাদের সকালটা কেটে যায়।

কিন্তু না।

আজ আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না মুস্তফা। তার কান বধির হয়ে গেছে। কাজের মেয়েটিকে বকতে বকতে মুস্তফার বাপ-মা-ভাই-বোনের বিরুদ্ধে যা-তা বলতে শুরু করে যখন রিনা, তখনও কিছু আজ শুনতে পায় না মুস্তফা।

না-শুনতে পাওয়ার মতো শান্তি কোথায় আছে?

একটা লোক যদি কথা বলতে না পারে—যার অনেকদিন কথা বলার অভ্যাস ছিল, মানুষটা যদি কথা শুনতে না পারে কারো—যার ছিল দীর্ঘকাল কথা শোনার অভ্যাস—তাহলে ঘুম থেকে উঠে শয্যায় শুয়ে থাকবে না কেন। মুস্তফা বিছানায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকল।

রিনা ঘরের মধ্যে এসে কিছুক্ষণ চেঁচিয়ে থামল শেষে। একটু ভয়ই লাগল তার। কথা বলছে না লোকটা। এখন, আবার কিছু হলো নাকি?

গলা পাল্টে গেল তার।

বলল—কী হয়েছে? ওঠ। উঠে, মুখ-হাত ধুয়ে নাশতা খেয়ে নাও।

মুস্তফা নিঃশব্দে উঠল।

রিনা বলল—কী, কথা বলছ না কেন? শরীর ভালো আছে তো? তার স্বরে স্পষ্ট উৎকণ্ঠা।

কোনো কথা না-বলে নাশতা খেয়ে নিল মুস্তফা। পঞ্চাশ বছর ধরে ভালো-মন্দ কত কথাই শুনেছে সে। বিয়ের পর গত পঁচিশ বছর ধরে কথা শুনে আর বলা গেছে। শব্দ—শুধু শব্দ তার কানে অবিরাম আছড়ে পড়ে বধির করে ফেলেছে আজ তাকে। আজ সে কোনো কথাই শুনবে না। কারো কথাই শুনবে না।

বিকেল

নৈশ কলেজের দীর্ঘকালীন চাকরি কি বদলে দিয়েছে মুস্তফাকে? দীর্ঘ দিনমান নিয়ে কী করে সে? কঠিন অর্থসংকট যদি থাকত তার, তাহলে টাকার জন্যে দিনরাত্রি পরিশ্রম করে বেঁচে যেত সে। মাসান্তে কয়েকটি দোকানের ভাড়া সে পায়। ঐসব দোকানগুলোর ওপরেই তার বাড়ি, তার পৈতৃক উত্তরাধিকার। কলেজের কয়েক হাজার টাকার সঙ্গে এইসব সুবিধা যুক্ত হয়ে তাকে যেন অথর্ব করে দিয়েছে। ছেলে দুটো মানুষ—নাকি অমানুষ?—হয়ে একজন দেশের মধ্যেই খুলনায়, আরেকজন মার্কিন দেশে। সারাদিন সে আর রিনা। রিনা আর সে।

রাতে দিব্যি ঘুম হয়েছে। তারপরও দুপুরে লম্বা একটা ঘুম দিল মুস্তফা। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে খাবার টেবিলে এসে বসল, ছোট কাজের মেয়েটি চা ডিমসেদ্ধ পাউরুটি টোস্ট দিয়ে গেল।

সে-সব খেতে খেতে ড্রয়িংরুম থেকে রিনার বেসুরো গলার গান ভেসে এল।

নিশ্চয় সুব্রতদা এসেছে।

গত তিন বছর ধরে সুব্রতদার কাছে গান শিখছে রিনা।

তার আগে দু বছর শিখেছে বিজনদা'র কাছে।

তার আগে পাঁচ বছর শিখেছে ওস্তাদ ফুলঝুরি খানের কাছ থেকে।

তার আগে...

অন্তহীনভাবে গান শেখা চলেছে রিনার।

কবে সে-শিক্ষা সমাপ্ত হবে, তা কেউ বলতে পারে না।

চা খেতে খেতে এইসব ভাবছে মুস্তফা, শব্দ পেয়ে গান থামিয়ে ডাইনিং রুমে এল রিনা।

তার সুন্দর শাড়ি, স্লিম চেহারা, হাতে একগুচ্ছ গোলাপের ঝাড়—কিছুই চোখে পড়ল কি মুস্তফার? সকালবেলা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রূপ?

হাসিটাও হিরে-ঝরানো। বলল—যাক, নাসিমাটাকে বকে বকে মানুষ করেছি, দ্যাখো কিরকম। ঠিক তোমার জন্যে বিকেলের চা-টা দিয়েছে। আগে কী পারত এইসব। তারপরই চেঁচিয়ে বলল—নাসিমা, সুব্রতদা'র জন্যে আর এক কাপ চা দে। এখানে টেবিলে এনে রাখ। আমি নিয়ে যাব। তারপরই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল—সুব্রতদার কাণ্ড দ্যাখো। কী সুন্দর গোলাপ এনেছে একগুচ্ছ। সুগন্ধে বাড়ি ভরে গেছে—দ্যাখো— বলে রিনা মুস্তফার গা ঘেঁষে দাঁড়াল, গোলাপগুচ্ছ তার নাকের কাছে তুলে ধরল।

কই, কোনো সুগন্ধ তো পাচ্ছে না মুস্তফা। গোলাপই বা কোথায়?

রিনা এখন এমন ফুরফুরে মেজাজে আছে যে মুস্তফার সাড়া না দেওয়া সে লক্ষ্যই করল না। সে বিভোর হয়ে আছে আনন্দে। যখন সে কিশোরী, তার আব্বা মফস্বলের এক নামী ডাক্তার, একটি যুবক কেন যেন আসত ওদের বাড়িতে, কারণে-অকারণে, আর সে এলেই বুকের রক্ত চলকে উঠত তার। সুব্রতদা আজ যখন রক্তলাল গোলাপের ঝাড় এনে তার হাতে দিল, তখন যেন মুখটাও লাল হয়ে উঠল তার।

কিন্তু এসব কিছুই দেখতে পাচ্ছে না মুস্তফা। কে রিনা? সুব্রতই বা কে?

ঘরে গিয়ে প্যান্ট-শার্ট পরল মুস্তফা। জুতো। খুব বেছে বেছে, মিলিয়ে মিলিয়ে। তারপর বেরিয়ে এল।

ড্রইংরুমের কার্পেটের ওপর হার্মোনিয়াম। তবলা।

গান থামল।

সুব্রত হাসিমুখে সালাম দিল।

কোনো জবাব দিল না মুস্তফা।

—সুব্রতদা তোমাকে সালাম দিয়েছে—বলল রিনা।

কোনো জবাব দিল না মুস্তফা।

বেরিয়ে গেল।

অথচ অন্যদিন সুব্রতর সঙ্গে দু-চারটি কথা বলে। একসঙ্গে চাও খেয়েছে ড্রইংরুমের সোফায় বসে।

রিনা অপ্রস্তুত হয়ে জোরে জোরেই বলল—চিরকালই এক আজব মানুষ রয়ে গেল—

সে-কথা শুনেছিল মুস্তফা, কিন্তু শুনতে পায়নি।

সুব্রত নামের কেউ তার স্ত্রীকে গান শেখাতে আসে না রোজ। গান শেখানোর অছিলায় আসে না রোজ। সুব্রত নামের কাউকে চেনে না মুস্তফা। আর যে আসেনি সে গোলাপের ঝাড় আনবে কি করে। আর তার সুগন্ধই বা হবে কী করে।

রাত্রি

তাহলে আমি কথা বলতে পারি না, কথা শুনতে পাই না, চোখে কিছু দেখতে পাই না, নাকে কোনো ঘ্রাণও পাই না।

পঞ্চাশ বছর ধরে একঘেয়ে অবিরামভাবে চোখ-কান-নাক-জিভ ব্যবহার করতে করতে করতে করতে করতে একসময় তো অসাড় হয়ে আসবেই সব।

এরই নাম তো মৃত্যু। মৃত্যু তো এভাবেই আসে।

রাত্রির রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল মুস্তফা।

ইস্কাটনের গলির ভেতরে একটি পাঁচতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় মুস্তফা। বেল্ টেপে।

ভাবছিল, নিশ্চয় স্বপ্নভঙ্গ হবে। নিশ্চয় থাকবে না রহমান, কিংবা বাড়িতে থাকলেও দরোজা খুলবে না।

কিন্তু কালকের মতোই হাসিমুখে দরোজা খুলে দিল রহমান। বরং বলল—আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি যে মানুষ, তুমি নিশ্চয় আসবে না। এসো। এসো। সব রেডি আছে। শ্রাবণীর সুতো আমার হাতে এখন। যে-অফিসে ইন্টারভিউ দিয়েছে তার মালিক আমার বন্ধু। আমি ও.কে. করলেই ওর চাকরি কনফার্ম। কিন্তু তারপরে ওর নাগাল পাব না আমি। আরো উঁচু ডাল ধরবে ও। নিচের দিকে ওরা কখনো তাকায় না। ওর হাফ-ন্যুড ছবি আছে আমার কাছে। কিন্তু সে থাকবেনা। তাতে ওর কোনো এসে যায় না। তাই আমিও যতটা পারি উশুল করে ছাড়ছি আগেভাগেই। ঘণ্টাখানেকে হবে তোমার?

ঘাড় কাত করল মুস্তফা।

চলো ভেতরে। গলার অবস্থা কেমন তোমার? ভালো তো? রহমান সবসময় অনর্গল কথা বলে যায় যেমন তেমনি বলে যাচ্ছে।

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে মুস্তফা।

কালকের সেই ড্রয়িংরুম। আজ কেমন নির্জন। বাসি ফুল ফুলদানিতে। কিরকম মলিন নির্জীব। উৎসবশেষে যেমন হয়। মানুষ নেই বলেই কি? মানুষের সম্মিলনই তো এক উৎসব।

ড্রয়িংরুমের হার্ডবোর্ডের উঁচু দেয়ালের পাশ দিয়ে এদিকে যে একটা ছোট ঘর আছে, বাইরে থেকে সেটা বোঝা অসম্ভব।—এসো, বলে মুস্তফাকে সেই ঘরে টেনে নিয়ে এল রহমান। মেয়েটা খাটেই বসে আছে।

—শ্রাবণী, কালকেই তো মুস্তফার সঙ্গে আলাপ হয়েছে তোমার। থাকো তোমরা। ঘুরে আসি আমি একটু। তারপর মুস্তফার দিকে তাকিয়ে বলল—কাছেই আমার এক ডিরেক্টর বন্ধু আছে—সিনেমার ডিরেক্টর। ওখানে একটা আড্ডা হয়। ওখান থেকে একটা ঘুরন দিয়ে আসব আমি।

শ্রাবণী বলল—আমাকে কবে নিয়ে যাবেন?

রহমান হাসল—ওখানে গেলে তো আর একদিনও থাকবে না এখানে। তারপর একটু সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল—ঠিক আছে, আজ তোমার কথা বলে রাখব। অফিসে নিয়ে যাব একদিন। আড্ডার মধ্যে তো আর তোমাকে নিয়ে যাওয়া যায় না—

শ্রাবণী বলল—রোজই তো বলছেন—

—ঠিক আছে। আজ ঠিকই বলব। শ্রাবণী, তুমি উঠে ড্রয়িংরুমের দরোজাটা বন্ধ করে দাও। বেল্ বাজলে আমি ছাড়া কাউকে যেন দরোজা খুলে দিও না।

সুন্দর একটা সালোয়ার-কামিজ-পরা শ্রাবণী খাট থেকে নেমে এল।

মুস্তফা চেয়ারে বসে।

—যাই বলে রহমান ড্রয়িংরুমের দিকে। তার পেছনে পেছনে শ্রাবণী। একটু পরেই সশব্দ চুম্বনের শব্দ শুনল মুস্তফা। না, কোনোরকম শব্দই শোনেনি। দরোজা বন্ধ করার শব্দ শুনল। না, কোনো শব্দ শোনেনি।

ফিরে এসে, সহজভাবে খাটের ধারে পা ঝুলিয়ে বসল শ্রাবণী।

মুস্তফা বলল—তুমি কোন অ্যাড্-ফার্মে চাকরি করে যেন বলছিল রহমান—

শ্রাবণী সহজ গলাতেই বলল ও এমনিই বলি আর কী। উনিও জানেন। আমি কোনো চাকরি করি না।

—কী করো তাহলে?

—কিছুই করি না। কে চাকরি দেবে, বলেন? কিইবা পাশ করেছি? উনি আশা দিচ্ছেন। সিনেমায় বা টি.ভি. নাটকে যদি কিছু করতে পারি। তবে কিছু-একটা পেয়ে যাব নিশ্চয়ই—

—কে আছে তোমার?

—কেউ নেই। মা ছিলেন। বিয়ে দিয়েছিলেন। স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হয়নি। ঢাকায় চলে এসেছি তাই।

মেয়েটা কি সত্যি বলছে? এইসব লাইনের সব মেয়ের গল্পই কি একই?—মুস্তফার মনে হলো, মেয়েটা বিশুদ্ধ মিথ্যা চালিয়ে যাচ্ছে।

মুস্তফা কিছুক্ষণ মেয়েটি মিথ্যা কথা বলছে মনে করে রাগের চোটে কোনো কথাই বলতে পারল না।

শ্রাবণী বলল—আপনি যদি চুপ করে বসে থাকেন, আমার ক্ষতি হয়ে যাবে। আপনার বন্ধুকে প্রত্যেকটি কথা জানাতে হবে আমাকে। উনি ঠিক বের করে ফেলবেন—যে মানুষ!

মুস্তফা বলল—কেন, রহমান তো খুব ভালো মানুষ। ভালো বন্ধু। আমার যে এরকম বন্ধু আছে আমি জানতাম না।

শ্রাবণী বলল—খারাপ তা তো আমি বলিনি। আমি বলেছি, উনি আমার কাছ থেকে খুঁটিয়ে সব খবর বের করবেন।

মুস্তফা লক্ষ্য করল, মেয়েটি গুছিয়ে কথা বলতে পারে। মনে হয়, বুদ্ধিমতী মেয়েটি। তাহলে, যেভাবেই হোক, ঢাকায় একটা জায়গা করে নিতে পারবে।

মেয়েটার জন্যে একটা যেন দায়িত্ব বোধ করছে মুস্তফা।

—এক কাজ করো, তুমি দিনের বেলা কাজ খোঁজো। আর রাত্রিবেলা আমাদের কলেজে ভর্তি করে নিচ্ছি তোমাকে—

খিলখিল করে হেসে উঠল শ্রাবণী। বলল—রহমান শাহেব বলেছে, আপনি নাকি প্রফেসর মানুষ। এখানে কি পড়াতে এসেছেন?

শ্রাবণীর বিদ্রূপে অনেকদিন পরে যেন স্পর্শবোধ জাগ্রত হয়ে উঠছিল মুস্তফার। চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে গেল খাটের দিকে।...

রহমান ফিরে এলে সেই কথাই বলল তাকে মুস্তফা।

—এ কি! তোমার গলা একদম ভালো হয়ে গেছে! বিস্ময়ে রহমানের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে।

হেমন্তের রাত্রির রাস্তা দিয়ে একা একা ফিরছিল যখন মুস্তফা, তখন সে সব দেখতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে। অঘ্রানের কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশে একটু-ঘোলাটে চাঁদ। নিচে মাটির পৃথিবীতে আলো, কোলাহল, মানুষ ॥

[২০০১]

পুরোনো কবিতা

গলি থেকে বেরোতেই একজন আমার সামনে যেন পথ আগলে দাঁড়াল।

একটি মেয়ে। তরুণী। সুন্দরী।

বলল—চিনতে পারছেন আমাকে? আমি মিতা।

নির্বাক স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চিনতে পারলাম। হ্যাঁ, মিতাই। সেই নাক চোখ ঠোঁটই বটে।

এত বদলে গেছে! মোটা হয়েছে একহারা সেই মেয়েটি, ফরশা হয়েছে, পূর্ণযৌবনা। আমিই কি আর আগের মতো আছি? মিতাকে চিনিয়ে না-দিলে চিনতেই পারতাম না। আমাকে ও চিনল কী করে? এই ভাঙাচোরা শরীরের আমাকে তো ওর চেনবার কথা না।

—ভালো আছেন তো? মিতা বলল।

বলতে হয় বলল। আমাকে দেখে মিতা বুঝতে পারছে নিশ্চয়, আমি ভালো নেই। ভাঙাচোরা একটা মানুষে পরিণত হয়েছি।

হেমন্তের মিষ্টি দুপুরবেলায় এলিফ্যান্ট রোডে স্রোতের মতো গাড়ি চলেছে, ফুটপাতে লোকজন, দোকানপাটে ভিড়। এত লোকজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা বলা যায় নাকি? বললাম—চলো, বসি কোথাও।

সামনেই একটা স্ন্যাক্‌সের দোকান। ওখানেই গিয়ে বসলাম। যেন সেই কত বছর আগের অভ্যাসবশতই গিয়ে বসলাম। কত বছর আগে? তা এক যুগ হয়ে গেল তো বটেই। যুগান্তর। মিতা, মধুমিতা, আর আগের মতো নেই। আমিও নেই আগের মতো। মিতা হয়ে উঠেছে রীতিমতো সুন্দরী আকর্ষণীয়া যুবতী, আর আমি বিধ্বস্ত। চাকরি থেকে অবসর নিয়েছি আমি। এলিফ্যান্ট রোডে আমাদের যে-অফিস ছিল, সে-অফিস উঠে গেছে।

মিতাকে সেই আগের দিনের মতো বললাম—তুমি কী খাবে, বলো?

আগের মতোই খাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ নেই ওর। আগের মতোই কথা বলে যাচ্ছে অনবরত।

আমার কোনো ব্যাপারে জিগেসই করল না। নিজের কথাই বলে যেতে লাগল—জানেন, আমি বিয়ে করেছি। খুব ভালো ছেলে। আমাকে ছাড়া জানে না কিছু। সব-কিছু আমার ওপরে। জানেন, আমি প্রেগ্‌ন্যান্ট। কয়েক মাস পরে বাচ্চা

হবে আমাদের। এদিকে এসেছিলাম ব্যাংকে। মাঝখানে গ্যাপ গেছে। এবারে এম.এ.টা দিচ্ছি। ইডেন থেকে। ইংরেজিতে। অনর্গল ইংরেজিতেই কথা বলছিল মধুমিতা।

পাশের টেবিল থেকে মহিলা দু-তিনজন উঠে গেলেন। কেনাকাটা করতে এসেছিলেন নিশ্চয়ই এলিফ্যান্ট রোডে। প্রত্যেকের হাতে ছোট-বড় প্যাকেট। দোকানটা একটু ফাঁকা হয়ে যাওয়ায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। আগের মতোই মিতা চারপাশকে কিছুমাত্র কেয়ার না-করে কথা বলে যাচ্ছিল।

আমি কিরকম বোকার মতো হয়ে গিয়েছিলাম। কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এমনিতে মিতাকে সব সময়ই আমার আশ্চর্য রহস্যময়ী মনে হয়েছে। মিতাকে দেখলে সব সময়ই আমি নার্ভাস হয়ে যেতাম কিরকম। কিরকম মোহমুগ্ধ। আমার ভেতরে ঢেউয়ের পর ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠত। কিন্তু এখন সেরকম না। সেই আবেগ নেই আর। দেখা হয়েছে—হয়েছে। তবু কি ভেতরে একটু নড়ে উঠিনি? আগের সেইসব উদ্দাম উত্তাল দিনগুলোর কথা মনে করেই কী? বর্তমান না—স্মৃতিই কি নড়িয়ে দিয়েছে আমাকে?

মিতাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছিল *কবিতাপত্র* নামে এক লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক। বাড়িতে না। আমার অফিসে। আমারই বয়েসি সম্পাদক। কোত্থেকে কোত্থেকে উঠতি তরুণ-তরুণী লেখক তার জুটে যায়—কে জানে।

শোয়েব সিদ্দিকি বলেছিল—ফয়সাল রহমানকে তো আর পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না। দেখেই চিনেছ নিশ্চয়। আর এই মেয়েটির নাম মিতা। মধুমিতা নাম। মধু ঝরিয়ে দিয়েছি আমি। এখন, শুধু মিতা। কবিতা লেখে। যশোর থেকে সদ্য এসে ঢাকায় কলেজে ভরতি হয়েছে। বাংলাদেশের কবিতার সেরা ক্রিটিক তো আপনিই। ওর কবিতা আপনি একটু দেখে দেবেন। আর এ সংখ্যায় আপনি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা সম্পর্কে লিখবেন বলেছিলেন। লেখাটা পাইনি। আপনার প্রবন্ধই লিড্ আর্টিকেল হবে। আর মিতাকে একটা ব্রেক দিতে চাই। আপনার প্রবন্ধের পরেই ওর একগুচ্ছ কবিতা। ওর কবিতাগুলো নির্বাচন করবেন আপনি। শুধরে দেবেন।

রাগ হয়েছিল আমার। আমার কি অত সময় আছে?—বলতে গিয়েও পুঁচকে কলেজে-পড়া মেয়েটির দিকে তাকিয়ে নির্মম হতে পারিনি।

তারপর থেকে মিতা নিয়মিত চলে আসত। আমি ওকে বলে দিয়েছিলাম। লাঞ্চ আওয়ারের একটু আগে চলে আসত। ওকে নিয়ে এক-একদিন এক-এক জায়গায় চলে যেতাম। রেস্তোরাঁর নিভৃতে। অফিসে বিষয়টা একটু খারাপই দেখাচ্ছিল সহকর্মীদের চোখে।

মজিফুর রহমান একদিন আমার অনুপস্থিতিতে বলেই বসেছিলেন—এই মেয়ে, রহমান শাহেবের মেয়ের বয়েসী তুমি। ওনার সঙ্গে তোমার এত মাখামাখি কিসের?

আরো কী বলেছিলেন, জানি না। সম্ভবত আরো কড়া কথাই বলেছিলেন। মিতার মুখ থেকেই শুনেছিলাম। মনে হয়েছিল, সব কথা বলেনি আমাকে। বলতে পারেনি।

শফিকুল ইসলাম বলেছিলেন আমাকে—রহমান শাহেব, যে-মেয়েটা আপনার কাছে রেগুলার আসে তাকে কিন্তু খুব ভালো মনে হয় না আমার।

মফিজুর রহমানের ব্যাপারটা ঈর্ষাপ্রসূত মনে হয়েছিল আমার, শফিকুল ইসলাম কিন্তু ভারি ভালোমানুষ—আর সিরিয়াস। কিন্তু তখন কিশোরী একটি মেয়ে আমূল আচ্ছন্ন করে রেখেছে আমাকে এমনভাবে যে আমি ইচ্ছা করলেও ফাঁশ ছাড়াতে পারিনি।

মিতার সারল্য, কৈশোরক যৌনতা ও যৌন-আগ্রহ, সাহস আমাকে মিসমার করে দিয়েছিল। কী দুঃসাহসিকা ছিল ঐটুকু মেয়ে—একগুচ্ছ রক্ত-লাল গোলাপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল একদিন আমার অফিসে। কী দুঃসাহসিকা—স্ট্র দিয়ে কোল্ড ড্রিংক খেতে খেতে একদিন আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ইঙ্গিতমূলক দুষ্টুমির হাসি হাসছিল। ভেসে গিয়েছিলাম আমি।

এমনকি যে-আমি শুধুমাত্র কবিতার সমালোচনাই লিখি, সেই আমি আবেগে ভেসে গিয়ে একগুচ্ছ কবিতাও লিখে ফেলেছিলাম। শোয়েব সিদ্দিকি তাঁর কবিতাপত্র প্রকাশন থেকে আমার সেই কবিতাগুলো বই-আকারে বের করে দিয়েছিল। বইএর নাম দিয়েছিলাম *জন্ম-মৃত্যু তুমিই আমার*। কেউ কেউ বইটি পছন্দও করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন খোদ কবি শামসুর রাহমান। একটি দৈনিক পত্রিকার কলামে *জন্ম-মৃত্যু তুমিই আমার* কবিতার বইটি সম্পর্কে তিনি এরকম লিখেছিলেন : 'ফয়সাল রহমানকে আমরা জানতাম কবিতার সমালোচক হিসেবে, তিনি-যে এমন প্রাণবান কবিতা লিখবেন তা ভাবাই যায়নি।' স্বীকার করতেই হবে, মিতা, মধুমিতা, আমার মতো গদ্যলেখককে 'কবি' বানিয়ে দিয়েছিল।

অফিসে আসা খারাপ দেখাচ্ছিল বলে মিতা ফোন করলে অফিস-আওয়ারের পরে ওকে নিয়ে বসতাম কোথাও কোথাও।

শেষ-পর্যন্ত একটা অফিসিয়াল ট্যুরের ব্যবস্থা করলাম। কক্সবাজারে। মিতার সঙ্গে সেই তিন দিন জীবনে কী ভুলব?

কক্সবাজারে একটা হোটেলে উঠেছিলাম আমরা। রোজ সকাল-সন্ধ্যা সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়াতাম। সমুদ্রস্নান করতাম একসঙ্গে। ঝাউগাছের নিচ দিয়ে হেঁটে যেতাম হাত-ধরাধরি করে। মিতা তার অগণন চুমোয় চুমোয় দিনরাত্রি অধীর করে রেখেছিল আমায়। তার সেই উন্মুখ খোলা মোটা ঠোঁটের আহ্বান এড়াতে পারিনি আমি। মিতা ছিল চুম্বন-পাগল। বিবাহিত পুরুষ আমি। ইচ্ছা করলেই আমি আরো এগোতে পারতাম। মিতা তার সর্বস্ব সমর্পণ করে দিয়েছিল আমাকে—কিন্তু আমি ইচ্ছা করেই নিজেকে এগোতে দিইনি। কেন বেধেছিল আমায়, আমি জানি

না। কিন্তু মিতার প্রতি আমার টান ঐ বঙ্গোপসাগরের ঢেউয়ের মতোই ছিল তুমুল আর উদ্দাম আর অবিশ্রাম।

অনেকক্ষণ ধরে বকবক করে যাচ্ছিল মিতা। একথা-সেকথা। সেই কিশোরী মেয়েটি এখন ভরা যুবতী। কিন্তু তার ভেতরকার কিশোরীটা যেন জেগেই আছে আজো। আমি কি খানিকটা আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিলাম আবার? আমি কি আচ্ছন্নতামুক্ত হয়েছিলাম পুরোপুরি?

কবিতা লিখেছিলাম সেই একবারই—জীবনের সেই কয়েকটি আশ্চর্য দিনরাত্রিতে। আমাদের সেই অফিস উঠে গেছে। এখন সেখানে উঠেছে একটি বহুতল বাড়ি। মফিজুর রহমান হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা গেছেন। শফিকুল ইসলাম কুমিল্লায় তাঁর পৈতৃক বাড়িতে চলে গেছেন। সহকর্মীরা অন্যেরাও ছিটকে পড়েছে কে কোথায়। জাহানারা বেগম তো ঐ অফিসে থাকতেই মারা গিয়েছিলেন। কল্যাণী রায় বোধহয় চলে গেছে অন্য কোনো চাকরিতে। আজ আমি আর কবিতা লিখি না।

মিতা উঠল একসময়। বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি এলিফ্যান্ট রোডের গাড়ি আর জনস্রোতের মধ্যে অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম।

* * *

এলিফ্যান্ট রোডের ফুটপাত ধরে মিতা চলে যাচ্ছিল।

আমি অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে ওকে যতক্ষণ দেখা যায়, দেখলাম। ভিড়ের ভেতরে একসময় মিতা আমার চোখের আড়ালে চলে গেল।

মিতা সত্যি কথা বলে না—এরকম, অন্তত একটা পর্যায়ে গিয়ে, বরাবরই সন্দেহ হতো আমার। এখনো সে-সন্দেহ গেল না। এখন, বেলা একটা বেজে গেছে। ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেছে। ব্যাংকের কথা বলে উঠল যে, সে কী সত্যি? ওর অবশ্য যা ধাঁচ, ব্যাংকের বন্ধ দরোজাও কথার জাদু দিয়ে খুলতে পারে। যে-জাদু করেছিল আমাকে তা অবশ্য কেটে গেছে। কিন্তু কেটেছে কী? ওকে যদি বলতাম আজো হয়তো থেকে যেত আমার সঙ্গে সারাদিন—কিন্তু আমার কেন-যেন ইচ্ছা হলো না ওরকম আমন্ত্রণ জানাতে। আমি কী ভয় পেলাম?

এলিফ্যান্ট রোডের যে-গলি থেকে আমি বেরিয়ে এলাম, তার মাথায় আমার ছেলের বাড়ি। বাড়ি মানে ভাড়াটে বাড়ি। এতক্ষণ নাতিকে আদর করে এসেছি। বউমা আমার খুব ভালো। তার বাবা নেই। আমাকেই 'আব্বা, আব্বা' বলে। এই ছেলেকেই এতটুকু রেখে আমার প্রথমা স্ত্রী, সোমা, আমেরিকায় চলে গেছে। ডিভোর্স নিয়ে। মিতার সঙ্গে আমার মাখামাখির খবর তার কানেও গিয়েছিল। আমার অজান্তে তার এক সহকর্মী মহিলাকে নিয়ে মিতা যে মেয়েদের হোস্টেলে যাবে, সেখানে চলে গিয়েছিল সোমা। তাকে মারতে বাকি রেখেছিল শুধু। কর্তৃপক্ষকে মিতার স্বভাবচরিত্র সম্পর্কে এমনভাবে বলেছিল যে, তারা হোস্টেল

থেকে মিতাকে বিদায় দিতে বাধ্য হয়েছিল। মিতা একটা বিখ্যাত এন.জি.ও.র বড় পদে চাকরি করত। তবে এটা ঠিক, মিতার জন্যে সে আমাকে ডিভোর্স দ্যায়নি। বোঝা যায় না কিছু। আমাকে স্বামী হিশেবে ভালোবাসত বলেই না সে সহকর্মীকে নিয়ে মিতাদের হোস্টেলে ছুটে গিয়েছিল। কী যে হলো কয়েক বছর পরে। আমাকে ছেড়ে পাড়ি জমায় আমেরিকায়। কানাঘুষোয় শুনেছি, সেখানে তার এক পূর্ব-প্রেমিককে বিয়ে করেছে। সোমা চলে যাবার পরে আমি বিয়ে করেছি আবার। সেও তো হয়ে গেল অনেকদিন। রানির ছেলেপুলে হয়নি। আমার ছেলেটিকেই নিজের ছেলের মতো দ্যাখে। নাতিকে অসম্ভব ভালোবাসে। আজ টিফিন-ক্যারিয়ার ভরে ওদের জন্যে খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে। সেই খাবারই তো দিতে এসেছিলাম আমি। ফোনে বউমাকে সকাল বেলাই রান্নাবাড়া করতে বারণ করে দিয়েছিল।

মিতাকে কি এতসব বলা যায়? রিটায়ার করেছি, ছেলে বিয়ে করেছে, ভালো চাকরি করেছে, নাতি হয়েছে।—মিতা এসব শুনতেও চাইল না। কোনোদিনই শুনতে চায়নি। শুধু আমার মধ্যেই সে যেন কী-এক আগুন দেখে ঝাঁপ দিয়েছিল। শুধু আমার মধ্যেই।

খাওয়া-শোওয়া—সব এখন আমার ঘড়ি ধরে করতে হয়। ডাক্তারের নির্দেশ। দুপুরে সাড়ে বারোটার সময় খাই রোজ। অনিয়ম করি না। আজ সব ওলোটপালোট হয়ে গেল। যে-মিতাকে নিয়ে সারাদিন কাটাতে পারতাম, হয়তো হেমন্তের দুপুর অন্যরকম একটা গল্প রচনা করতে পারত, কিন্তু তা হলো না। হলো না পুরোটা। আমিই কেমন-যেন হতে দিলাম না।

এত বেলা হয়েছে। গোসল করিনি, খাইনি এখনো—সে-সব কিছুই মনে থাকল না আমার। এসব ভুলে গিয়েছিলাম। হেমন্তের দুপুরবেলার রৌদ্রে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরলাম। বুকের ভেতরে কোথায় একটা ডাকটিকিটের মতো বেদনা হচ্ছিল। হেমন্তের গল্পটি কি আমি পুরোটা ভেঙে দিতে পেরেছি। আধ-ভাঙা একটা আনারের ভেতর থেকে রক্ত-লাল দানাগুলো দেখা যাচ্ছিল।

বাড়িতে ঢুকতেই রানি বলল—এত দেরি হলো? কী-যে চিন্তা হচ্ছিল আমার। তুমি তো এত দেরি করো না কখনো? শরীর ভালো আছে তো?

ম্লান হেসে আমি বললাম—না, না, শরীর ভালো আছে।

রানি বলল—ভাত বাড়াই আছে। তাড়াতাড়ি গোসল করে নাও। আর শোনো, টেলিভিশন থেকে তুমি বেরোনোর পরেই ফোন করেছিল।

এই সময়ই টেলিফোনটা বেজে উঠল। রানি গিয়ে ফোন ধরল। বলল—হ্যাঁ, উনি ফিরেছেন। কথা বলুন। আমাকে বলল—টি.ভি. থেকে ফোন তোমার।

আমি ফোন ধরলাম।

—স্যার, আমি টি.ভি. থেকে আবুল হাশিম বলছি। প্রডিউসার। শিল্প-সাহিত্য অনুষ্ঠানে আপনাকে একটু আসতে হবে, স্যার।

আমি বললম—ঠিক আছে আসবো। কবে? আর বিষয়টা কী?

আবুল হাশিম বললেন—আগামী বুধবার। সন্ধে সাতটায় রেকর্ডিং। আমরা এবার বিষয় হিশেবে বেছে নিয়েছি 'পুরোনো দিনের কথা'। এটাই আমাদের শিরোনাম। অনুষ্ঠান উপস্থাপন করবেন শামসুজ্জামান খান। সোহরাব হোসেন বলবেন 'পুরোনো দিনের গান' নিয়ে। ড. মনিরুজ্জামান বলবেন 'পুরোনো বাংলা গদ্য' নিয়ে। আপনার বিষয় 'পুরোনো বাংলা কবিতা'। সঙ্গে গান, আবৃত্তি, পাঠ এসব থাকবে। সব-মিলিয়ে পঁচিশ মিনিটের অনুষ্ঠান। আপনাদের আলোচনাই কিন্তু প্রধান বিষয়।

বললাম—আচ্ছা।

আবুল হাশিম আবার বললেন—বুধবার সন্ধে সাতটা, স্যার। আপনার আলোচনার বিষয় 'পুরোনো বাংলা কবিতা'। গেটে পাস দেওয়া থাকবে। সময়মতো আসছেন তো স্যার?

বললাম—আসব।

[২০০১]

প্রফেসর আলি আকবরের একদিন

সাড়ে ন-টায় পৌঁছনোর কথা, সওয়া ন-টাতেই পল্টন স্কুল এ্যান্ড কলেজের গেটে পৌঁছে গেলেন প্রফেসর আলি আকবর। ভিড় ছিল রাস্তায়, কিন্তু যানজট ছিল না।

কতদিন পরে এত সকালে রাস্তায় বেরোলেন। সকালের ফুরফুরে বাতাস, সোনালি মিষ্টি রোদ কী যে ভালো লাগল তাঁর।

এখন তো তাঁর অবসর জীবন। বেলা দশটার আগে তাঁর আলসেমি ভাঙে না। বেলা আটটার আগে ঘুমই ভাঙে না। দাড়িও কাটেন না রোজ। ইচ্ছাই হয় না। পাকা দাড়ি গজিয়ে বিচ্ছিরি দেখায়, রাজিয়া দাড়ি কামার কথা বারবার বলে, কিন্তু কোনো চড়াই বোধ করেন না আলি আকবর। বাড়িতেই তো থাকা সারাদিন, জনসমক্ষে তো বেরোচ্ছেনই না, বাড়িতেও আসে না এমন কেউ, কী দরকার দাড়ি কাটবার। প্রাত্যহিক বাজার খালেকই করে। মাসে একদিন তিনি কারওয়ান বাজারে যান খালেককে নিয়ে। রাজিয়ার চিরদিন একেবারে ভোররাতেই ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস।। তাছাড়া আল্লার রহমতে ফরহাদ এখন চাকরি পেয়ে গেছে ব্যাংকে। সকালবেলা উঠে তার নাশতা, দুপুরের খাবার, এসব তৈরি করে দিতে হয়। শান্ত, পরিতৃপ্ত জীবন এখন আলি আকবরের। রাজিয়া তার বাপ-মার একমাত্র সন্তান। একটা পাঁচতলা বাড়ির ভাড়া তিনি পান। পুরোনো আমলের বাড়ি। ঝিকাতলায়। তাও যে ভাড়া পাওয়া যায়, তাতে স্বচ্ছন্দে চলে যায় তাঁদের জীবন। একমাত্র সন্তান ফরহাদের জন্যেই চিন্তা ছিল, ফরহাদ এখন ব্যাংকে চাকরি পেয়ে গেছে। ব্যস, আর-কোনো ভাবনা নেই, প্রফেসর আলি আকবরের অবসরপ্রাপ্ত জীবন এখন নদীর পানির ওপর নৌকোর মতো মসৃণভাবে চলেছে।

পল্টন স্কুল এ্যান্ড কলেজের গেটে নামলেন প্রফেসর আলি আকবর। এখানে তিনি আগে কখনো আসেননি। এত বড়! গেটের পাশে ছোট ঘর একটি। গার্ডের জিজ্ঞাসু চোখে তাঁর দিকে তাকাতেই আলি আকবর বললেন—গেটে তো লোক থাকার কথা ছিল। আমি ইন্টারভিউ নিতে এসেছি।

দারোয়ান বলল—দোতলায় চলে যান। একেবারে পুবদিকে হেডমাস্টারের রুম।

মূল বিল্ডিঙের সামনে এতটা ফাঁকা জায়গা! ঢাকা শহরে এখন তো কল্পনাই করা যায় না। রীতিমতো ফুটবল গ্রাউন্ডের মতো। খুব ভালো লাগল প্রফেসর আলি আকবরের। স্কুলে-কলেজে পড়ে যে-সব ছেলে মেয়ে, খোলা জায়গা হলে তাদের

মানসিক প্রসারতাও যেন বেড়ে যায়। ঘিঞ্জি জায়গা মনের ওপর প্রভাব ফেলবে না একটা?

ভেতরটা এখন একদম ফাঁকা। জনসমাগম নেই। অনেকদিন বাড়ি থেকে না-বেরোতে-বেরোতে এই একটা বদভ্যাস হয়েছে যে রীতিমতো টেনশন হচ্ছিল আলি আকবরের সময়মতো পৌঁছতে পারবেন কিনা তাই নিয়ে। আজকাল অল্পতেই টেনশন হয়। ফরহাদ ব্যাংক থেকে ফিরতে দেরি হলে টেনশন হয়। রাজিয়াই ঝিকাতলার বাড়ির ভাড়া নিয়ে আসে খালেককে নিয়ে। এসব কাজ পারেন না আলি আকবর। যে-দিনকাল, ভাড়ার টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরতে রাজিয়ার দেরি হলে দুশ্চিন্তায় একেবারে অস্থির হয়ে পড়েন আলি আকবর। সেজন্যে আজকাল মাঝে মাঝে রাজিয়ার সঙ্গে তিনিও ঝিকাতলায় চলে যান। বোঝেন না কিছু। শুধু সঙ্গে থাকা।

হেডমাস্টার শাহেব দাঁড়িয়ে গেলেন প্রফেসর আলি আকবরকে ঢুকতে দেখে। বললেন—স্যার চলে এসেছেন? বসুন, বসুন।

প্রফেসর আলি আকবর বললেন—হ্যাঁ, বহুদিনের অভ্যেস তো। সময় এদিক-ওদিক করতে পারি না।

হেডমাস্টার বললেন—এটাই তো আপনাদের জেনারেশনের গুণ, স্যার। পরে যে কী হবে, তা-ই ভাবি।

বেশি বয়েস না হেডমাস্টারের। পঞ্চাশও হবে না। কিন্তু কাজের লোক যে দেখেই বোঝা যায়। সাফারি-পরা। সুদর্শন।

হেডমাস্টারের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই এলেন প্রফেসর ইদ্রিস মিয়া। আলি আকবর একদা সহকর্মী। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিষদের একজন সদস্য। তিনিই এঁদের সঙ্গে আলি আকবরের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন।

প্রফেসর ইদ্রিস মিয়াও ঢুকেই বললেন—ও, স্যার এসে গেছেন। ভালো আছেন তো, স্যার?

—এই আছি। বললেন আকবর আলি—কলেজ চলছে কেমন?

—শুনলাম তো নতুন প্রিন্সিপাল এসেছেন— বললেন আকবর আলি।

—হ্যাঁ। ভালোই চালাচ্ছেন। তো স্যার, আমাদের স্কুলটা তো ঢাকার নাম-করা স্কুলের একটি। বছরখানেক হলো কলেজ সেকশনও খোলা হয়েছে—আপাতত উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত। এখন সব ডিপার্টমেন্টেই আমরা নতুন শিক্ষক নিচ্ছি। আমাদের স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা-ই এম. এ. পাশ, স্যার। বাংলার নতুন একজন অধ্যাপক নেওয়া হবে। আর একজন আছেন পার্ট-টাইম, আমাদের স্কুলেরই শিক্ষক, যদি আপনি মনে করেন, ওঁকেও ফুল-টাইম করে নেওয়া হবে। ইদ্রিস মিয়া বলছিলেন।

হেডমাস্টার বললেন—স্যার, একটু চা বলি।

আকবর আলি বললেন—এখন আর যখন-তখন চা খাই না। এগারোটা সাড়ে এগারাটায় হলে চলবে—

—তাহলে স্যার, আমরা গিয়ে বসি—হেডমাস্টার বললেন।

সবাই উঠে গিয়ে পাশের একটি রুমে বসলেন। লম্বা একটি টেবিল। তার এক প্রান্তে বসলেন প্রফেসর আলি আকবর। তারপর একটি চেয়ার খালি রেখে হেডমাস্টার শাহেব। ওঁরা বসতে বসতে পরিচালনা-পরিষদের আরো দু-তিনজন সদস্য এলেন। ইদ্রিস মিয়া পরিচয় করিয়ে দিলেন সবার সঙ্গে।

সবাই খুশি। বললেন—স্যার, আপনি যে কষ্ট করে এসেছেন—এতে আমরা সবাই খুব খুশি হয়েছি। আপনার মতো নামী শিক্ষককে যে আমরা পেলাম, এ আমাদের জন্যে খুব ভালো হয়েছে।

হেডমাস্টার শাহেব সবাইকে একটি ছাপা কাগজ ধরিয়ে দিলেন। তাতে প্রত্যেক প্রার্থীর নাম, পরীক্ষার ফলাফল ইত্যাদি লেখা। তারপরে প্রশ্নোত্তরের জবাব, আচার-আচরণ ইত্যাদি মিলিয়ে নাম্বার দিতে হবে—সব-মিলিয়ে কী মন্তব্য, তাও।

প্রফেসর ইদ্রিস মিয়া বাইরে গিয়ে দেখে এলেন একবার, তারপর শুরু করতে বললেন। এই স্কুল-কলেজের তিনি যে একজন বেশ প্রভাবশালী সদস্য—সেটা বোঝা গেল। কলেজে কিন্তু তা বোঝা যেত না। একই মানুষ ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় কি ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে? দাস কোথাও, কোথাও প্রভু। আবার কোথাও দাসও না, প্রভুও না। নাকি মানুষের মধ্যে কোনো ফারাক নেই, মূলে সব মানুষই এক।

রুমটা বেশ বড়। আলোকোজ্জ্বল। প্রফেসর আলি আকবর আজকাল বাড়ি থেকে বেরোন কম। যখনই বাইরে বেরোন, থাকেন সুসজ্জিত, টাই না-পরে শুধু শার্ট পরে বের হন না, যে-কেউ তাঁকে দেখলেই বুঝতে পারে তিনি একজন সম্ভ্রান্ত মানুষ। বাড়িতে তিনি থাকেন এলোমেলোভাবে, ফেলে-ছড়িয়ে—এই নিয়ে রাজিয়ার খোঁটা শুনতে হয়। বাইরে তিনি একেবারে টিপটপ। প্রফেসর আলি আকবরের ছেলেবেলা কেটেছে ভীষণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে, আর্থিক দুরবস্থায়, বিয়ের পরে তিনি সচ্ছলতার মুখ দেখেছেন। এবং ক্রমশ তিনি তার মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। রিটায়ার করার পরে তাঁর কী হয়েছে—আবার তাঁর মধ্যে একটা গা-আলগা ভাব দেখা দিয়েছে।

রাজিয়াও একসময় সেটা লক্ষ্য করেছেন। আজকাল মাঝে মাঝে বলেন—কী হয়েছে তোমার বুঝি না। রিটায়ার করার পরে আবার যেন তুমি সেই বিয়ের সময় যেমন দেখেছি, তেমনি গাঁইয়া হয়ে যাচ্ছ। তুমি তো এরকম ছিলে না—

প্রফেসর আলি আকবর চুপ করে শোনেন।

রাজিয়া বলেন—বসে বসে থেকে তুমি কিরকম ঝিম মেরে যাচ্ছ। তুমি একটা কাজ-টাজ খোঁজো তো—

তা ঠিকই। কাজ করলে, কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে, হয়তো অনেক পুরোনো দিনের কথা এমন করে যখন-তখন মনে পড়ে যেত না।

প্রথম প্রার্থী ঢুকছে।

হেডমাস্টার বললেন—স্যার, আপনিই প্রশ্ন করবেন—

ইদ্রিস মিয়া সাধারণভাবে নাম-ধাম জিগেস করে প্রফেসর আকবর আলির দিকে তাকালেন।

প্রফেসর আকবর আলি বললেন—আচ্ছা, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকাররা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে কয়েকটি যুগে ভাগ করেছেন। এই যুগগুলো কী কী? এগুলো কি তুমি মানো, মানে স্বীকার করো কিনা?

প্রার্থী নিরুত্তর।

আকবর আলি বললেন—ঠিক আছে, তোমাকে অন্য একটি প্রশ্ন জিগেস করি। সৈয়দ আলাওলের প্রধান কাব্যগ্রন্থটির নাম কি?

—*পদ্মাবতী*। ছেলেটি বলল।

—এটা কি তাঁর নিজের লেখা?

—না।

—তবে কার লেখা? তাহলে বলছো কেন সৈয়দ আলাওলের বইএর নাম *পদ্মাবতী*?

ছেলেটি আর জবাব দিতে পারে না।

বরং পরবর্তী প্রার্থী—একটি তরুণী—অনেক সাফ এবং সাবলীল জবাব দিল। অনেক স্বচ্ছ।

সাড়ে-এগারোটাও পেরিয়ে গেল—প্রফেসর আলি আকবরের চা খাবার নির্ধারিত সময়—সওয়া-বারোটায় চা-বিস্কুট এল।

ইদ্রিস মিয়া নিজের ব্যাগ থেকে আলাদা একটা বিস্কুটের প্যাকেট বের করলেন। বললেন—এই বিস্কুটটা, স্যার, ইন্দোনেশিয়ার—চমৎকার বিস্কুট।

হেডমাস্টার—অন্য মেম্বাররা—মাঝে মাঝে বেরিয়ে যাচ্ছেন। চায়ের পরে দু-একজন স্থায়ীভাবেই চলে গেলেন, মনে হলো।

একজন প্রার্থিনীকে দেখে একটু চমকে গেলেন প্রফেসর আলি আকবর। রেজাল্ট ভালো। জবাবও দিল ভালো। তাঁরই ছাত্রী। মনে পড়ল, তীক্ষ্ণ ফর্শা মেয়েটি কলেজেও ছিল ব্রিলিয়ান্ট।

হেডমাস্টার ছিলেন তখন। একজন পরিচালন-পরিষদের সদস্যও।

বললেন—আমাদের ছাত্রী। খুব ভালো। দেখলেন তো? আপনারা প্রশ্ন করুন—

মেম্বার শাহেব ঠিক প্রশ্ন করলেন না, পারিবারিক পরিচয়াদি জিগেস করলেন। পুরোনো ঢাকায় থাকে মেয়েটি, কুমারী, কলেজে রোজ আসতে অসুবিধে হবে কিনা জেনে নিলেন।

প্রফেসর আকবর আলির মনে হলো, তাঁর এই মেধাবী ছাত্রীটির এই চাকরিটি হলে তিনি খুব সুখী হতেন। মেয়েটি সত্যিই যোগ্য। শুধু সবগুলো প্রশ্নেরই ত্বরিত যথাযথ জবাবই দ্যায়নি—মেয়েটি বেশ সভ্যভব্য। এই ধরনের প্রার্থী এঁদেরও পছন্দসই বলেই মনে হলো। আলি আকবর প্রকাশ্যেই একটু জোরই দিলেন মেয়েটিকে নেওয়ার ব্যাপারে।

লাঞ্চ ব্রেক হলো দুটোরও পরে। সবাই মিলে নিচে যাওয়া হলো। নিচে, পাশে অফিস বিল্ডিংয়ের একতলায় খাওয়ার আয়োজন। রুম থেকে বেরিয়ে দেখলেন আলি আকবর, একতলা-দোতলায় প্রচুর ভিড়।

প্রফেসর ইদ্রিস মিয়া বললেন—আজ অনেকগুলো ইন্টারভিউ নিয়ে নিচ্ছি, স্যার। তাও আজ শেষ হবে না, মনে হচ্ছে। ওপরে সব রুমে রুমে ইন্টারভিউ চলেছে—বলে তৃপ্তির আর গর্বের মিশোনো হাসি হাসলেন ইদ্রিস মিয়া। কলেজে এরকম তাঁকে কোনোদিন স্বতস্ফূর্ত হাসি হাসতে দ্যাখেননি আলি আকবর। মূল কর্মক্ষেত্রের জোয়ালের বাইরে বেরোলেই বোধহয় এরকম স্বতস্ফূর্ত আনন্দ হয় মানুষের।

লাঞ্চের পরে আবার ইন্টারভিউ নিতে বসতে বসতে তিনটে পেরিয়ে গেল।

হেডমাস্টার বললেন—স্যার, এখনো অনেক বাকি। একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে—

আলি আকবর বললেন—ঠিক আছে—

লাঞ্চের পরে আর-একটি মেয়েকে পাওয়া গেল—যেরকম রেজাল্ট ভালো, সেরকম তীক্ষ্ণ।

আলি আকবর মেয়েটির সামনেই বললেন—এ তো ইউনিভার্সিটিতে পড়লে ফার্স্ট ক্লাস পেত, কলেজে পড়েছে বলে ওকে ফার্স্ট ক্লাস দেওয়া হয়নি।

বিবাহিতা মেয়েটি। বেশিদিন বিয়ে হয়নি, বোঝাই যায়।

হেডমাস্টার এক ফাঁকে বলেছিলেন—ছেলেদের সিলেক্ট্ না-করলেই ভালো হয়, স্যার। বড্ড পলিটিক্স্ করে।

আলি আকবর হেসে বলেছিলেন, আপনি চাইলেও কী তা করা যেত? নমুনা দেখছেন না এক-একটি?

সত্যি, আজকের অভিজ্ঞতায় তাঁর ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা লেখাপড়ায় এগিয়ে গেছে অনেক।

কিন্তু—একটু খচখচ করছে তাঁর ভিতরে। তাঁর ছাত্রীটি যথেষ্ট ভালো। কিন্তু লাঞ্চের পরের প্রার্থিনী আরো ভালো নিঃসন্দেহে। কী করবেন তিনি? এক ফাঁকে তাঁর দ্বিধাদ্বন্দ্বের কথা পরিষ্কারই বললেন।

প্রফেসর ইদ্রিস মিয়া আর হেডমাস্টার আর একজন মেম্বার তিনজনই বললেন, আকবর আলি যে-সিদ্ধান্ত দেবেন, সেটাই চূড়ান্ত, সেটাই মানা হবে। এর ফলেই, তাঁকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী বলাতেই, ভারি বিমর্ষ হয়ে গেলেন প্রফেসর আলি আকবর। নিজের ছাত্রী, যে যথেষ্ট মেধাবী, আর অন্য-একটি প্রার্থিনী, আরো মেধাবী, আরো যোগ্য—কী করা যায়? ছাত্রীটি যদি আগে তাঁকে জানাত, তাহলে হয়তো একটু পক্ষপাতিত্ব করলেও বিবেকের একটা যাতনা তিনি ভোগ করতেন না।

বিকেলের চা খেতে হলো তাঁকে একা।

আর তখনই একটা ঘটনা ঘটল। এমন একটি ঘটনা, যার জন্যে তিনি একটুও প্রস্তুত ছিলেন না।

রোগা বাচ্চা একটি মেয়ে এসেছে। দেখে মনেই হয় না, এম.এ. পাশ করেছে। দেখে মনে হয়, কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে উঠেছে সবে।

নিতান্তই সহজ প্রথম প্রশ্নের উত্তর তো দিতেই পারল না, প্রশ্ন শুনেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

প্রশ্ন করবেন কী, মেয়েটির কান্না থামেই না।

ফাঁকা ঘরে কাঁদছে মেয়েটি, কে আবার কী মনে করে—একথাও ভাবলেন আলি আকবর। তারপর তাঁর ধমকে কান্না থামাল। আরো একটি প্রশ্নেরও কোনো উত্তর দিতে পারল না।

বলল—স্যার, আমি কোনো জবাব দিতে পারব না, কিন্তু আমার চাকরিটা খুব দরকার। ভীষণ দরকার, স্যার, ভীষণ দরকার।

সারাদিন ধরে ইন্টারভিউ নিতে নিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন প্রফেসর আলি আকবর। মেয়েটি যেন চকিতে তার সব ক্লান্তি শুষে নিয়েছে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তিনি জিগেস করলেন—কেন?

মেয়েটি বলল—স্যর, আমার আব্বা রিটায়ার করেছেন। যে-টাকা পেয়েছিলেন, সেটা দিয়ে আমাদের পড়িয়েছেন আর চালিয়েছেন এ্যাদ্দিন। আমরা তিন বোন, আমিই বড়, আর এক ভাই। ভাই সবার বড়। ভাই বিয়ে করে বউ নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে। আব্বা আর চালাতে পারছেন না কিছুতেই—বাড়ি ভাড়া বাকি পড়ে গেছে কয়েক মাসের—মেয়েটা আবার কেঁদে ফেলল।

আলি আকবর খোলাখুলি বললেন—এখানে তোমার চাকরি হবে না। তোমার সঙ্গে যোগাযোগের কোনো উপায় আছে?—দেখি, অন্য কোথাও ব্যবস্থা করতে পারি কিনা—

মেয়েটি একটি ফোন নম্বর লিখে প্রফেসর আলি আকবরের হাতে দিল। বলল—স্যার, এটা আমাদের বাড়িওয়ালার ফোন নাম্বার। আপনি যদি দয়া করে—

—ঠিক আছে, ঠিক আছে—বলে মেয়েটিকে বিদায় দিলেন প্রফেসর আলি আকবর।

মনটা কেমন হয়ে গেল। অনেকদিন পরে বেরিয়ে যে-একটা ফুরফুরে আনন্দ হচ্ছিল, সেটা যেন দপ করে নিভে গেল।

রিপোর্টে ইডেন কলেজের মেধাবী ছাত্রীটিকেই তিনি নির্বাচন করলেন, সঙ্গে লিখলেন যদি কোনো কারণে ঐ প্রার্থী যোগ না-দ্যায় তাহলে যেন অবশ্যই নেওয়া হয় তাঁর সেই প্রিয় ছাত্রীটিকে।

বাড়িতে ফিরতে ফিরতে সন্ধে উতরে গেল। রাজিয়া রেগে গিয়েছিলেন খুব। একবার তাকে ফোন করা যায়নি? আসলে এমন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলেন সারাদিন, যে, ফোন করার কথা মনেই পড়েনি।

খুব ক্লান্ত অবসন্ন মনে হচ্ছিল। শরীর যেন ভেঙে আসছে। খেয়েদেয়ে রোজ ঠিক রাত দশটায় শুয়ে পড়া অভ্যাস তাঁর। আজো যথাসময়ে শুয়ে পড়লেন।

শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন রাজিয়া। কিন্তু ক্লান্ত অবসন্ন আলি আকবর ঘুম আসছিল না। মাথার নিচে হাত দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়েছিলেন তিনি। বাবা মারা গিয়েছিলেন তখন। বড়লোকের একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করে তিনি যখন নিজের আলাদা সংসার পেতেছিলেন, তখন মা আর ছোট ভাই-বোনগুলো কীভাবে সামলেছিল সব? তাঁর ছোট বোনটি তখন কলেজে বি.এ. পড়ছে। সে-ই তখন চাকরি করে সংসারটাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। চাকরিপ্রার্থী হয়ে কোথাও গিয়ে এম্নিভাবে অসহায়ভাবে কেঁদে ফেলেছিল নাকি? আজকের মেয়েটির মুখে তাঁর ছোট বোনের মুখটি মিশে যাচ্ছিল ॥

[২০০১]

গল্পকারকে নিয়ে একটি গল্প

অবক্ষয়ী। শূন্যবাদী। মানুষবিরোধী এক নিজস্ব কল্পনার জগতের অধিবাসী।

আবদুশ শহীদকে এরকমভাবে ব্যাখ্যা করেছেন একজন সমালোচক। বাংলাদেশের ছোটগল্প নিয়ে আজকের দৈনিক কাগজে এক আলোচনা বেরিয়েছে। তাতে আলোচক বাংলাদেশের ছোটগল্পে সাধারণ মানুষের স্থান দিয়েছেন যেমন গল্পকার তাঁদের নিয়েই প্রধানত লিখেছেন। গল্পকার আবদুশ শহীদ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন দু-এক লাইনে। মন্তব্যের শেষ বাক্যটি এরকম : 'যাঁর প্রথম গল্পের বইএর নামই *কল্যাণের মতো অসম্ভব* মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করাই যায় না। অথচ তাঁর কালেই মানুষ নিয়ে ভেবেছেন...' ইত্যাদি।

কতই-বা আর লেখা হয়েছে আবদুশ শহীদের গল্প নিয়ে। বেশির ভাগ আলোচনাতেই তাঁর সম্পর্কে এরকমই মনোভাব জানিয়েছেন সমালোচকরা।

গল্প লিখছেন আবদুশ শহীদ সে প্রায় চল্লিশ বছর হয়ে গেল। তাঁর প্রথম বই বেরিয়েছিল পাকিস্তান আমলে। গল্পগ্রন্থের নাম *কল্যাণের মতো অসম্ভব*। বাংলাদেশের জন্মের পরে আরেকটি গল্পগ্রন্থ বেরিয়েছে, *নটী বণিক ভিখিরি*। এই দুটি মাত্র গল্পগ্রন্থ তাঁর। সত্তরের দশকে শেষ বইটি বেরিয়েছিল। তারপর যে-সব গল্প লিখেছেন সেগুলো পড়ে আছে পত্রিকার পৃষ্ঠায়। উৎসাহী একজন সাহিত্যামোদী তরুণ তাঁর একটি গল্পের বই ছাপার উদ্যোগ নিয়েছিল। দু-তিন ফর্মা প্রুফও তিনি দেখে দিয়েছিলেন। তারপর ছেলেটি একদিন উধাও হয়ে গেল। প্রুফকপিগুলো আজো আছে তাঁর কাছে। গল্পকার হিশেবে বাংলাদেশে তাঁর একটা পরিচিতি আছে। প্রত্যেক বছর ঈদ-সংখ্যায় তাঁকে কিছু গল্প লিখতেও হয়। কিন্তু পাবলিশাররা গল্পের বের করতে চান না। অন্তত তাঁর ছোটগল্পের বই। দু-একজন প্রকাশক আবদুশ শহীদকে সরাসরি বলেছেন, 'উপন্যাস লিখে দিন, এখনি প্রেসে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' আবদুশ শহীদ গল্প ছাড়া আর কিছু লিখবেন না, এই হয়েছে মুশকিল। আবার, গল্পলেখক হিশেবেও তিনি খুব জনপ্রিয় নন।

চল্লিশ বছরে দুটি বই নিয়ে পাঠক আর কত চিনবে তাঁকে? তবু ঈদসংখ্যায় গল্প লেখবার জন্যে তাগাদা ঠিকই চলে আসে তাঁর কাছে। দু-একজন পাঠক হঠাৎ-হঠাৎ তাঁকে জিগেসও করে, 'আপনি গল্প লিখছেন না আর?' আর তাঁর গল্পের একনিষ্ঠ দু-তিনজন অনুরক্তও আছে। ফিরোজ, শাকের, আসাদ। এরা তাঁর চেয়ে

বয়সে অনেক ছোট। এরাও একসময় গল্প লিখত। এখন অবশ্য লেখে না আর। কিন্তু গল্পকার আবদুশ শহীদ সম্পর্কে তাদের খুব উঁচু ধারণা।

যেমন, সেদিনই সন্ধের পরে ফিরোজ চলে আসে তাঁর কাছে।

বলে, 'শহীদ ভাই, দেখেছেন তো কীসব লিখেছে আপনার গল্প সম্পর্কে।'

আবদুশ শহীদ একটু বিব্রতভাবে হাসেন। বলেন, 'দেখলাম তো।'

ফিরোজ রুষ্ট হয়ে বলে, 'আপনার গল্প এরা কি মনোযোগ দিয়ে পড়েছে কোনোদিন? আপনার গত কুড়ি-পঁচিশ বছরের গল্প তো কোনো বইএ পাবে না। পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে খুঁজে বার করে পড়তে হবে। লেখেননি-লেখেননি করে তো কম লেখেননি আপনি। আপনার গল্পে যে-দিকপরিবর্তন, সে সম্পর্কে এদের কোনো ধারণাই নেই, শহীদ ভাই।

আগে এসব পড়লে রেগে যেতেন আবদুশ শহীদ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আজকাল কিরকম নির্বিকার হয়ে গেছেন।

ফিরোজের রাগ দেখে হাসেন আবদুশ শহীদ। বলেন—কী জানি, বুঝি না। সবাই যখন লিখছে, তখন ঠিকই লিখছে বোধহয়, আমি বোধহয় শূন্যবাদী লেখক, অবক্ষয়ী, জীবন-পলাতক। খামাখা আপনারা ক-জন আমার গল্পের মধ্যে অন্য-কিছু দেখতে পান—

তারপর ফিরোজ কাজের ছেলেটিকে ডেকে চা দিতে বলেন। কথা ঘুরিয়ে নেন অন্যদিকে, বলেন—দোকানে কে আছে এখন?

ফিরোজদের একটা ডিস্‌পেন্‌সারি আছে। ভাইরা মিলে চালায়। ফিরোজ বলে—ভাই আছে এখন। কম্পাউন্ডার আছে।

আবদুশ শহীদ বলেন—আরে, ফিরোজ। আপনার ভাবি বেরিয়েছিল, আপনাদের দোকানে পায়নি, এদিকে আর-কোনো দোকানে নেই, কী-একটা ওষুধ, লাগবে ওনার—

—কোনো অসুবিধে নেই। ফিরোজ বলে—ওষুধের নামটা দিয়ে দেন। আমাদের লোক তো যায়। আনিয়ে দেব। ও নিয়ে ভাবতে হবে না। যাক গে, শহীদ ভাই, নতুন গল্প লিখলেন?

আবদুশ শহীদ বললেন—হ্যাঁ, লিখতে হয় তো *পূর্ণিমা*-র জন্যে—আতাহার ছাড়ে না। বছর বছর লিখি তো ঈদের সময়—

চা এসে গিয়েছিল। চায়ে চুমুক দিয়ে ফিরোজ বলে হেসে—শহীদ ভাই, আপনার মুখে আপনার গল্প শোনাটা অন্যরকম—

হাসেন আবদুশ শহীদও—এই, আপনারা আমার অনুরক্ত আছেন কয়েকজন। আপনারাই বলেন। আসলে, সত্যি কী জানেন ফিরোজ, আপনাদের কয়েকজনের জন্যেই আমার গল্প লেখা।

এ সময় শোবার ঘরের ভেতর থেকে রোকেয়ার উঁচু গলা শোনা গেল—এই, তোমার ফোন।

—একটু বসুন। বলে ড্রইংরুম থেকে শোবার ঘরে এলেন আবদুশ শহীদ।

—হ্যালো।

—শহীদ ভাই বলছেন?

—হ্যা।

—শহীদ ভাই, আমি দৈনিক *সকাল* থেকে মামুন বলছি। মামুন রশীদ। আজ গল্প দেওয়ার কথা ছিল আপনার—

শহীদ বললেন—হয়নি যে—

মামুন রশীদ বলল—কবে থেকে বলে রেখেছি আপনাকে, শহীদ ভাই। রোজা শুরু হয়ে গেল। আমাদের ঈদ-সংখ্যায় বিজ্ঞাপন যাচ্ছে কাল থেকে। গল্পলেখক হিশেবে আপনার নাম যাচ্ছে। পরশু আসি, শহীদ ভাই। রাত্রিবেলা আসব। আপনি বসে যান—

আবদুশ শহীদ বললেন—দু-একটা গল্প অবশ্য মাথায় ঘুরছে—

কথা কেড়ে নিয়ে মামুন রশিদ বলে—শহীদ ভাই, লিখে ফেলুন তাহলে। পরশু আমি আসছি—

আবদুশ শহীদ বললেন—আচ্ছা, ঠিক আছে—

বললেন বটে, দুএকটা গল্পের বীজ তাঁর মাথায় ঘুরছেও, কিন্তু লিখতে বসতে ইচ্ছা হয় না আজকাল আর। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে গল্প লিখছেন। স্বীকৃতি কি তিনি পেয়েছেন কোনো? ঐ বাংলাদেশের গল্পের আলোচনা যখন হয়, তখন তাঁর নাম আসে। 'দত্ত কিন্তু ভৃত্য নয়, সঙ্গে এসেছে।'—নিজের উদ্দেশ্যেই এই কথাটি মনে মনে বলে আজকাল তিনি হাসেন। এই হয়েছে তাঁর অবস্থা। পুরস্কার-টুরস্কার পাননি তিনি, তার ধারও ধারেন না। দু-একজন প্রকাশক যদি থাকত। কিন্তু ছোটগল্পকে কান টানতে টানতে উপন্যাস তিনি করবেন না। আর অন্য-কিছু লিখবেনও না। তার মধ্যেও দু-চারটি গল্প লেখা হয়ে যায়। পত্রিকার ঈদ-সংখ্যার জন্যে, বিশেষ সংখ্যার জন্যে।

ফোন রাখতেই রোকেয়া বলল—শোনো, চাল আনতে হবে। দু-একদিন চলবে আর।

আবদুশ শহীদ বললেন—ঠিক আছে। কাল তো বাজারে যাব। চালওয়ালাকে বলে দেব। পাঠিয়ে দেবে।

বলে ড্রয়িংরুমে এলেন ফের আবদুশ শহীদ।

হাসিমুখে বললেন—ফিরোজ, দৈনিক *সকাল* থেকে ফোন করেছিল। ঈদ-সংখ্যার গল্প লেখবার জন্যে—

ফিরোজ বলল—দ্যাখেন, শহীদ ভাই, আপনার গল্পের কথা সম্পাদকরা ভোলেনি কিন্তু।

আবদুশ শহীদ বললেন—দুএকটা অন্যরকম গল্প লেখার কথা ভাবছি, ফিরোজ—

ফিরোজ উৎসাহিত হয়ে বলল—খুব ভালো হয়। দেখি শাকের আর কায়েসকে বলে আমাদের *গল্প* পত্রিকাটা বের করা যায় কিনা আবার—'

গল্প নামে ফিরোজরা একটি শুধু ছোটগল্পের পত্রিকা বের করেছিল। তিন সংখ্যা বেরিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। এই পত্রিকার উপদেষ্টা সম্পাদক ওরা করেছিল

আবদুশ শহীদকে। তিনটি সংখ্যাতেই তিনি গল্প লিখেছিলেন। ফিরোজ নিজে 'আবদুশ শহীদের গল্প' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিল। আবদুশ শহীদের ছোটগল্প নিয়ে এই একটিমাত্র আলাদা প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। তাঁর বয়েস এখন ৬৩ চলছে।

বেশ উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে ফিরোজ। তখনি *গল্প* পত্রিকা পুনঃপ্রকাশের প্ল্যান করে ফেলল।

বলল—শহীদ ভাই, আপনার গল্প এইসব দৈনি পত্রিকার জন্যে না। এখন বাধ্য হয়ে লিখতে হয় লিখছেন, ঠিক আছে, কিন্তু আপনার গল্পে যে-চিন্তার ব্যাপারটা থাকে—

যারা সময় ফিরোজ বিশেষভাবে বলে গেল, নতুন ধরনের যে গল্প লেখার কথা ভাবছেন আবদুশ শহীদ সেরকম গল্প নিয়েই *গল্প* পত্রিকাটি বের হবে আবার। এসব গল্প যেন আর কোথাও না-দেন তিনি।

* * *

আজকাল সকালে উঠতে বেশ দেরি হয়ে যায়। রোকেয়া ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখে। সেহরির সময় ঘুম ভাঙার জন্যে। সাইরেনের শব্দ সবসময় ঘুমের মধ্যে শোনা যায় না। আবদুশ শহীদের তিন বেলা ওষুধ খেতে হয়। এজন্যেই তাঁর রোজা রাখা হয় না। সকালে ওঁদের উঠতে উঠতে সাড়ে আটটা-ন'টা বেজে যায়। কাজের মেয়েলোক জমিলার মা আসে এগারোটার দিকে। ওরা উঠতে উঠতে আবদুশ শহীদের নাশতা বানিয়ে রাখে টেবিলে কাজের ছোট ছেলেটি।

আবদুশ শহীদ সকালের নাশতা খেয়ে বাজারে যান ছোট ছেলেটিকে নিয়ে। ভূতের গলিতে থাকেন তাঁরা। একটা ভাড়াবাড়ির তিন তলায়। বেশ ক-বছর ধরে আছেন এখানে। এক এক করে যখন তাঁর তিন ছেলে বাপ মা'র কাছ থেকে বিদায় হলো, তখন থেকে। বড় ছেলে মালিবাগে শ্বশুরবাড়িতে ভাড়া নিয়ে থাকে। মেজো ছেলেকে ডাক্তারি পড়িয়েছিলেন বহু কষ্ট করে, ছেলেটাও ছিল খুব ব্রিলিয়ান্ট, আমেরিকায় চলে গেছে। সেখানেই একটি বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করে থেকে গেছে স্থায়ীভাবে। ছোট ছেলে বি.এ. পড়তে পড়তে বিয়ে করে কিছুদিন ছিল তাঁদের সঙ্গে—বউ নিয়ে চলে গেছে তারপর। বড় ছেলে দুই ঈদে বাড়িতে আসে। ফোনে বাপ-মা'র খোঁজ নেয়। ছোট ছেলে মাঝে মাঝে মা'র কাছে এসে চোটপাট করে টাকার জন্যে। রোকেয়া সংসার-খরচ থেকে কিছু টাকা দ্যায় তাকে, না-বললেও বুঝতে পারেন আবদুশ শহীদ। ছেলেদের ব্যাপারে ভালো-মন্দ কিছু বলেন না তিনি। রোকেয়া মাঝে মাঝে কাঁদে। আগে চিৎকার করে কাঁদত, দোষ দিত আবদুশ শহীদকেই, আজকাল ধীরে ধীরে কাঁদে। খাবার সময় মাঝে মাঝে আবদুশ শহীদ দেখেছেন তাঁকে চোখ মুছতে। অবসর পাওয়ার পরে ফিক্স্ড ডিপোজিটে কিছু টাকা রেখেছেন ব্যাংকে—সেই টাকায় আবদুশ শহীদের সংসার চলে। আগে ছিলেন বড় বাড়িতে। ছেলেরা এক-এক করে চলে যাওয়ায় দু-কামরার এই ছোট বাড়িতে উঠে এসেছেন। এর চেয়ে বড় বাড়ি তো দরকার নেই তাঁর। খরচেও

কুলোতে পারবেন না। আগে তাঁদের আশবাবপত্র ও অন্যান্য জিনিশ ছিল অনেক। ছোট ছেলে নিয়ে গেছে বেশির ভাগ। কিছু জিনিশ একে-ওকে দিয়ে দিয়েছেন। হাসিবও নিয়েছিল বোধহয় কিছু। আবদুশ শহীদের ছোট ভাই, একমাত্র ভাই। গ্রামে থাকে। আগে আসত মাঝে মাঝে। ভাবিকে খুব তাজিম করে হাসিব। করে না-বলে করত বলাই ভালো।

রোকেয়াই দু-একবার কথাটা তুলেছিলেন।

বলেছিলেন—আচ্ছা হাসিব, তোমার ভাই তো রিটায়ার করবেন এবার। আমার শ্বশুরের তো কিছু জমিজমা আছে। তা থেকে ওনার তো কিছু পাওনা আছে।

আবদুশ শহীদের কোনো বোন নেই। তাঁদের বংশে মেয়ে খুব কম। আবদুশ শহীদের অবশ্য একজন ফুপু ছিলেন। হাসিবের তো দীর্ঘকাল কোনো ছেলেমেয়েই হয়নি। অনেক পরে, যখন সবাই আশা ছেড়ে দিয়েছে, তখন একটি ছেলে হয়েছে।

হাসিব প্রথমদিকে রোকেয়ার কথা আমলই দিত না।

বলত—কী যে বলেন, ভাবি। মিয়াভাই সরকারি চাকরি করে। আল্লাহর রহমতে তিন তিনটে জোয়ান ছেলে। এক ছেলে আবার ডাক্তার হয়ে যাবে। ঐ সামান্য জমির জন্যে আবার—

রোকেয়াও তখন আর তেমন কথা বাড়াননি।

পরে এসেছিল একবার হাসিব তার ছেলেকে নিয়ে, ছেলে তখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে।

রোকেয়া তখন আবার স্বামীর পৈতৃক জমিজমার কথাটা তুলেছিলেন।

হাসিব তখন কেমন-যেন রেগেই গিয়েছিল। বলেছিল—ঠিক আছে। কোনো অসুবিধা তো নেই। বাপ-দাদার জমি তো আর বিক্রি করতে পারব না। মিয়াভাই দেশে এসে থাকতে চাইলে থাকবেন। আমরা দুটো টাকার মুখ দেখি না। ঢাকায় এসে থাকতে চাই—পারি না। মিয়াভাই, আপনারা যদি চান, থাকেন রূপপুরে এসে। আমার কোনো আপত্তি নেই।

এমনিতে হাসিব হাসি-খুশি। কিন্তু সেদিন কেন-যেন তার মুখটা কঠিন হয়ে গিয়েছিল।

আগের মতোই এবারও হাসিবের সঙ্গে যা যা কথা হয়েছিল, সব জানিয়েছিলেন রোকেয়া তাঁর স্বামীকে।

—কী হবে আর ওসব কথা তুলে, প্রথম-প্রথম একথা বলতেন আবদুশ শহীদ।

কিন্তু এক এক করে তাঁর তিন ছেলে যখন তাঁদের ছেড়ে চলে গেল, তখন এসব কথা তুললে কেমন থম্ মেরে থাকতেন আবদুশ শহীদ, কোনো জবাব দিতেন না।

আবদুশ শহীদের মা অনেক আগে ইন্তেকাল করেছিলেন। তাঁর কথা উঠলে, রোকেয়া সব সময় লক্ষ্য করেছে, আবদুশ শহীদের চোখে পানি ঝলমল করে উঠত। আবদুশ শহীদের বাপ সক্ষম ছিলেন যতদিন, ততদিন ঢাকায় আসতেন

বছরে একবার করে। ছেলেরা ছোট থাকতে স্বামীর সঙ্গে দু-একবার শ্বশুরবাড়িতে গেছেনও রোকেয়া।

আজ পাড়াগাঁ রূপপুর।

এখন রাস্তা পাকা হয়েছে। বিদ্যুৎ এসেছে। এখন নাকি আধা-শহর।

আবদুশ শহীদ বিকেলে একটুকরো বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে থাকেন। বসে আকাশ-পাতাল ভাবেন।

এরকম বসে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একদিন বিদ্যুতের মতো ভাবনায় তাঁর যেন বহুদিনের একটি জট খুলে যায়।

ছেলেরা তাঁর এক এক করে চলে গেছে।

তিনিও এরকমই একদিন তাঁর বাপকে ছেড়ে এসেছিলেন। ঢাকায় চাকরি পেয়ে ঢাকাতেই বিয়ে করেছিলেন। এবং সত্যি কথা বলতে কী, অন্তর থেকে তার বাপকে—তার জন্মদাত্রী গ্রামকে—ভুলে গিয়েছিলেন। বাপের সঙ্গে আর গ্রামের সঙ্গে যেটুকু সম্পর্ক রেখেছিলেন, সেটা একেবারেই বাইরের। লোক-দেখানো। ভেতর থেকে তিনি স্কুলমাস্টার আয়েনউদ্দীন আহমদকে পরিত্যাগ করেছিলেন, রূপপুরের কথা ভুলে গিয়েছিলেন, লেখাপড়া-না-শেখা একমাত্র ছোট ভাই হাসিবকে তাঁর মনে হয়েছিল নিতান্তই একটি গ্রামের মানুষ।

হাসিব খুব ভাবি-ভাবি করত একসময়, অন্তরঙ্গতা দেখাত, রোকেয়াও একমাত্র দেওয়টিকে অপছন্দ করতেন না, তখন আবদুশ শহীদ পরিষ্কার বিরক্তির স্বরে বলেছিলেন—কী—এইসব ভাইটাই ভালো লাগে না—

উল্টো রোকেয়াই অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন সেদিন।

বাজারে গিয়ে চালওয়ালার লোকের হাতে চাল পাঠিয়ে দিলেন। আগে যে লোকটা চাল আনত, তাকে দেখলেন বসে আছে ঐ দোকানের সামনেই।

কী ব্যাপার?

দোকানদার বলে—এখন আর চাল নিতে পারে না, স্যার।

—কত বয়েস হয়েছে আপনার? জিগেস করেন আবদুশ শহীদ।

—আশি হইব। লোকটা উদাসীন স্বরে বলে।

নাহ্, চুল এখনো কাঁচা আছে অনেকটাই। সত্তর-পঁচাত্তরের বেশি হবে না।

আবদুশ শহীদ বলে—তবু ভালো আছেন। সত্তর তো হবে অন্তত। কত বড়লোক আপনার বয়েসে গুজরে গেছে। শারীরিক পরিশ্রম করতেন তো, তাই এ্যাদ্দিন টিকে আছেন—

লোকটা কোনো কথা বলে না।

ভাংতি টাকা বেশি নেই। কাগজে দেখেছেন আবদুশ শহীদ, এবার ফিতরার টাকা ২৫ টাকা। গুণে ২৫ টাকা লোকটার হাতে দিলেন। যত রাগই করেন, ছেলেদের, তাঁদের সন্তানদের, তাঁর আশ্রিতদের ফিতরার টাকা মনে মনে হিশাব করে তিনি ফকির-মিসকিনকে দিয়ে দেন।

কিন্তু কিরকম ভাবান্তর হয়েছে যেন।

ব্যাংকে লাইনে দাঁড়িয়ে টেলিফোন-বিল শোধ করতে গিয়ে কেমন-যেন লজ্জা লাগে। যদিও আরো বয়স্ক লোক দ্যাখেন তিনি দাঁড়িয়ে আছে।

তিন মাস পর-পর ব্যাংকে পেনশনের টাকা তুলতে যেতে হয়।

বাজার করতে হয়।

বাড়ি-ভাড়া দিতে হয়।

গ্যাস-বিল দিতে হয়।

ওষুধ কিনতে যেতে হয়।

আত্মীয়-স্বজনের ছেলে-মেয়ের নাতি-নাতনির বিয়েতে যেতে হয়।

মৃত্যুর খবর পেলে যেতে হয়।

এইসবের মধ্যে একটা নেশাই কি আজো বাঁচিয়ে রেখেছে তাঁকে? এই বয়েসে?—গল্প লেখার নেশা।

দু-চারজন আন্তরঙ্গ পাঠকও কি নেই তাঁর গল্পের?

সেদিন নিউমার্কেটেই রোকেয়াকে নিয়ে ঈদের টুকিটাকি কেনাকাটা করছেন, একটি তরুণ সালাম দিয়ে দাঁড়াল। মনে হয় কিছু বলবে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন আবদুশ শহীদ।

ছেলেটা খুব গুছিয়ে কথা বলতে পারছে না। বিব্রতভাবে বলল—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে আপনি একটা গল্প লিখেছিলেন না? খুব ভালো লেগেছে। বলে লাজুক ছেলেটি ভিড়ের ভেতরে মিশে গেল।

এরকম এক-আধজন পাঠক আছে তাহলে তাঁর? দু-একজন চেনেও তাহলে তাঁকে?

বাজার হয়ে—ব্যাংক হয়ে—বাড়িতে ফিরলেন আবদুশ শহীদ। এসব কী ভালো লাগে না তাঁর? এসব কী ভালো লাগে তাঁর?

রোকেয়া চা নিয়ে এলেন। আর একটা পিরিচে দুটো টোস্ট বিস্কুট। বললেন—এই-যে রোজার সময় তোমাকে চা দিতে হয়, এতে গো'না হয় আমার। বুঝলে? নিজে রোজা তো রাখো না, আমাকে পাপের ভাগীদার করছ—

ও, তাহলে সাড়ে-এগারোটা বেজে গেছে। কী ছোট এই ডিসেম্বরের দিনগুলো। ঘড়ির দিকে তাকালেন আবদুশ শহীদ। প্রায় বারোটাই বাজে। এই সময় আবদুশ শহীদের চা-টোস্ট খাওয়ার নিয়ম।

চা দেখেই মন-মরা ভাবটা কাটল তাঁর। এক চুমুক দিয়েই মুহূর্তে যেন চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। বললেন—বাহ্ রোকেয়া, তুমি জানো না, আমি গ্যাস্ট্রিকের রোগী। খালি পেটে থাকা উচিত না।

রোকেয়া বললেন—কিচ্ছু হয় না। সেদিন টি.ভি.তে বড় বড় ডাক্তাররা সব বলছিলেন। যাক গে, তুমি তোমার বাহানা নিয়ে থাকো। আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি।

আবদুশ শহীদ বললেন—শোনো শোনো। দৈনিক *সকাল* থেকে ফোন করেছিল। চারটে গল্প তো অলরেডি লিখে ফেলেছি। আরো একটা লিখতে হবে—বলে রেখেছে অনেকদিন ধরে—

লিখতে ইচ্ছে হয় না গল্প আবদুশ শহীদের।

আবদুশ শহীদের একমাত্র গল্প লিখতেই ভালো লাগে।

রোকেয়া বললেন—লিখে ফ্যালো, আর কী। তোমার গল্পের সাপ্লায়ার তো আছেই— বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আয়েশ করে চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভাবনা হচ্ছিল কিন্তু আবদুশ শহীদের— অনেকদিন তো জিল্লু আসছে না। এত দেরি তো করে না। বেঁচে আছে তো? জিল্লু ঠিক কোথায় থাকে তা বলে না—খানিকটা আন্দাজ করেন—বংশাল রোডের কোথাও। কিন্তু বাড়ি চেনেন না। খোঁজ নেওয়া অসম্ভব। জিল্লু-র দেওয়া বেশ-কিছু গল্পের প্লট কাজে দিয়েছে তাঁর। জিল্লু মাঝে মাঝে বলত তাঁকে—আমি মইরা গেলে আমারে লইয়া একটা গল্প লিইখেন। আবদুশ শহীদ যে গল্প লিখতেন জিল্লু তা জানত।

অনেকের অনেক গল্পই করেছে জিল্লু, নিজের কথা খুলে বলেনি কোনোদিন। তবু ওকে নিয়েই গল্প লেখা যাক্ এবার দৈনিক *সকালে*। এক সময়ে এই শহরে তিন-চারটে দোকান ছিল যে জিল্লুর, সে কী করে পথের মানুষ হয়ে গেল তার ইতিকথা কয়েকটি পৃষ্ঠায়। কিন্তু সব কথা কী লেখা যাবে?—আবদুশ শহীদকে যে-সব নিষিদ্ধ জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল জিল্লু—বেপাড়ায়, শাঁখারিপট্টিতে, এমনকি হিজড়েদের আখড়ায়, সব কথা এই বয়েসে লিখতে পারবেন না আবদুশ শহীদ।

না, ঢাকা শহরের পাতালে তলিয়ে গেছে যে-জিল্লু, তাকে নিয়েই এবার গল্প লিখবেন আবদুশ শহীদ।

* * *

ঈদের মাসখানেক পরে রূপপুর গ্রামের পৈতৃক ভিটায় চলে এসেনে আবদুশ শহীদ। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী রোকেয়া বেগম।

আবদুশ শহীদ ঢাকা শহর ছেড়ে আসার কয়েকদিন আগে মাত্র রোকেয়া বেগমকে জানিয়েছিলেন তাঁর সিদ্ধান্তের কথা। হাসিবকে একটি চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছিলেন, রূপপুর গ্রামে চলে আসছেন তিনি। স্থায়ীভাবে। পিতা আয়েনউদ্দীন আহমদ যে-ঘরটিতে থাকতেন, ঐ একটি ঘর হলেই চলবে তাঁর। তাঁরা তো দুজনমাত্র লোক।

হাসিব বিশ্বাস করতে পারেনি। জবাবও দ্যায়নি তাঁর চিঠির। আবদুশ শহীদ তাতে একতিল বিচলিত হননি। যথানির্দিষ্ট দিনে তিনি ঠিক পৌঁছে গেছেন। রূপপুর গ্রামের চেহারা বদলে গেছে ঠিকই, কিন্তু জন্মগ্রামকে কে কবে ভুলতে পেরেছে?

রূপপুর একটি একেবারেই বাংলাদেশের সীমান্তের একটি গ্রাম। গ্রামের লোকদের অনেকেরই একমাত্র কাজ চোরাচালান।

আবদুশ শহীদ গ্রামে কয়েকদিন থেকেই জেনে গেছেন গ্রামের সবচেয়ে বড় চারতলা পাকা বাড়িটাই চোরের থলেদারের বাড়ি।

বিদ্যুৎ এসে গেছে। পড়াশোনার কোনো অসুবিধে হয় না।

ঢাকা শহরে তিন বেলা যে-সব ওষুধ খেতেন, সব বাদ দিয়েছেন আবদুশ শহীদ। একজন কবিরাজের ওষুধ খাচ্ছেন। তাতেই আছেন তিনি।

আবদুশ শহীদ সকালবেলা নাশতা খেয়ে কয়েকজন চাষিকে নিয়ে খেতে চলে যান। চাষিদের সঙ্গে খেতে কাজ করেন।

হাসিব প্রথমদিকে রীতিমতো চটে ছিল আবদুশ শহীদের ওপর, এখন রীতিমতো খুশিতে টগবগ করছে।

রোকেয়াকে বলে—ভাবি, মিয়াভাই তো রীতিমতো গ্রামে হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছেন। গ্রামের ছেলেরা তো সব মিয়াভাইএর ভক্ত হয়ে উঠেছে। চোরাচালানিরা তো সব গ্রামে আর স্মাগলিং সহজে হচ্ছে না।

কিন্তু ফলটা খুব ভালো হলো না।

কবিরাজের দেওয়া ওষুধ খলে মাড়ছিলেন সন্ধেবেলা আবদুশ শহীদ। হঠাৎ গুলির শব্দ।

দেয়াল ভেদ করে গেছে। খল মাড়ছিলেন বলে দুলছিলেন। তার ফলে গুলিটা দেয়ালে গিয়ে বিঁধেছে। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছেন আবদুশ শহীদ।

স্মাগলিং-নিরুদ্ধকারী যে-যুবকসঙ্ঘটি তৈরি করেছিলেন আবদুশ শহীদ, তারাই এখন তাদের বাড়িটি পাহারা দিচ্ছে প্রতি রাতে।

আবদুশ শহীদের কাজের ধারায় কোনো ক্লান্তি নেই।

গ্রামে এসে নতুন একটি গল্প লেখা শুরু করেছেন তিনি। সেই প্রথম যৌবনের মতো আনন্দে ॥

[২০০১]

বিকেলের নক্ষত্র

গলিতে বেরিয়েই রিকশা পেলেন সৈয়দ মুসাররাত হোসেন।

ঘিঞ্জি গলি। ভেতরে একটা ছোট বাজার। স্থানীয় লোকজন তাই নাম দিয়েছে 'বাজারের গলি'। বছর পাঁচেক আগে এই গলিতে যখন আসেন সৈয়দ মুসাররাত হোসেন, ভাড়াটে হিশেবে, তখনই কত ফাঁকা ছিল এই এলাকা। এখন এই রাস্তায় হাঁটা যায় না। রিকশা, গাড়ি, পথচারী লোকজন। সকাল আটটা থেকে রাত দশটা অবধি পথ উপচে পড়ছে।

কিন্তু এতে সুবিধে হয়নি কি তাঁর? তেতলার তাঁর একা-ঘরটিতে জানালা খুলে দিব্যি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়। এখন তাঁর এই একটাই আনন্দ। পথের ওপর চোখ রেখে চুপ করে বসে থাকা। আর-কোনো কাজ নেই।

বউ?—নেই। মৃতা।

ছেলে?—আমেরিকায়। সেখানেই স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘর-সংসার বেঁধেছে স্থায়ীভাবে। তাঁর কোনো মেয়ে নেই।

ভাই-বোন?—বোনরা ঢাকায় এবং খুলনায় আছে। তিন বোন। বড় এবং ছোট দুই ভাই ঢাকাতেই। বড়-ছোট তিন ভাইএর সঙ্গেই তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। ভাইরা এলিফ্যান্ট রোডের তিন তলা বাড়িটায় থাকে তাদের ঘর-সংসার নিয়ে। বাড়িটা যেহেতু তিনতলা, আর যেহেতু তাঁর স্ত্রী বিগতা এবং ছেলে বিদেশে, কাজেই তাঁর দরকার নেই তো কোনো বাড়িঘরের। সৈয়দ মুসাররাত হোসেন কাঁঠালবাগান এলাকায় একটি বাড়ির একাংশে একটি ঘর, আর রান্নাঘর, আর বাথরুম নিয়ে একা থাকেন। বাড়িওয়ালাই কাজের একটি মেয়েলোক জোগাড় করে দিয়েছে। সে-ই সকালে এসে নাশতা করে, দুবেলার রান্না করে, ঘরদোর ঝাঁট দ্যায়। রাতের রান্না ফ্রিজ থেকে খুলে নিজেই তিনি গরম করে খেয়ে নেন।

জীবিকা?—সরকারি চাকুরে ছিলেন। সেকশন অফিসার হিশেবে রিটায়ার করেছেন। এখন সে-পোস্টের নাম বদলে গেছে নাকি। পেনশনের টাকায় তাঁর সংসার চলে। তাঁর স্ত্রীর যে-গয়নাগুলো ছিল, সেগুলো তাঁর ছেলে একবার দেশে এসে মায়ের স্মৃতিচিহ্ন হিশেবে নিয়ে গেছে। বিয়ের সময় স্ত্রীকে তিনি একটি আংটি উপহার দিয়েছিলেন, এমন-কোনো দামি জিনিশ না, সাধারণ শস্তা আংটি—সেই আংটিটা তাঁর স্টিলের আলমারির ড্রয়ারে আছে। সেখানে আছে তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর পাসপোর্ট। ঐ একবারই দেশের বাইরে গিয়েছিলেন তিনি। এমন কিছু দূরে না।

বেড়ানোর জন্যেও না। কলকাতায়। স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যাপারে। সেখানকার ডাক্তাররা তাঁর স্ত্রীর অসুখের ব্যাপারে জবাব দিয়ে দিয়েছিলেন। দেশে, ঢাকায় ফেরার কয়েকদিন পরে সে ইন্তেকাল করে। আজিমপুর গোরস্থানে তাকে কবর দেওয়া হয়।

বন্ধুবান্ধব?—প্রথম জীবনে ছিল কিছু বন্ধুবান্ধব। বহুদিন হলো তাঁর কোনো বন্ধুবান্ধব নেই। সহকর্মীদের সঙ্গে যেটুকু অন্তরঙ্গতা হওয়ার, হয়েছিল।

আত্মীয়স্বজন?—না, কোনো আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ নেই। তিনি কোথাও যান না। কেউ তাঁর কাছে আসে না। তারপরও মৃত্যুসংবাদ দিতে চলে আসে কেউ কেউ, কিংবা বিবাহের দাওয়াত দিতে।

যেমন সেদিন চলে এসেছিলেন তাঁর ভাবি, বড় ভাইএর স্ত্রী।

সকাল দশটায় তাঁর দরোজায় ধাক্কা পড়তে তিনি একটু অবাক হয়ে গেলেন। এমন সময়ে তো কেউ আসে না। কোনো সময়েই তো আসে না। তাহলে কি মারা গেল কেউ? প্রথমেই একথাটা মনে আসে তাঁর। আজকাল খবরের কাগজে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব খবরই পড়েন। রাজনীতির খবর বরং পড়েন কম। বুঝতে পারেন না দেশ এগোচ্ছে না পিছোচ্ছে। ব্রিটিশ আমল দেখেছেন তিনি অল্প হলেও, পাকিস্তান আমল দেখেছেন, এখন দেখছেন বাংলাদেশ। রাষ্ট্র বদলাচ্ছে—তিনটি রাষ্ট্রে বেঁচেছেন তিনি; সরকার বদলাচ্ছে—কত আমলের কতরকম সরকার তিনি দেখলেন—কিন্তু সাধারণ মানুষের কোনো ভাগ্য পরিবর্তন হলো কি? তাই রাজনীতির সংবাদে তাঁর তেমন উৎসাহ নেই যে-খবরটি তিনি আজকাল পড়বেনই পড়বেন, সেটি শোকসংবাদ, কুলখানি, মৃত্যুবার্ষিকী—এইসব। শোকসংবাদে বিশেষভাবে তিনি লক্ষ্য করেন বয়েস যদি দেওয়া থাকে, সেগুলো। মনে মনে একটা ঝাপসা জরিপও করে ফেলেছেন তিনি এদেশের মানুষের আয়ুষ্কালের। ৫০-৬০ বছর বয়সে যাঁরা মারা যায়, তারা সাধারণত হৃদরোগেই মৃত্যুবরণ করে। তাদের পেশাও লক্ষ্য করেন তিনি। সাধারণত মহিলারাই দীর্ঘজীবী হয়। গ্রামের লোকদের আয়ুও মনে হয় শহরের লোকদের চেয়ে বেশি। আবছাভাবে নিজের সঙ্গে একটু মিলিয়েও নেন তিনি। আর কত কাল বাকি? সেই সব-কালো-করে-দেওয়া পর্দা পড়বে কবে? ৬০ পেরিয়ে গেছেন তিনি। যবনিকাপাত হবে কী ৬৫ তে, ৭০ এ, ৭৫ এ, ৮০ তে, ৮৫ তে, ৯০ তে? অতদূর কি যেতে পারবেন তিনি এই বৈচিত্র্যহীন নিঃসঙ্গ একঘেয়ে কিন্তু মসৃণ জীবন ধারণ করে? যারা দীর্ঘদিন বাঁচে, তারা কি চেষ্টা করে বাঁচে, নাকি এম্নিতে—নিতান্তই অকারণে বেঁচে যায়।

যখন তিনি এই একাকী ডেরায় উঠে আসেন, তখন আত্মীয়স্বজন কেউ কেউ আসত—নানারকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে, তলে তলে নিজেরাই সাহায্য গ্রহণ করতে, সোজা কথায় আখের গোছাতে। তিনি পরিষ্কার ফিরিয়ে দিয়েছেন। ফোন নেই তাঁর, মার্কিনদেশ থেকে চিঠি পাঠিয়েও ছেলে খোঁজ করে না তাঁর। এমন সময়ে কে এল?

কাজের মেয়েটি রান্নাঘর থেকে এসে দরোজা খুলল। তিনি নিজে খাটে বসেছিলেন। যিনি ঢুকলেন, তাঁকে দেখে চোখ বড় বড় হয়ে উঠল তাঁর।

ভাবি। সঙ্গে তার বড় ছেলে। এত বড় হয়ে গেছে!

'আসেন, ভাবি, ভালো আছেন?' সৈয়দ মুসাররাত হোসেন খাটে উঠে বসলেন।

ভাবি আর তাঁর বড় ছেলে মতিন সামনের সোফায় আসীন হলো। এই লম্বা সোফাটাই এই ঘরে বসবার জন্যে আছে। আর আছে একটা কাঠের চেয়ার আর ছোট কাঠের টেবিল। টেবিলের ওপর তাঁর ওষুধ, পানির গেলাশ, কাগজ, কলম—এইসব টুকিটাকি জিনিশ।

ভাবি বসতে বসতে বললেন—একটু খোঁজ-খবর নাও না। পরে যোগ করলেন—আমাদেরও অবশ্য নেওয়া হয় না। কি করবো—নানা ঝন্‌ঝাট—বোঝোই তো—

—ভাই কেমন আছে?—জিগেস করলেন সৈয়দ মুসাররাত হোসেন। তাঁর বড় ঐ একজনই ভাই। বাকিরা ছোট, অনেক ছোট।

স্ত্রীকে নিয়ে কিছুকাল এলিফ্যান্ট রোডের পৈতৃক বাড়ির বাইরে ছিলেন সৈয়দ মুসাররাত হোসেন। পৈতৃক বাড়ির দোতলার একাংশে থাকতেন তাঁরা। যে একাংশ ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেখানে তার পরবর্তী ভাইএর সংসার বেড়ে যাওয়ায় তারা অধিকার বিস্তার করে,—আব্বার ইন্তেকালের পরে। আম্মা আগেই মারা গিয়েছিলেন। তারপর তো তাঁর স্ত্রী অসুখে পড়ল, স্ত্রীর অসুখের মধ্যেই ছেলে মার্কিনদেশে পাড়ি জমাল—সুযোগ তো সব সময় পাওয়া যায় না, এই যুক্তিতে। তারপর বছর খানেক মাঝে মাঝে এলিফ্যান্ট রোডের পৈতৃক বাড়িতে গিয়েছেন সৈয়দ মুসাররাত হোসেন। তাঁর যে ছোট ভাই দোতলায় থাকে সে পরিষ্কার বলেছে— আমার তো এমনিতেই জায়গা হয় না এখানে—রুম-টুম ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না—ভাইএর ঘরে এসব কথা হয়েছে।

ভাই বলেছে—ও না-ছাড়লে আমি কী করব?

ভাবি ছিলেন সেখানেই। বলেছেন—না-হয় চারতলায় রুম বানিয়ে নিক কয়েকটা—এখন তো বউও নেই, ছেলেও নেই—

ভাই বলেছে—দুএকটা কোম্পানির সঙ্গে কথা হচ্ছে আমাদের—বহুতল বাড়ি হবে—তখন তো তুই তোর ভাগ পাবি—

ভাবি বলেছেন—একা মানুষ। ওর তো অত লাগবেও না—

সৈয়দ মুসাররাত হোসেন ক্রমশ বুঝে গেছেন পৈতৃক বাড়ির অংশ তিনি পাবেন না।...

ভাবি বললেন—মতিনকে মনে আছে তো তোমার? আমার বড় ছেলে?

—হ্যাঁ। হ্যাঁ। বললেন সৈয়দ মুসাররাত হোসেন—কী করছ তুমি?

মতিন বলল—চাচা, আমি বাসসে আছি। সংবাদসংস্থায়। সাংবাদিক।'

'আচ্ছা, ভালো। সৈয়দ মুসাররাত হোসেন বললেন। নিজের ছেলের কথা ভাবলেন একবার। নাহয় আমার সঙ্গে থাকল না, এমন ব্রিলিয়ান্ট ছেলে, দেশে তো থাকতে পারত।

ভাবি বললেন—যে কারণে এসেছি, আমার ছোট ছেলে মানিকের বিয়ে। তোমার কিন্তু যেতে হবে।

মতিন কার্ডটা সৈয়দ মুসাররাত হোসেনের হাতে দিল।

বউ ভাতের দাওয়াত।

সৈয়দ মুসাররাত হোসেন কার্ড পড়ে বললেন—ঐ এলাকায় তো অসম্ভব ভিড় হয় সন্ধেবেলা। রাতে। তাছাড়া আমার তো খাওয়াদাওয়াও বারণ—

মতিন বলল—তাহলে বিয়েতে আসেন। বিয়েটা আপনার বাড়ির কাছেই। সোবহানবাগ মসজিদ আছে না—ওর কাছে, ওখানে যেতে আপনার অসুবিধে হবে না। আমি ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। মীরপুর রোডের ওপরেই—বলে ঠিকানা লিখে দিল।

ভাবি বললেন—তাহলে বিয়েতেই এসো অন্তত। তুমি আপন চাচা। তুমি না এলে—

সৈয়দ মুসাররাত হোসেন বললেন—চা খাবেন, ভাবি?

ভাবি হাসলেন—আমার ডায়াবেটিস। তোমার ভাইএর হাই প্রেসার। তা নাহলে নিজেই আসত। না, চা-টা কিছু করতে হবে না।

কাজের মেয়েটিকে ডেকে সৈয়দ মুসাররাত হোসেন আপেল কেটে এনে দিতে বললেন।

লক্ষ্য করলেন, ভাবির বয়েস ইতোমধ্যে অনেক বেড়ে গেছে যেন। চেহারায় পরিষ্কার বয়সের ছাপ।

হবে না? দেখা হয়নি কতদিন?

আয়নায় নিজের মুখ দেখে কি বোঝা যায়? আমার চেহারাতেও নিশ্চয় অনেক বছরের আঁকিবুকির প্রমাণ রয়েছে।

ভাবি ও মতিন দু-একটা আপেলের টুকরো মুখে দিলেন ভদ্রতাবশত।

ভাবি বললেন—তোমাকে দেখে মায়াই লাগে—এমন অকালে চলে গেল—তুমি তো বিয়ে-থা করলে না আর—ছেলেটাও বিদেশে রয়েই গেল মনে হচ্ছে—

সৈয়দ মুসাররাত হোসেন কোনো জবাব দিলেন না।

যাবার সময় আর-একবার ছোট ছেলের বিয়েতে যাবার অনুরোধ করে গেলেন ভাবি। বললেন—এই তো শেষ বিয়ে। আমার তো আর ছেলে-মেয়ে নেই। তুমি যাবে কিন্তু অবশ্যই—

ভাবিরা চলে যাবার পরে বিয়ের তারিখটা দেখে চমকে গেলেন সৈয়দ মুসাররাত হোসেন। ১১ই নবেম্বর বিয়ে। ঠিক এই তারিখেই বিয়ে হয়েছিল তাঁদেরও। আশ্চর্য তো!

* * *

আজ ঐ বিয়ের অনুষ্ঠানেই যাবেন বলে বেরিয়েছেন সৈয়দ মুসাররাত হোসেন। সন্ধ্যা উতরে যাবার পরে। সাতটা তো এখন অনেক রাত।

এখন অঘ্রাণ মাস। ঠাণ্ডা লাগতে পারে। একটা বুক-খোলা সোয়েটার পরে নিয়েছেন। দাড়ি কামিয়েছেন অনেকদিন পরে। ভালো পোশাক পরেছেন কত দিন পরে—মনটা ভালো লাগছে।

আজ ১১ই নবেম্বর। সৈয়দ মুসাররাত হোসেনের বিবাহ-বার্ষিকী। কিন্তু যার স্ত্রী জীবিত নেই, তার আর বিবাহ-বার্ষিকীর আনন্দ কী! স্বপ্নার ছবি আছে আলমারির মধ্যে কোথাও। সে নেই, তার ছবিতে ফুল দিয়ে কী হবে! ওসব নাটকীয়তার মধ্যে নেই তিনি। ঠিক একই তারিখে ভ্রাতৃষ্পুত্রের বিবাহের সংবাদে বরং কিরকম একটা আশ্চর্য লাগছে। রক্তধারার একটা টান থাকে তো কোথাও—কিন্তু বাইরের এরকম মিল!

হয়তো যেতেন না। এম্নিতে সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে খুব একটা যানও না সৈয়দ মুসাররাত হোসেন। কিন্তু তারিখটিই তাকে যেন প্ররোচিত করল যাওয়ার জন্যে।

বেশ খুশি মনেই সেজেগুজে তাই বেরিয়েছেন সৈয়দ মুসাররাত হোসেন। রাস্তায় নেমে আলো-জ্বলা রাত্রি, অঘ্রাণের একটু-ঠাণ্ডা বাতাস—এসব বেশ ভালো লাগছিল তাঁর।

মাঝে অবশ্য বেরিয়েছিলেন একদিন সকালের দিকে। বিয়ের উপহার হিশেবে একজোড়া দুল কিনে এনেছিলেন নিউমার্কেটের এক সোনার দোকান থেকে। তাঁর মনে ছিল নিউমার্কেটে কোন্ সোনার দোকানে রোকেয়াকে নিয়ে আসতেন এটা-ওটা কেনবার জন্যে। ইচ্ছা করেই সে-দোকানে যাননি। দোকানটা এখনো আছে কিনা তাও জানার ইচ্ছা হয়নি তাঁর।

বিয়ের অনুষ্ঠান তো, দেরি হবে নিশ্চয়। তাই একটু দেরি করেই বেরিয়েছেন। দোকানপাটে আলো জ্বলছে, স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা হাওয়া—বেশ ভালো লাগছে ভিড়ে, ভাঙাচোরা রাস্তায়।

হঠাৎ পেছন থেকে শোনা গেল—এই!

রিকশা থেমে গেল।

একটু অবাক হলেন সৈয়দ মুসাররাত হোসেন। তাঁর রিকশা আবার থামাল কে?

একজন মোটা মোটা লেন্সের চশমাপরা বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন, হাতে লাঠি, সঙ্গে একজন লোক।

—গায়ে লাগাইলি ক্যান?

—লাগেনি তো।

—আবার কস্ লাগেনি তো, হারামজাদা।

—এদিকে গাড়ি আসছিল, আমি কই যামু?

—শুয়ারের বাচ্চা, দেইখা চালাইতে পারস না। থামাইতে পারস নাই।

রিকশাঅলাটা নিতান্তই ভালোমানুষ। খানিকটা বোকা হয়ে গেছে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির সঙ্গে একজন লোক আছে। অল্পবয়সি। তাকে থামানোর চেষ্টা করছে। ধরে নিয়ে গেল।

মেজাজটা খিঁচড়ে গেল সৈয়দ মুসাররাত হোসেনের। তুচ্ছ একটা ঘটনা। লোকটি সম্ভবত উচ্ছ রক্তচাপের রোগী—সহজেই রেগে গেছে। তবু পায়ে যেন কাঁটা বিঁধে গেছে সৈয়দ মুসাররাত হোসেনের।

বিবাহ-বাসর চিনতে পারবেন কিনা একটু সংশয় ছিল তাঁর, কিন্তু দূর থেকেই রাস্তার ওপরে আলো-ঝলমল করা 'পার্টি সেন্টার' দেখা গেল। সৈয়দ মুসাররাত হোসেনের রিকশা গেটেই থামল।

রিকশা থেমে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিতে হলো তাড়াতাড়ি। দু-তিনটে গাড়ি পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

গেটেই ছিল সৈয়দ মুসাররাত হোসেনের ছোট ভাই। সেই যে-ভাই তাঁর দোতলার অংশ নিয়ে নিয়েছে, শুনতে পেলেন সে কাকে যেন বলছে—মেজো ভাইএর আক্কেল দ্যাখো, রিকশা নিয়ে বিয়ে-বাড়িতে এসেছে। একটা বেবি-ট্যাক্সিতেও তো আসতে পারত!

সৈয়দ মুসাররাত হোসেন গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। ভেতরটা জমজমাট। আলো। লোকজন। সামনেই ছিলেন মেয়ের বাপ। মতিন তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল—আমার চাচা। হাত মেলালেন। তারপর ভদ্রলোক নিয়ে গেলেন সোফায় বসা লোকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্যে। তাঁর বড় ভাইটিকেই লক্ষ্য করলেন শুধু সৈয়দ মুসাররাত হোসেন।

ওদিকে সারি বেঁধে চেয়ার পাতা রয়েছে। এপাশে কয়েকটি সোফা সেট। তাতে সব লোকজন বসে আছে। বয়স্ক লোকরা তো বটেই, ছেলে-ছোকরারাও। বিয়ে-বাড়ির ব্যাপার, দেরি হবে হয়তো। কাঠের চেয়ারে অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকতে কষ্ট হবে তাঁর। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন দেখে একটি ছেলে না-পেরে উঠে গেল। তিনি সোফার একপ্রান্তে বসলেন।

নারী-পুরুষ আসা-যাওয়া করছে। খুব যে দম-আটকানো ভিড় তা নয়!

দূর থেকে চেয়ারে-বসা লোকটিকে দেখেই চিনেছিলেন। তাঁর খালাতো বোনের স্বামী। খালাতো বোনটি বিয়ের পরে থেকেই অসুস্থ, শয্যাশায়ী ছিল। ঐভাবেই বেঁচে ছিল দু-তিন বছর। তারই মধ্যে দু-তিনটি সন্তানের জননীও হয়েছিল। তখন মফস্বল থেকে ভদ্রলোক প্রায়ই আসতেন বউ নিয়ে—ওদের বাসায়ই উঠতেন। তার এম.এ. পরীক্ষার আগে এসে এক মাস জ্বালিয়েছিলেন। একজন যুবক সারাদিন বাড়িতে বসে থাকে—এ তাঁর আশ্চর্য মনে হতো তখন। প্রায়ই চিঠি লিখতেন এখানে-ওখানে—ডাকে ফেলে দেওয়ার জন্যে দিতেন তার হাতে। খালাতো বোন বিয়ে করার পরে বিয়ে করেছিলেন আবার, একেবারে অল্পবয়সি একটি মেয়েকে।—ভদ্রলোককে এখন চেনাই যাচ্ছে না, বিরাট দাড়ি, মাথায় পাগড়ি-বাঁধা, কিন্তু সৈয়দ মুসাররাত হোসেন চিনেছেন ঠিকই। চোখ চোখ পড়তে ভদ্রলোকই এগিয়ে এলেন—তুমি বোধহয় আমাকে চিনতে পারছ না—

সৈয়দ মুসাররাত হোসেন সোফায় বসে থেকেই শুধু হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। বিড়বিড় করে বললেন—চিনব না কেন? কিন্তু উৎসাহ বোধ করছি না— সেকথা ভদ্রলোকের কানে গেল কিনা, কে জানে।

চোখে পড়ল ভাইকে। ভাই দূর থেকে এগিয়ে এলেন—ভালো আছিস তো? বোস্। সৈয়দ মুসাররাত হোসেন সামাজিক অনুষ্ঠানে যান না সাধারণত, বিয়েতে আসবেন এটা ভাবেনি ওরা।

ছোট বোন এগিয়ে এল ভিড় ঠেলে, বোনের বর, ছেলেমেয়েরা—ওরা এইমাত্র ঢুকেছে। বোন অনুযোগের সুরে বলল—তুমি একটু আমাদের খোঁজখবর নাও না, আর খোঁজ-খবর নেবে কি? ভাইরা তোমাকে এমনভাবে বঞ্চিত করল। ভাবিও মরে গেল। ছেলে চলে গেল বিদেশে। তোমার দুঃখ বুঝি, মেজো ভাই।—ছোট বোনের চোখে পানি এসে গেছে। এই বোনটি সত্যিই তাঁকে মায়া করে—জানতেন তিনি, অনেকদিন ধরে জানতেন।

সৈয়দ মুসাররাত হোসেনই বরং তাকে সন্ত্বনা দিলেন—থাক—থাক—কাঁদিসনে—যার যা কপাল—

ছোট বোন সামলে নিল। নববধূ দোতলায়। চলে গেল সেদিকে।

বর আসতে দেরি হচ্ছে। মনে আছে, তাঁর বিয়ের দিনের হট্টগোল। এখন, আগেই বিয়ে হয়ে যায়। খেতে বসে গেল অনেকেই। সৈয়দ মুসাররাত হোসেন গেলেন না। তিনি বরের চাচা। তিনি বর আসার আগেই খেয়ে নিতে পারেন না।

একটু পরেই গেটের কাছে গোলমাল দেখে বোঝা গেল, বরের গাড়ি এসেছে। গেট ধরা ব্যাপারটা আজো আছে তাহলে? গেটে আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল সৈয়দ মুসাররাত হোসেনকে। মেয়ের খালুর বাড়িতে বিয়ে হয়েছিল। রোকেয়ার বাবা বিয়ের আগেই মারা গিয়েছিলেন। একটু পরেই পাগড়ি-আর-আচকান-পরার্বর তরুণী-পরিবৃত অবস্থায় এগিয়ে গেল সামনের ঘরের দিকে। হলদে-রঙের চাঁপাফুলের রাশি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ওদের গায়ে-মাথায়। তখনকার দিনে ফুলের রেওয়াজ ছিল না। সৈয়দ মুসাররাত হোসেনের বাসর-ঘরেও কোনো ফুল ছিল না। রোকেয়ার সেই হঠাৎ পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে যাওয়ার দৃশ্যটি ভেসে উঠল।

সৈয়দ মুসাররাত হোসেন দেখলেন, ভাই এগিয়ে যাচ্ছে ভাবির বড় ভাইকে নিয়ে। এপাশে আলাদা একটা রুম। মুকিত, তার ছোট ভাইটি এসে ডাকল তাকে—মেজো ভাই, তুমি এসো এখানে। খেয়ে নাও।

খাওয়াদাওয়ার পরে দেখলেন গেটের কাছে একজনের কাছে পানের সরঞ্জাম। পান-সিগারেট খাওয়ার অভ্যেস নেই তাঁর। অনেকদিন পরে তিনি গিয়ে একটা পান খেলেন। সুপারির কুচি দু-চারটি।

বিয়ের রাতটি মনে আছে তাঁর। রোকেয়া আর তিনি সারারাত জেগে গল্প করেছেন। অথচ পরদিন একফোঁটা ক্লান্তি বা অবসাদ বোধ করেননি।

সোফায় গিয়ে বসলেন আবার।

উঠি উঠি করছেন, সেই সময় দেখা গেল যাকে তাকে এখানে দেখবেন ভাবতেই পারেননি।

শামিমা এগিয়ে এসে বলল হাসিমুখে—দুলাভাই, ভালো আছেন?

সৈয়দ মুসাররাত হোসেন বললেন অবাক হয়ে—শামিমা, তুমি এখানে কি করে?

—আমি মেয়ের ফুপু, দুলাভাই। তা আপনার খাওয়া হয়েছে? শামিমা জিগেস করে।

শামিমাকে দেখে সৈয়দ মুসাররাত হোসেন অনেকদিন পরে উদ্দীপনা বোধ করলেন যেন। কী-যে লাবণ্যময়ী সুন্দর চেহারা ছিল শামিমার। এখনো তেম্নি আছে। শুধু মোটা হয়েছে। শামিমাকে প্রথম যখন দেখেছিলেন, তখন সে সদ্য কিশোরী। রোকেয়ার খালাতো বোন। বিয়ের পরে, ছেলে তখন শিশু, কী আনন্দে বেড়াতে গিয়েছিলেন ওদের খুলনার বাড়িতে। কী অপরূপ আনন্দে কেটেছিল কয়েকটি দিন।

সৈয়দ মুসাররাত হোসেন হালকা মেজাজে বললেন—ডাক্তার শাহেব কোথায়?

শামিমার বরের খোঁজ নিচ্ছিলেন সৈয়দ মুসাররাত হোসেন।

—ডাক্তার শাহেব সৌদি আরবে। বরাবরের মতো সবসময়ই হাসিমুখ শামিমার। ছেলে-মেয়েরা এখানে, পড়ছে সবাই। তারপরই জিগেস করল—দুলাভাই আপনি বাড়ি যাবেন কী করে? গাড়ি আছে?

—না। বললেন সৈয়দ মুসাররাত হোসেন।

—দাঁড়ান। আমার ড্রাইভারের খাওয়া হয়ে গেছে বোধহয়। বলে শামিমা এগিয়ে গিয়ে একটু পরেই ফিরে এল—আসেন, দুলাভাই। আপনাকে বাসায় পৌঁছিয়ে দিয়ে আবার আসব আমি। এখানে দেরি হবে।

—কোনো দরকার নেই, শামিমা। আমি থাকি বাজারের গলির মধ্যে। সৈয়দ মুসাররাত হোসেন বললেন।

—আমি জানি। ঐ গলিতে গাড়ি যেতে পারে। আসেন।

শামিমার সঙ্গে গাড়িতে উঠতে হলো।

খুলনায় গেছেন ওদের বাড়িতে বেড়াতে। রাত্রিবেলা কিশোরী শামিমা বলল হাসিমুখে—দুলাভাই, রোকেয়াবু আমাদের সঙ্গে শোবে কিন্তু।

সৈয়দ মুসাররাত হোসেন হাসিমুখে বললেন, 'কোনো অসুবিধে নেই। তাহলে তোমরা তিন বোনের যে-কেউ—

শামিমা হাসতে হাসতে বলেছিল—যে-কেউ না। আমরা সবাই রাজি। বলে দরোজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে।

এক মুহূর্ত নীরবতা।

সৈয়দ মুসাররাত হোসেন দেখলেন রাস্তায় রাস্তায় আলো, অঘ্রাণের আকাশে অনেক তারা ॥

[২০০১]

আত্মতাড়িতেরা

১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসের ঠাণ্ডা এক অণ্ডহীন সন্ধের বিরুদ্ধে ধনুকের মতো ঘাড় বাঁকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, মনে মনে, কেউ দেখলে ভাবত পাগল, যদিও আসলে বিখ্যাত সে বাস্তবে; ফুটপাতে নামছে মুহূর্ত, দূরে-কাছে জ্বলে উঠেছে আলো, উচাটন দোকানে দোকানে, সিনেমার উন্নত ফলকে, বিজ্ঞাপনে। সেই উপস্থিত আলোয় তাকে ফেলে চলে যাচ্ছে রিকশা—ক্ষমাহীন রিকশা, ট্যাক্সি, মোটর, এক মহিলার দ্রুতগামিনী নিতম্ব, বিভিন্ন মুখের মানুষেরা—তার মনে হলো তারা ম্যাকস বিয়ারবম-এর ছবি থেকে হড়হড় বেরিয়ে এসেছে;—প্রস্তরসম জগদ্দল মুখ, পাঁচ ফুটের ছোট্ট বেঁটে মোটা লোকটা ঘড়ির কাঁটার মতো কম্পমান অগ্রসরমান দু'হাত প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে, এই অনুভবহীন চলচ্চিত্রের সম্মুখে, এত লোকসাধারণ গাড়ি-ঘোড়া বিপদ-আপদ আলো ছায়া চীৎকারের মধ্যে, বিবেক নামক আচ্ছা এক অপার শয়তানকে চিরকাল যে দমিয়ে রেখেছে ঔদাসীন্য ও অধিকতর পাপকর্ম নামক শাসনে, ছোট্ট একটি পোকার নির্দেশ দাঁড় করিয়ে রাখলে তাকে ছোট্ট একটি অচেতন পোকা, তার শিশ্ন, শীতে কুঁকড়োনো, আক্রমণের অভাবে এতটুকু। মানুষটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সম্মুখের চলচ্চিত্র দেখছিল প্রখর চক্ষে, অর্থাৎ কিছুই অবলোকন করছিল না; তার মধ্য থেকে এই ঠাণ্ডা অবচেতন কী-জানি-কী সন্ধেয় ঠেলে উঠেছিল কাম; তার মনে পড়ে গিয়েছিল তুমুল এক মেয়ের কথা, আদি সান্দ্র পুরস্কার সেখানে পাওনা, আত্মীয়া সে—নিষিদ্ধ তার সঙ্গে সহবাস, এবং সেজন্যেই অধিকতর কাম্য, এই সহবাস তাকে পাপের সমান আনন্দ দান করবে। এই ভীষণ-সুন্দর শহরে যত মেয়েলোক আছে, সকলে যদি আজ রাত্রে সহবাসের দাওয়াত করে, আমি যাব প্রত্যাখ্যানে, ঐ মেয়েমানুষটির ন্যূনতম তদন্তে যদি নিযুক্ত হতে পারি। কিন্তু এই অণ্ডহীন সন্ধে আর আসন্ন রাত্রি খারাপ : আজ ভোরবেলা আমার মন ছিল দেবশিশু-সম, এখন অবিশ্বাস্য পা ফেলেছে চোরা-নদীতে, সন্ধে আমার শত্রু, আবার বন্ধুও, বন্ধু মানেই তো শত্রু; সে আমার অযাচিত কাম জাগ্রত করেছে যা থেকে আমি এখন মুক্তি চাই না। না, আমি ভাবব না, আমি শরীরের উপর সমস্ত সদুত্তর ছেড়ে দেবো, আলুলায়িত মনকে আমি সওয়ার করব শরীরের উপর, 'আমি মনোহীন হবো, আমি মনোহীন হবো।' আপন মনে মুণ্ডুহীন হাসল মানুষটা। তিরিশ বছর বয়স অবধি মনোময় শরীরময় সংযম অভ্যাস করেছে, দেহের লেলিহান রত্ন ঠাণ্ডা রেখেছে পরম অধ্যবসায়ে; অতঃপর এক আক্রমণভুক মহিলার সঙ্গে সহবাস

ঘটে, স্বর্গের উদ্ভব, অতঃপর কেবলি ক্ষুধাপ্রবণ চীৎকার, ঝাঁপিয়ে পড়ল শনিতে-পাওয়া পৃথিবীর মতো, শরীরের জোড়া জোড়া অঙ্গ তার গভীর মজুরি খেটে গেল। 'আমি এক শান্তিকাতর শিকারী, অবশ্য নিজেই নীতিপ্রাণ ঈশ্বরের শিকার, তত্রাচ সমস্ত ভুলে গিয়ে মন-হৃদয়-বিবেক, ইত্যাদি, মানুষের যতগুলি অদৃশ্য অহেতুপ্রভব শত্রু আছে তাদের দাবিয়ে আমি বাস্তবের ঋণ মিটিয়েছি, আমাকে আমি প্রবৃত্ত-চালিত শরীরের নিকটে এনেছি। আমি কুকুরে গিয়েছি : আমি মেয়েমানুষে গিয়েছি। কিন্তু এই ঈশ্বর সমেত মেয়েমানুষটি চারি বৎসর ধরে বাঁদরের মতো নাচাচ্ছে আমাকে, নিকটে এগোতে দিচ্ছে, কিন্তু আদি অতলের চাবি রেখেছে লুকিয়ে। কী ছুঁড়ি! কী অবিশ্বাসপ্রবণ ছুঁড়ি! যদি আমি ওকে একবার মুষ্টির ভিতরে পাই। যদি ওকে জঘন্যভাবে শাস্তি দিতে পারতুম এই উপদ্রব-প্রবণতার জন্য! চমৎকার আকাঙ্ক্ষার হায় উচ্চতা, বা নিম্নতা, যদি আমাকে কেবলি বিদেশি চাঁটি মেরে না-যেত : আমি ওর মানদণ্ডহীন স্তনদ্বয়ে দুই অসীম সূচাগ্র ঠুকে ঠুকে যুক্তিবাগীশ হৃৎপিণ্ড ছোঁব, আমি ওর গভীর পরোক্ষে বন্দুকের নল স্থাপন করে অন্ধ ও বধির গুলি করব।' মুঠি পাকিয়ে মানুষটা অন্যমনস্কতাভরে চলতে লাগল সন্ধে ছ'টার বাস্তবপীড়িত ভিড়ের মধ্য দিয়ে পথ তৈরি করে করে। বদমাশ ভিড় কমে এল এক সময়, পিছনে পড়ে রইল আলোকিত প্রধান জিন্নাহ্ এভিন্যু তার জ্যান্ত কিংবদন্তী ছড়িয়ে। পরিচ্ছন্ন, কূলে-কূলে গাছ একটি রাস্তায় হাঁটতে লাগল সে : কী নির্জন চারিদিক, ঠাণ্ডা জ্যান্ত বাতাস মানুষের মতো ছুটে যাচ্ছে, গাছপালা, বাড়িঘরের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল ঐ রাস্তায় একটি মোটরকার ইঁদুরের মতো চলে গেল, রাতের ও ডিসেম্বরের চুলহীন শান্ত গাছ আপনাপন চরণভরে দাঁড়িয়ে আছে, ল্যাম্পোস্টের মাথায় মাথায় প্রস্তরসম শাদা বাতির নিঃশব্দ হাস্য কালো পিচের রাস্তার প্রতি, বাস্তবপীড়িত স্বপ্নময় এই রাস্তা, এক বিদেশিনী পার্শ্ববর্তীর পাগল হাতের নিচে পশ্চাদ্দেশ ভীষণরকম পূর্বাপরময় করতে করতে তাকে পেরিয়ে সম্মুখে পরোক্ষে চলে যায়। 'কী মজা। কী মজা! বিপদ-আপদে! কী মজা ভুলে যাওয়ার পর মনে হওয়ায়! ভুলেই গিয়েছিলুম আজ ও যেতে বলেছে আমাকে!' প্রসন্নতাভরে তার পায়ের গতি দ্রুত হলো। কিন্তু বিপদ, এই বিপদ আছে সমস্ত পশুপ্রাণ সুখের মধ্যে, সুখের মধ্যকার ভয়ের মতোই, বিষাদের নমনীয়-বলীয়ান সাঁড়াশিগণ পেয়ে বসল তাকে, কারণ যুক্তিপ্রধান যাতায়াত চিরকাল তাকে এখানে ঘাড় ধরে নামিয়ে আনে। 'ছুঁড়িটি যে আমাকে বাঁদরসম নাচাচ্ছে; তার জন্য ছুঁড়িটিকেই ঠিক দায়ী করা যায় না, ওর ঘনিষ্ঠেরাই যেন ওকে তদন্তে লাগিয়ে আমাকে মানদণ্ডহীন নাচাচ্ছে। কেননা রক্তের ভিতরে আমি জানি, ছুঁড়িটি আমার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে, অবশ্য ভালোবাসা নিশ্চয় নয়, মেয়েমানুষের চিরকালীন আক্রমণলোভ, উপদ্রবলোভ, শাস্তিলোভ। কিন্তু কেবলি বাদ সাধছে হাসির হাড়ে হাড়ে চালিত ওর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরা। ছুঁড়িটি আমারও নিকটাত্মীয়, রোজ আমি যেতুম ওদের বাড়ি, আলাপ থেকে প্রলাপে গড়াল। কিন্তু যখনই আলাপের ছলে আমার মধ্যে কাম জাগ্রত হয়েছে, দরোজায় দেখেছি তালশাঁসের মতো প্রখর ও শান্ত এক জোড়া চোখ, আমার বোনের, আমি তখন বাঁকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে পশ্চাতে লুকিয়ে ফেলেছি

নিজেকে। তখন ভেবেছি, কেন আমি লোকচক্ষুর সম্মুখে জানোয়ারশোভন ব্যবহার করতে পারি না, তখন আমি সত্যি প্রার্থনা করেছি 'যেন একটি জন্তু হয়ে যাই বিশ্বনাথ, আমাকে জন্তু করে দাও, ওদের গৃহপালিত কুকুর নিতান্তপক্ষে, যেন নির্বিবাদে চক্ষুস্থাপন করতে পারি ওর শরীরের যে-কোনো স্থানে, যেন স্বর্গ থেকে মুষ্টির ভিতরে সুযোগ খশে পড়বে জিহ্বাবিন্যাস করতে পারি ওর শরীরের যে-কোনো স্থানে।'—এইসব অসম্ভব আমার কামনায় একলব্যের প্রকাশ। কিন্তু আত্মীয়েরা মানা তুলে রইল আমাদের দুজনকে আলাদা করে : আমি যখনই আক্রমে পৌঁছেছি, কিংবা ছুঁড়িটি, দেখি সব সামাজিক মুখ কুটিল চক্ষে যাতায়াত করছে আমাদের চারিপাশে; ও ভীত হয়েছে, সরে গিয়েছে পশ্চাতে, আমি ভীত হয়েছি, সরে গিয়েছি পশ্চাতে। আজ চারি বৎসর ধরে, একই শহরে থেকে আমরা পরস্পরকে কেবলি কামনা করেছি নিকটে; কিন্তু আদি লেনদেন রয়ে গেল অসম্ভবে, এখনো। আমি অবশ্য ক্ষুধাভরে অন্যফল ছিঁড়েছি; ছুঁড়িটি অন্যত্র যাতায়াত করছে কিনা জানি না—ছুঁড়িটি অন্যত্র গেলেও ওর প্রতি আমার প্রবৃত্তিবাগীশ মনোবিন্যাস ফেরেনি। কী জানে যে ছুঁড়িগণ : একবার আকর্ষণ তৈরি হলে চারিদিক ভয় দেখালেও শেষাবধি না-দেখে লোকে ফেরে না। পুরুষেরা ভাগ্যচালিত, ছুঁড়িগণ ভাগ্যনির্মাতা। আমি অবশ্য ঠিক বুঝতে পারি না : ছুঁড়িটিই আমাকে এইমতো নাচাচ্ছে, না কি ভাগ্যশক্তি? তবে পরিবেশ ও আত্মীয়দেরই আমি দোষ দেবো : এটা কোনো আত্মিক সমস্যা নয়, বাহ্যিক ভাগ্যরহস্য। আমার নিজের মধ্যে এই অবৈধ সংগমের আনন্দই বড়, দ্বন্দ্ব নেই, আমি দ্বন্দ্বরহিত, নিজের সঙ্গে কোনো চক্রবর্তী বিরোধ নেই আমার।' ভাবনাপ্রবাহ যখন এরকম জটিল পথে চলেছে, লোকটা ঘাড় নিচু করে চলে যাচ্ছিল খণ্ড পত্রিকা মাড়িয়ে রাস্তার উপরকার। এখন সময় এসেছে ভাবনাগুলি সংকলনের, কিন্তু মনে মনে যেইমাত্র সাজাতে বসল সে, অমনি রাস্তার উপর ঝুঁকে-পড়া গাছসকল থেকে কেঁদে উঠল একটি প্যাঁচা এবং সে দাঁড়িয়ে পড়ল, শহরের কোনো পথে এরকম প্যাঁচার পাণ্ডিত্য শুনতে পেয়ে নিজের সৌভাগ্য মানলে। চাঁদের ভালোমানুষ আলোয় প্যাঁচাটিকে স্পষ্ট দেখতে পেল, 'নিশ্চয় এটি ছুঁড়ি-প্যাঁচা', চোখ টিপল সে প্যাঁচাটির চক্ষের প্রতি। পরমুহূর্তে প্যাঁচাটি আলপিনবিদ্ধ হয়ে পুনর্বার কেঁদে উঠতেই, ভয় পেয়ে কিছুদূর ভাবনারহিত ছুটে গেল, যেখানে রাস্তাটি যেন এই ভীষণ শহরের ভয়ে তারাসকলের দিকে ঢালু হয়ে গেছে নেমে। কিছুক্ষণ সে ভাবনারহিত হয়ে রক্তচালিত হয়ে শ্বেত চাঁদের নিচে চলতে লাগল। তারপর ঘোর মোড় ফিরে লোকজনের গাড়িঘোড়ার বিপদআপদের দেখা পেলে ফের যেন, এই রাস্তা তার একাকিত্ব থেকে উদ্ধার করল তাকে : মনে মনে এই পরিচয়হীন চলমান লোকসকলকে ধন্যবাদ জানালে—ধন্যবাদ, অপরিচিত লোকসকল! আমি বহুদিন থেকে নিত্য প্রার্থনা করি : আমি মনোহীন হবো, কিন্তু এক পা-ও বোধহয় অগ্রসর হইনি ঐ পথে। আমি এখনো ভয়ের অতীত হইনি। নির্জনতা থেকে ছুটে এলাম তাই। কী করে আমি নিজেকে দ্বন্দ্বরহিত মনে করেছিলাম কিছুক্ষণ আগে? যে দ্বন্দ্বরহিত, সে কী এত ভাবনায় ভাসে? মৌল রাস্তাটি এড়িয়ে আমি কোথাও যেতে পারি না; জড়িয়ে আছি চক্রবর্তী অঙ্কের

চক্রান্তে—আমার নিজেরই ভিতর থেকে নিঃসৃত। অবশ্য এই অন্তর্গত দ্বন্দ্বের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে আমার কাম, তাই ভীষণ বাঁচোয়া, আমার সমুদয় বাধা ও ব্যাঘাত মনোলোক থেকে উৎসারিত নয়, বাইরের মানুষ ঘিরে। বাইরের বাধা ও ব্যাঘাত দীর্ঘজীবী হলেও হঠাৎ কোনো দিন ছোট্ট একটি ছিদ্র, অন্তত সশঙ্কভাবে, পেয়ে যাব আমি—এই ভেবে আমি নিজেকে চালিয়ে এনেছিলাম বহুমান্য দিবারাত্রির মধ্য দিয়ে। আজই, যদি আমার ভাগ্য চিরাচরিত চাঁটি না-মারে, হয়তো সেই সমাজঅসম্মত রাত্রি আসন্ন।' তখন সে খুশিভরে হাঁটতে লাগল, বড় রাস্তা পশ্চাতে ছেড়ে, ছোট একটি কানাগলির চোখের মধ্য দিয়ে রাজার মতো। 'কয়েক দিন আগে খুব অসহায় অবস্থায় পড়ে গিয়েছিলাম ওদের বাড়িতে; ওকে একেলা ঘরে দেখে আমি একটু ক্লিন্ন প্রত্যঙ্গ-প্রবণ হয়েছিলাম, আমি ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে প্রত্যঙ্গ-প্রহার করছিলাম, আর ও বিপন্ন বিস্ময়ে একদৃষ্টিতে দাঁড়িয়েছিল।' ঘটনাটি মনে পড়ায় তার কটিতলে তৃতীয় চক্ষু উদ্ভিন্ন হলো। 'কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হঠাৎ বাড়ির একটি দাসী ঢুকে পড়েছিল ঘরে, আমি পাগলের মতো দ্রুত সম্ভ্রম টেনে দিলাম, অন্যত্র ও চক্ষুনিবেশ করলে। দাসী চলে গেলে আমাকে ও হাতুড়িসম ধমক বসিয়ে দিলে, আমি হাসতে চেষ্টা করলুম বটে, কিন্তু সেদিন সারাদিন এই হতভাগ্য ঘটনাটি ভুলতে পারলুম না। দাসী দেখেছে কি দ্যাখেনি,—এই জিজ্ঞাসা সমস্ত অনুসঙ্গসমেত কয়েকদিন আমাকে বদমাশ মানুষের মতো কামিয়ে কামিয়ে খেল—আমি কয়েক দিন পাগলের মতো আপন প্রত্যঙ্গপ্রহার করে বেড়ালাম। গতকাল রাত্রে যেন ঐ কদিনের ফল প্রসব হলো : স্বপ্নে আমি দেখলুম কয়েকজন লোক, তারা ছুঁড়িটির আত্মীয়দের, অর্থাৎ আমারও বিকৃত চেহারা ধারণ করেছে; সেই কয়েকজন আমাকে ভুলিয়ে এনে জোর করে আমাকে মাতৃগর্ভে ঢুকিয়ে দিতে চাচ্ছে, আমি কিছুতেই যাব না, কিন্তু সেই কুঁকড়োনো আত্মার অস্বচ্ছ ও পরিবর্তমান লোকসকল আমাকে জোর করে ঢুকিয়ে দিতে চাচ্ছে। আমি আদর্শ চীৎকার করে উঠলুম, 'আমাকে কেন ফিরিয়ে দেবে?' তারা আদর্শ চীৎকার করে, আদিম হো-হো হাস্য উড়িয়ে বলছে, 'জন্ম, তোমার ভুল জন্ম হয়েছিল। তুমি জন্মের যোগ্য হওনি। তোমার ভুল জন্মের মাশুলে আমরা ভুগছি। আমাকে ওরা ফেরত করলে। কালো, বিরাট হাতির মতো দোতলা একটি বাড়ির সম্মুখে এসে লোকটা দাঁড়িয়ে থাকল সদ্যোজাতের মতো দাগ না-পড়া মন নিয়ে; একবার তাকাল উপরে, শহরের পূর্ব আকাশ যেখানে আলোময়, কিছুক্ষণ আগে ঐখানে ঘুরছিল সে, ঐদিকের লম্বা রাতের ও ডিসেম্বরের গাছের গলায় শ্বেত মুদ্রার মতো আটকে গিয়েছে চাঁদ। দরোজায় কড়া নাড়ল ইঁদুরের মতো তার হাত; অন্ধকার সারা বাড়িটায় সেই শব্দে কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না, শুধু দোতলার একটি কক্ষে হেঁকে উঠল আলো, সমগ্র বাড়িটির মধ্যে দোতলার একটিমাত্র জানালার চতুষ্কোণ আলোকিত হয়ে উঠতে তার মনে হলো, যেন কোনো একচক্ষু শয়তান একটিমাত্র চক্ষে আলো বিকোচ্ছে আর তারপরই দরোজা খুলে গেল। ছুঁড়িটি। মন নেই, তবু অনেক অবান্তর কথা বলতে হয়। মৃত মানুষের জন্য আগামীকাল নেই, তাই প্রতীক্ষা সয় না। অন্যমনস্কতাভরে কুশলাদি বিনিময়, সরকারের বিরুদ্ধে অননুভূত নালিশ, আদি

উত্তেজনাকে আক্রমসম্মত বোরখা পরিয়ে কয়েকবার সিঁড়ি মাড়িয়ে দোতলায় পাঠিয়ে দিল। এক আত্মীয় মরণের পরোক্ষে গমন করেছেন, উপলক্ষে বাড়ি-শুদ্ধু সবাই সেখানে গেছে; লাশ দেখলে ওর ভয় লাগে, তাই যায়নি। কিন্তু আঁধার ভয় লাগে না? 'একা বাড়িতে ছিলে যে ভয় লাগেনি?' লোকটি এই গভীর জিজ্ঞাসা না-করে পারল না। 'তুমি আসবে জানতুম, তোমাকে তো আসতে বলেছিলাম।' লোকটি স্ফিঙ্কসের মতো হাসতে চেষ্টা করলে, 'আমাদের ভাগ্য ভালো : তুমি আমাকে আসতে বলেছিলে, আর আজই কিনা বাড়িতে কেউ নেই। আচ্ছা, সে-দিনের ব্যাপারটির জন্য আমার ভয় লাগে, জানাজানি হয়েছে কি, মেয়েলোকটি সবাইকে বলে দিয়েছে?' মেয়েটি শুধু কেনা হাসি হাসল—উত্তর বাদে। 'কেন যে তুই হাসিস, তোর হাসিটি বড় বিশ্রী, দাঁতের উপরের লাল অংশ বিশ্রীভাবে বেরিয়ে চেয়ে থাকে, মেয়েমানুষের যে একটি স্বভাবজ সচেতনতা থাকে, হায়, তা-ও তোর নেই।' মেয়েটির পশ্চাতে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে লোকটা আপন মনে বলল।—উপরে মেয়েটির শোবার ঘরে পৌঁছে, ওরা বসল। তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, 'আজকের মৃত হে। তুমি মরে গিয়ে আজ আমাদের দুই বিভিন্নকে সুযোগ করে দিলে মিলিত হবার; মৃত অপরিচিত মানুষ এভাবে সাহায্য করতে পারে জানতুম না; তোমার কুশল প্রার্থনা করতে পারতুম, কিন্তু তুমি বস্তুসকলের অতীতে চলে গেছ, তাই তোমার আত্মা—আত্মা কী, আত্মা কোথায় থাকে জানি না—তবু সাধারণ যে-ভাবে বলে থাকে তার অনুকারে বলি : তোমার আত্মার শান্তি কামনার কোনো অধিকার আমার আছে কিনা জানি না, কেননা আমি একটি তথাকথিত পাপ করতে যাচ্ছি—"তথাকথিত" বলছি এজন্য যে এটাকে পাপ বলে মনে করি না। পাপ কোনো মানুষকে অর্শায় তখনই, যখন সে উপস্থিত হয় ভাবনায়, আমি দায়মুক্ত। কিন্তু সত্যিই কি আমি ভাবনামুক্ত? তুই, ছুঁড়ি, চুল খুলছিস এখন, ভয়ে আমার বুক কাঁপছে কেন? একটু আগে, অকারণে, সম্পূর্ণ অকারণে, কেন আমার সিঁড়ি গিয়ে উঠতে উঠতে মনে হচ্ছিল হাঁটুর বল্ দুটি খুলে পড়ে যাবে, আর তোর ছোট ভাইটি—বকবকের রাজা—তাই নিয়ে হয়তো কাল ভোর থেকে খেলা শুরু করে দেবে? কিন্তু তোর সাহসের প্রশংসা করি, তুই এখন খাটের উপর পা তুলে বসে হাসছিস, কামনার হাসি, ম্লান কামনা-ভরা হাসি বারে বারে ব্যর্থ হচ্ছে, জোর-করা হাসি তবু।' ছুঁড়িটি তারার মতো বিড়বিড় করে বললে, 'বাড়ি থেকে কখন বেরিয়েছ? খিদে লেগেছে নাকি? কিছু খাবে?' মুখে হেসে মানা করে, মনে মনে সে একটি অশ্লীল উক্তি করলে খাদ্যবিষয়ক। লোকটা একটু একটু কাঁপছে কামনায়, ছুঁড়িটিও; চেয়ার থেকে উঠে খাটের দিকে অতিচৈতন্যের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ অচেতনতায়, লোকটা যাবতীয় ভাবনা পরস্পরের উপর চাপিয়ে এগোতে লাগল। ছুঁড়িটি চেষ্টাকৃত অবহেলাভরে ভীষণ অশংক আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে শুয়ে পড়ল অচিন্ত্য শয়নে। লোকটা খাটের উপর পাশে বসে পড়ল দুই পা ঝুলিয়ে মেঝেয়। 'আমাদের দুজনের ধর্মাধর্মহীন পারস্পরিক কামনা, এক মৃতের সৌজন্যে, আজ বস্তুত চরিতার্থ হবে।' উপদ্রবলোভী ছুঁড়িটির শরীর উদ্বেল, কম্পমান, অগ্রসরমান, চক্ষু তমসায় যাতায়াত করে, মুখমণ্ডল এক পাশে কাত হয়ে আছে; মুখের কোমল

অংশ তার দিকে নিয়তিসমান লোভায় বলে মানুষটার হাত নিশপিশ করে ওঠে, পরমুহূর্তে ছুঁড়িটির গালের উপর পর-পর কয়েকটি প্রকৃত চাঁটি এসে পড়ে, চোখ খুলে আশ্চর্য ছুঁড়িটি তাকায়, গভীর, নিবিড়, স্বপ্নসম, 'যেন তীক্ষ্ণ আলপিনচক্ষে আমার মানবেন্দ্রকে বিদ্ধ করছে কুশল ছুঁড়িটি' মানুষটি এইমতো ভাবল। কিন্তু তখন, ঘোর মায়াবন পশ্চাতে হঠিয়ে, তার লাল বল জাগ্রত হয়েছে; তার আক্রমসম্মত বাণী ঝরে পড়ছে ন্যস্ত ছুঁড়িটির যুক্তিহীন চক্ষে, কেশগুচ্ছে, তোষামোদকাতর দেহদৈর্ঘে; তার আক্রমসম্মত হাত ছুঁড়িটিকে বস্ত্রহীন আক্রমণবিন্যাসে ভরে দিতে যাতায়াত করে। কিন্তু যখনই অপসারিত হলো হায় ব্লাউজ, চীৎকার করে উঠল মানুষটা, 'একি তোমার তিনটি স্তন! একি তোমার তিনটি স্তন!' তার মনোহীন মুখ হঠাৎ নীল হয়ে গেল, শিশ্ন মুহূর্তে গুটিয়ে এতটুকু, দরোজা খুলে সিঁড়ি ভেঙে দরোজা খুলে পালিয়ে যায় ॥

[১৯৬২]

মাতৃহননের নান্দীপাঠ

[১৯৫৭-১৯৬০]

পৃথিবীতে মা আমাকে সবচেয়ে ভালোবাসেন, এবং আমি তাঁকে। যেখানেই আমি যাই দুটি নির্নিমেষ চোখ পিছনে ছুটছে, পিছলে পড়ছে না একবারো, সরে যাচ্ছে না, এমনকি পলক ফেলছে না কখনো, যেন মানুষের চোখ নয়। মানুষের অবশ্য, তবু মানবীয় নয়। দানবীয় এক যন্ত্রে পরিণত হয়েছে যেন, দিনে-দিনে, মানুষের চোখ হলে তো ক্ষণে ক্ষণে পলক পড়ত। মানুষের চোখই ভীষণ এক যন্ত্রে পরিণত হয়েছে, যে যন্ত্র অবিরাম বেজে চলেছে ধ্বকধ্বক, আমার জন্মলগ্ন থেকে অন্তিম প্রহর অবধি কণ্ঠস্বর বিছিয়ে আছে। না, বিছিয়ে নয় ('বিছানো' শব্দটি তো শান্তির প্রতীকপ্রায়) আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে মৃত্যুর অভিমুখে, কবর পর্যন্ত আমাকে পৌঁছিয়ে না দিয়ে যেন শান্তি নেই তার। আমার হৃৎপিণ্ডের মতোই আমার মৃত্যু অবধি যাত্রা তার—না, হয়তো তারও পরে, আমার মৃত্যুর লক্ষ-লক্ষ বৎসর পরে, শুধু আমি তখন জানব না, যে আমার কবর অবধি হানা করে; কেননা সে পরিণত হয়েছে যন্ত্রে (মানুষের মৃত্যু আছে, যন্ত্রের তো মৃত্যু নেই), যন্ত্রপিণ্ডে। হৃৎপিণ্ডে মমতা ও উত্তাপ থাকে বলেই, হৃৎপিণ্ড নশ্বর বলেই তার দ্যুতি হীরে-কাটা ছুরির মতো; কিন্তু এমন যদি নিয়ম থাকত হৃৎপিণ্ডে মমতা ও উত্তাপ থাকতে হবেই কিংবা হৃৎপিণ্ডে মমতা ও উত্তাপ ছাড়া কিছুই থাকবে না—না ঘৃণা না হিংসা না ক্রোধ না আক্রোশ তাহলে হৃৎপিণ্ড তৎক্ষণাৎ পরিণত হতো যন্ত্রপিণ্ডে—যার মৃত্যু নেই, এবং যা মৃত, নির্জীব গুটিকতক নিয়মের ক্রীতদাস, লুটিয়ে থাকে, অকর্মণ্য। মা-র ভালোবাসা আমার পক্ষে অমনই, অমনই ভীষণ, অমনই নিঃস্বপ্ন যন্ত্র—যার ভিতরের ভরে দেওয়া আছে স্তর-স্তর মমতার বিরাট একটি পিণ্ড যা থেকে নিয়মিতভাবে এক নিঃসরণ চলেছে আমার দিকে, যা আমাকে উন্মাদ করে তুলেছে। এই আমাকে, যে-আমি দর্শনের একজন দারুণ ছাত্র, বুদ্ধিজীবীদের মতোই যার মুখ লম্বাটে, চোখ স্বপ্নিল যে-চোখ অযুত গ্রন্থের চোরাবালি অতিক্রম করে জ্ঞান নামক বিদেহী সমুদ্রে ভাসছে সারাক্ষণ, কৃশ দীর্ঘ শরীর (যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এমনকি আমিই সন্দিহান)। সেদিন কি-একটা ইংরেজি বইতে পড়ছিলাম ধরা পড়লে গুপ্তচরদের কিভাবে শাস্তি দেয়া হয়। নানা ধরনের বইতে নানা ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা আছে, একটি এই মুহূর্তে মনে পড়ছে : খুব ছোট একটি সেলে ভিতরে তুমি বন্দী, সেলটি এত ছোট যে শুয়ে বসে যেমন ভাবেই তুমি থাকো না কেন তোমার

মাথার উপরকার নলটির নিচ থেকে তুমি সরে যেতে পারো না, সেই সরু নল থেকে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর পর পর তিন ফোঁটা পানি এসে পড়ছে তোমার শরীরে—আর কিছু না, তোমার শাস্তি এটুকুই। এই পাঁচ মিনিট যে একই সঙ্গে সাত মাইলের মতো দীর্ঘ এবং এক মুহূর্তের মতো দ্রুত হতে পারে, এবং সমস্ত চিন্তার হত্যাকারী, ফলত অসহ্য—অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তা জানেন। কিন্তু এ আমার কী ভীষণ কথা মনে পড়ল হঠাৎ। আমার মা-র ভালোবাসা কি এমনি নিয়মিত একটি সময় অন্তর-অন্তর চুঁইয়ে পড়ছে আমার মাথার উপর, যা থেকে আজীবন আমার নিষ্কৃতি নেই? কিন্তু হে ঈশ্বর, এ আমি কি ভীষণ কথা ভাবছি। 'এমন ভাবনা তোমার ত্যাগ করা উচিত, দরকার হলে চেষ্টা করেও', ফিলসফির দারুণ ছাত্র আতিকুল্লাহকে আমি আমার সম্মুখের চেয়ারে বসিয়ে বোঝাতে লাগলাম, 'কেননা তিনি তোমার জননী, কেননা তিনি তোমাকে স্নেহ করেন—এমন ধরনের স্নেহ যা অসীম এবং অনর্গল নিষ্কাশিত হয়, যার অভাবে দুনিয়ার অনেক মানুষ শান্তি পায় না, লালায়িত থাকে, যে-একবিন্দু অমল ভালোবাসা পাবার জন্যে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ—মূর্খ কি মহামানুষ—উদগ্রীব, যে-স্নেহ তোমার দুঃখের দিনে অমিত প্রাণশক্তির কাজ করে। তোমার সমস্ত কাজের পিছনে তাঁর উপস্থিতি অনিবরাণীয় : তুমি যখন জুতোর ডগা আয়নার মতো পিছল আর চকচকে করতে ব্যস্ত তখনো যেমন, তেমনি তুমি যখন কোনো গ্রন্থের ভিতরে ডুবে আছো তখনো অনুভব করতে পারো তোমার পিছনে উন্মুখ আছে তাঁর হাত, তাঁর চোখ, প্রার্থনাসমূহ। তোমার মা নাম্নী ভদ্রমহিলাটি একজন বিধবা ও ধনী মানুষ, তোমার জনক যখন অকালে পরলোকগমন করেন তখন তোমার মা-র বয়স ছিল মাত্র আটাশ, তিনি অনায়াসে তখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারতেন; তাঁর শরীর ও মনের চাহিদা তখনো নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ মেটেনি, দরকার ছিল বয়স্ক একজন মানুষের, যিনি তাঁকে দিতে পারতেন উত্তাপ ও নির্ভরতার বাহু। কিন্তু তোমার মা কেন, কি ভেবে শেষ পর্যন্ত বিবাহ করেননি তুমি তা জানো না—নানা কারণ থাকতে পারে এর পিছনে, যে-সব কারণের পাদপীঠ সম্বন্ধে তুমি ভাবতে চাও না, কারণ তা তোমাকে ক্লান্ত করে, বিরক্ত করে, উত্তেজিত করে। তবে তোমার মা-র শুষ্ক আলাপে ও আত্মীয়-স্বজনের কথাবার্তায় তুমি বুঝতে পেরেছ। তোমার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ তাঁর দ্বিতীয়বার বিবাহ না করার অন্যতম একটি কারণ। চতুষ্পার্শ্ব থেকে কেন জানি তিনি এই কথা বুঝে নিয়েছিলেন দ্বিতীয় বিবাহে তোমার শারীরিক ও মানসিক উন্নতি আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে—তুমি তা জানো না, বুঝতে পারো না। তাছাড়া মার পূর্ব-জীবন সম্বন্ধে এইসব কথা ভাবতে তোমার কেমন যেন খারাপ লাগে, ইচ্ছে করে তুমি এই ভাবনাকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করো, কোনো সময়ে সুস্পষ্টভাবে গুছিয়ে চিন্তা করো না। এই খারাপ লাগার নানা কারণ হিশাবে অনেকে বাংলাদেশকে উপস্থিত করেন বলেও তুমি জানো। যাই হোক, ফল হলো এই যে মার ভালোবাসা একমাত্র তোমাকে কেন্দ্র করে পাক খেয়েছে চারিদিকে, তাই আজ জীবনের প্রায় অপরাহ্নকালে তিনি "তোমাকে ছাড়া আর কিছু জানেন না।' এইখানেই তো আমার

আপত্তি, কেন আমাকে ছাড়া আর কাউকে জানেন না। 'ভুলে যেয়ো না তুমি তাঁর একমাত্র সন্তান।' কেন আমি কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারি না। তাঁর দু'টি করুণ চোখের ভাষা। কোথায় যেন একটি ছবি দেখেছিলাম : এক মহিলার অনুচিত নিতম্বের সন্ধিস্থলের ভিতর দিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সমুদ্রবেলাভূমি। আমারো কি প্রায় অনুরূপ দশা ঘটেনি? ঈশ্বর আমার পিঠে দুটি চোখ এঁকে দিয়েছেন, যে চোখ অন্য একজনের, যে চোখ আমাকে কিছুতেই একাকী হতে দ্যায় না, যে চোখ সারাক্ষণ আমাকে বিরক্ত বিব্রত বিপন্ন রাখে, এমনকি ঘুমের ভিতরে তাঁর শান্ত দৃষ্টির পাহারা থেকে নিষ্কৃতি নেই, যে চোখ শান্ত এবং ভয়ানক, শান্ত বলেই ভয়ানক। কোথায় যেন পড়েছিলাম—ভারতচন্দ্র কি গোপাল ভাঁড় সম্বন্ধে সেকথা মনে নেই—একটি গল্প : একদা সে পিঠের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখেছিল এক রঙ্গময়ী সুরঙ্গময়ীর সূচীমুখ উরোজের কলি ফুটে বেরিয়েছে কিনা! বদলে ঈশ্বর আমার পিঠে এঁকে দিয়েছেন দুটি চোখ, বিশ শতকের অস্বভাবী ও স্বাভাবিক একজন ভাঁড়ের পরিচয়-চিহ্ন। আধুনিক শিল্পী আমার শরীরকে রূপ দিলে পিঠের উপর নিশ্চয় বসিয়ে দেবে এক জোড়া ভীষণরকম শান্ত চোখ। ছেলে-মেয়ে বড় হলে তাদের উপরে নিজস্ব দায়িত্ব যে-বর্তায় মা সে কথা বোঝে না, রহস্যময় অনেক দেশ কুয়াশার ভিতর থেকে ঝিলিক দিয়ে উঠতে থাকে নতুন চেতনার নবসূর্যনীলিমাসংক্রান্তিকালে। আমার ফিরতে দেরি হয়, রাত্রি হয়, দেখি রাস্তার দিকে চেয়ে মা অপেক্ষায় আছেন। অভিযোগ করেছি কতদিন, কিন্তু বুঝেও বুঝলেন না মা। রাস্তাঘাটে বেরোবার আগে কতবার যে সাবধান করবেন তার ইয়াত্তা নেই। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দেরি হয়ে গেলে বাড়ি ফেরায় মা-র অস্বস্তি মনে করে আমি কিছুতেই স্থির থাকতে পারি না; কিন্তু নির্ধারিত সময়মতো কিছুতেই আমি ফিরতে পারি না, যেন নির্ধারিত সময় উতরে দেয়াই আমার উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল। যেহেতু একদিকে মা-র ইচ্ছা আর-একদিকে আমার চেষ্টা এবং এ দুটি আমার ভিতরেই সংঘটিত হচ্ছে, যেহেতু একই সঙ্গে এই সমরে আমি যোদ্ধা ও দর্শক, আমারি দুটি অংশের প্রতিরূপ, অতএব আমি ছিন্নভিন্ন হতে লাগলাম। অবিচ্ছিন্ন এই যন্ত্রণা আমার গা বেয়ে বেড়ে উঠল চূড়ান্ত পর্যায়ে, যখন দেখলাম আমার আর রিনার ভেজানো দরোজায় আঁকা আছে দুটি ভয়াবহরকম শান্ত চোখ। মুহূর্তে সেই সাবানের ফেনার স্তূপের মতো বালিশ, গভীর নরম শয্যা, দেয়ালে বিজড়িত ছায়ায় আপন চিত্র, রিনার কৃশ সোনালি বন্ধুর শরীর ঘন নিশ্বাসের স্পর্শনীয় শাঁস, তার খুলে-রাখা শ্রোণীচক্র, নাভি থেকে উষ্ণ উজ্জ্বল অগুপ্ত আরণ্য ব-দ্বীপ অবধি চিকচিক রুপালি জলরেখা, মোহনার মোহ : এই সব, এই সমস্তের বদলে পাগল করে দিলা বন্ধ দরোজার নিষ্পলক ভীষণরকম শান্ত দুটি চোখ। আর সেইদিনই আমার পথম মনে হলো, এমন হয় না যে ঐ শীতল মুখটার ভিতর থেকে লকলকে ছুরির মতো বেরিয়ে পড়ে জিভ, মার্বেলের মতো চোখের মণি দুটি ঠিকরে বেরিয়ে আসে। না, এতো রূঢ়ভাবে নয়, শুধু অপসারণ আমি চাই, ঐ দুটি ভীষণ রকম স্তিমিত ও প্রোজ্জ্বল চোখের অভাব বেজে উঠুক আমার স্বভাবে।

[১৯৬০-১৯৬১]

পেয়েছি। আমি 'কারণ' পেয়ে গেছি। আমার আর কোনো ভয় নেই, আমি খুঁজে পেয়েছি সমন্বয়ের রাস্তা কিমাকার নৃত্যের ভিতরে পুনরাবৃত্ত মুদ্রার মতো। তাই আমার খুশি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ঘৃণা, বেদনা, আক্রোশ কেন আমাকে পর-পর এসে শিকার করে নিয়ে যাচ্ছে তরঙ্গের অন্ধকার অন্তরে তা আমি বুঝতে পারি না, কেন বারবার ছিঁড়ে যাচ্ছে যুক্তিজাল, দৃষ্টি কুয়াশায় আচ্ছন্ন। আমার সুখী হওয়া উচিত ছিল, যে-ঘটনা আসন্ন হয়ে উঠেছে তাতে আমার সুখী হওয়াই উচিত ছিল। প্রায় অপ্রত্যাশিত, অবিশ্বাস্য ঘটনা। নিজে এই সব ইশারা চতুর্দিকে খেলে যেতে না-দেখলে বিশ্বাসও করতাম না হয়তো। হঠাৎ একদিন বাইরে থেকে ফিরে এক ভদ্রলোককে দেখলাম বসে আছে ঘরে ভিতরে। একটা ম্যাগাজিনের পাতা এমন অলসভাবে উলটাচ্ছেন, মনে হয় অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকবেন। আমাকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হলেন, মা আরক্তিম মুখে প্রথমে কিছু বলতে পারলেন না, পরে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, দূর সম্পর্কের একজন আত্মীয় বলে। আমি ভিতরে চলে এলাম, আমার কেন যেন খারাপ লাগছিল। দু একটি কথা বলেই আমি তাই সরে এলাম। আমার তখন মনে পড়ল ঘরের ভিতরে আমি একদিন আধপোড়া একটি সিগারেট দেখেছিলাম, তখন এ সম্বন্ধে কিছুই ভাবিনি, মনে করিনি উল্লেখযোগ্য। আর তার মানে লোকটা কেবল আজ আসেনি, এর আগেও এসেছিল। যে কোনো কারণেই হোক মা আমাকে লোকটার কথা বলেনি, অবশ্য মা আমাকে অনেক কথাই বলেন না—হয়তো বলার কিছু ছিল না। স্বভাবত আমি একটু গম্ভীর প্রকৃতির; আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যাওয়া-আসা করিনে, কচিৎ তাদের সঙ্গে দেখা হলেও বিশেষ কথা জোগায় না আমার মুখে এ নিয়ে আত্মীয়-স্বজন তো বটেই মা'রও ক্ষোভ আছে। লোকটার কথা আমাকে না বলার পিছনে এটা একটা কারণ হতে পারে। ক্রমশ লোকটা প্রায়ই আসতে লাগল, যে কোনো সময়ে বাড়ি ফিরলে দেখতে পেতাম মা-র সঙ্গে বসে বসে গল্প করছে। কী এমন কথা থাকতে পারে যে রোজ এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলেও শেষ হয় না—মনে মনে আমি ভাবতাম। আমি, যে নাকি গম্ভীর প্রকৃতির ও ঘরকুনো, বাইরে থাকতেই ভালো লাগতে লাগল আমার, সারাদিন প্রায় বাইরে-বাইরেই কাটছে। মা দেখি আগের মতো খোলাখুলিভাবে অপেক্ষা করেন না আমার জন্য আর সবচেয়ে খারাপ লাগে আমার, মা-র সঙ্কোচ। সারাক্ষণ একটা সঙ্কোচ আর অপরাধ যেন তাঁকে ঘিরে থাকে—কিছুতেই আগের মতো সহজ স্বাভাবিক হতে পারেন না আমার কাছে। আগে আমাকে 'তুই' বলে ডাকতেন, আজকাল দেখি 'তুমি' বলেন। আমার সম্বন্ধে মার সমস্তরকম উদ্বেগ, এতদিন যার প্রকাশ ছিল বিনগ্ন, এখন কেমন প্রচ্ছন্ন ঠেকে, ঠিক মুখ ফুটে তিনি জিজ্ঞেস করতে পারেন না। বাইরে থেকে দেরি করে এলে দেখতে পাই একটি কষ্ট নীলচে হয়ে ছড়িয়ে আছে তাঁর মুখে, কিন্তু স্পষ্ট করে আগের মতো বলতে পারেন না কেন দেরি করে এলাম, কেন তাঁকে কষ্ট দেয়া অকারণে। এটা আমার খারাপ লাগে : মনের কষ্টের এই নগ্ন অথচ প্রচ্ছন্ন প্রকাশ। আগে যদিও খারাপ লাগত মা-র অপ্রকট সততা, স্নেহের নিরঙ্কুশ প্রকাশ, এখন

মনে হয় সেও ভালো ছিল। এই কিছু না বলে অনেক বলায় আমার যন্ত্রণা বেড়ে ওঠে গা বেয়ে। মা-র এই পরিবর্তন ঘৃণা, বেদানাও আক্রোশের জন্ম দিতে থাকে আমার ভিতরে। 'তুমি ফ্রয়েড পাঠ করেছ, অতএব তোমার বোঝা উচিত কেন তোমার মা এই বয়সে দ্বিধায় পড়েছেন।' নির্জন রেস্তোরাঁয় একা বসে বসে আতিকুল্লাহকে সুমুখের চেয়ারে বসতে বলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমি পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করি, 'তোমার পিতার অকালমৃত্যুর পর দীর্ঘ সতেরো বৎসর তোমার মা একাকী আছেন, একাকী মানে কেবল তোমাকে, তাঁর সন্তানকে নিয়ে। আর তাঁর পয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে, জনমতে জীবনের সুস্বাদ মুহূর্তগুলি রূঢ় রৌদ্রের ভিতরে ঝরিয়ে দিয়ে, উদ্বেল হয়ে উঠেছে তাঁর বাসনা, এই পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে জীবনের তথাকথিত বিপজ্জনক প্রহর কাটিয়ে এসে ভেঙে ছারখার হলো সংযম তাঁর—ফেঁসে গেল সমস্ত বন্ধন। বিবাহের উপযুক্ত সন্তানের সুমুখে আজ তিনি নগ্ন, লজ্জিত, অসহায়।—তোমার বোঝা উচিত, মা কেন এ দ্বিধায় জর্জরিত হচ্ছেন, সেই যন্ত্রণা তোমার বোঝা উচিত, তুমি বুঝতেও পারো, তাঁর একদিকে প্রবৃত্তি আর একদিকে তুমি মূল ধরে টান দিয়েছ। কোনো পক্ষই যেহেতু এখনও বিজয়-পতাকা ওড়াতে পারেনি, অতএব, তাঁর যন্ত্রণা তো স্পষ্ট। তুমি শিক্ষিত, মা-র অবস্থা ভালোভাবেই বুঝতে পারো, তাই তোমাকে তাঁর প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হওয়া উচিত। কেন তুমি উল্টো ঘৃণা, বেদনা, আক্রোশের শিকার হও, বুঝতে পারিনে। তোমার তো খুশি হওয়াই উচিত ছিল, তুমিই তো চেয়েছিলে মা-র ভালোবাসা একা তোমাকে আর যেন না বহন করতে হয়। একথা তুমি তো ভেবেছো অনেকবার, মা-র হৃদয়ের ভিতরে কোনো সঙ্গী থাকলে তাঁর ভালোবাসার ভার অসহ্য হয়ে উঠবে না তোমার কাছে। এই মধ্য বয়সী, পরিচ্ছন্ন, ফিটফাট ভদ্রলোকটিকে মা যদি বিবাহ করেন, আর তার আভাস তো পাওয়াই যাচ্ছে, তো তোমার সুখী হওয়া উচিত। প্রথমত, মার হৃদয়ের একজন সঙ্গী জুটবে এই ভেবে—তুমি বড় হয়ে গেছ, মা আর তোমাকে নিজের মতো করে পান না, তাছাড়া মার প্রতি তোমার বিরক্তি উক্ত বুদ্ধিমতী মহিলার কাছে প্রচ্ছন্ন নয় তা-ও জানে। দ্বিতীয়ত, মা-র একজন সাথীও জুটলে তাঁর ভালোবাসা তোমার পক্ষে সুসহ ও পুষ্টিদায়ক হয়ে উঠবে, যা তুমি এতকাল নীরবে অনুভব ও প্রার্থনা করে এসেছ। নিজেকে তিনি আর একলা মনে করবেন না, করবার মতো কিছু কাজ তিনি পাবেন, তাঁর হৃদয়ের কিছু অংশ অন্য একজনের ভালো-মন্দে জড়িত থাকবে—হয়তো তিনি সুখীও হবেন। আর মা-র সুখেও তোমার খুশি হওয়া উচিত। অতএব অনর্থক ঘৃণা, বেদনা, আক্রোশে নিজেকে বিনষ্ট করবার তোমার কোনো মানে হয় না।' ঘৃণা—কেননা এত বড় ছেলে সুমুখে মা আজ নগ্ন; নগ্ন এবং পরাজিত। যদি সতেরো বৎসর আগে এই ঘটনা সংঘটিত হতো তাহলে নিশ্চয় মা-র জন্য আমাকে ঘৃণায় কুণ্ঠিত হতে হতো না, মা-র নিজের শক্তি নেই, সতেরো বৎসর ধরে সেই শক্তি ফলানোর সাধ যে তাঁকে কুরে কুরে খেয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই; মা-র এই বাহাদুরির লোভটাই ঘৃণার জন্ম দিয়েছে আমার ভিতরে—সতেরো বৎসর ধরে মধুযামিনী মায়ের পায়ে মাথা খুঁড়েছে, যে সতেরো বৎসর মা আমাকে একেলা স্নেহ স্প্রে করার নির্মম নির্জন যন্ত্র। বেদনা—কেননা

এখন যে সবাই বুড়ো আঙুল তুলে দুয়ো দেবে, এত বড় ছেলের সুমুখে মার এই কাণ্ড আমার পক্ষে অসহ্য। ('একটি সামান্য ঘটনা যে মানুষের সারা জীবনকে নতুনতর অর্থ দিতে পারে, পাল্টে ফেলতে পারে পূর্ববর্তী সমস্ত ঘটনার বাহ্যরূপ—হায়, তুমিও তা বিশ্বাস করো, আতিকুল্লাহ!') আর তাই আক্রোশ, মার উপর এবং মধ্যবয়সী ও পরিচ্ছন্ন, বদমাশ ভদ্রলোকটির উপর আক্রোশের নানা প্রজ্জ্বলন নক্ষত্র-বিন্দুর মতো উদ্‌গত হতে থাকে চারিদিক থেকে। '...অর্থাৎ তুমি মা-র সুখে শত্রুতা সাধছ।' রাস্তায় আমার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে আতিকুল্লাহ নানান আকারে তার ভাবনা আমার কানে কানে বলে যায়, 'অর্থাৎ তুমি কোনো সময়ে তোমার মাকে সুখে থাকতে দিতে চাও না : এতকাল নিজে তুমি মনে মনে বিষ পিঁপড়ের মতো জ্বলছ তাঁর উপরে। এখন তিনি তাই বাধ্য হয়ে নতুন পন্থার আশ্রয় নেবার চেষ্টা করছেন দেখে খেপে উঠেছ তুমি। অথচ তোমার মা এমন দুর্বল প্রকৃতির লোক, যাঁকে কারো উপর নির্ভর করতে হয় দুনিয়ায় চলতে গেলে। এতকাল ছিলে তুমি, এখন অন্যজন আসবেন। আসলে তুমি এমন প্রকৃতির লোক, যে মাকে কষ্ট দিয়ে চিরকাল আনন্দ পাবার চেষ্টা করে। কে তাহলে শয়তান? হয়তো তোমার মনোভাব আরো গর্হিত : মা-র মুখ্য মূলধন আবেগ নানা আকারে তোমার কাছেই পৌঁছে যেতে থাক সারা জীবন—এই তোমার ইচ্ছা—অথচ বদলে তুমি দিয়ে যাবে শুধু উপেক্ষা। ভুলে যেয়ো না, পৃথিবীতে প্রতিটি জিনিশই বেঁচে থাকে পরস্পরের বিনিময়ে, এটাকেই লোক বলে থাকে স্বার্থ। মা এমনকি মা-ও স্বার্থবোধের বাইরের বাসিন্দা নন, সেখানেও আছে বিনিময়ব্যবস্থা। কিন্তু তুমি তোমার দিক থেকে কিছুই দিতে প্রস্তুত নও। ফলে এই হৃৎব্যবসা ('মা-র সম্বন্ধে এই কথা বলছো তুমি? ছিঃ, তোমার ভাষা সংযত করো, আতিকুল্লাহ!') অচল হবার উপক্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে।' আমাকে যখন পাগল করে তুলল এইসব ভাবনা, তখন হঠাৎ মনে পড়ল কিছু দিন আগেও তাঁর স্নেহের অত্যাচার বিচলিত বিব্রত ক্রুদ্ধ আমি চেয়েছিলাম তাঁর অপসারণ, অবশ্য কি ধরনের হবে এই অপসরণ আমি তা স্পষ্ট করে ভাবিনি। না, মিথ্যে বলব না, চেতনার গভীরতর স্তরে একদিন তাঁকে বুঝি নিরূপায় হত্যা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারিনি। এ-বিষয় নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে আসার আগেই নতুন একটি ঘটনা উথালপাথাল করে দিল আমাকে, যদিও তলে তলে প্রবৃত্তির সেই ফলা ক্ষুধিত তরল ইস্পাতের নদী হয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে—কষ্টদায়কভাবে আমি তা অনুভব করে এসেছি। খুব ছোটোবেলা থেকে আমি যে নিজেকে একজন অস্বাভাবিক প্রকৃতির মানুষ ভেবে এসেছি, আসন্ন নাটকের প্রতিক্রিয়ায় তা ধ্বসে যেতে বসল। নির্জন রাস্তায় পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে আতিকুল্লাহকে আমি বোঝাতে লাগলাম, 'দ্যাখো, ছোটোবেলা থেকে নিজেকে তুমি অস্বাভাবিক ভেবে আসছ। নিজেকে তুমি কিছুতেই আর দশজনের সঙ্গে মেলাতে পার না। কি করে লোকে এত সামান্য কারণে হাসতে পারে, ছোটো বিষয় নিয়ে মেতে ওঠে হিংসার প্রতিযোগিতায়—তুমি তা ভেবে পাও না—এ নিয়ে মনে মনে হেসেছও যেমন তেমনি দুঃখও আছে তোমার : কেন তুমি আর দশজনের মতো হলে না, বেলেল্লা হল্লায় মেতে থাকতে পারলে না আজীবন। ফিলসফি পড়তে

এসে প্রথম তুমি জানলে 'স্বাভাবিক' কথাটি আদর্শ মাত্র, আসলে প্রত্যেকটি মানুষই অস্বাভাবিক—অন্তত নিজেকে প্রত্যেকে অস্বাভাবিক মনে করে। এই তথ্য জানবার পর লাফিয়ে উঠল তোমার হৃৎপিণ্ড। তাহলে কেন আমি এত কষ্ট পেয়ে এসেছি এই দীর্ঘকাল ধরে—ভাবলে তুমি। কিন্তু তত দিনে গড়ে গিয়েছ তুমি, একরোখা হয়ে উঠেছে তোমার বয়স, তুমি আর বদলাবে না, লক্ষ্যের দিকে তীরের মতো ছুটে যাবে—তাই এই সব তথ্য কিছু দিন পরই অবান্তর হয়ে গেল। এই তথ্যের সততা সম্বন্ধে সন্দেহ তোমার থাকল না ঠিকই, কিন্তু নিজে তুমি লোকে যাকে বলে 'স্বাভাবিক' তা আর হতে পারলে না, মিলিয়ে দিতে পারলে না আর-দশজনের ছোটো ছোটো আনন্দ বেদনার-সঙ্গে। সঙ্গে-সঙ্গে এই অভিজ্ঞানও হলো : বুদ্ধির অনেক উপর প্রবৃত্তির কাজ করে, বুদ্ধি শুষ্ক নিরূপায় আবেগহীন। ফলত ফিরে এল তোমার প্রাক্তন দুরঙা রাস্তা—দুঃখ এবং গর্ব—নিজেকে সবার থেকে আলাদা, স্বতন্ত্র, অস্বাভাবিক ভাববার দুঃখ, এবং গর্ব—যেহেতু তুমি আর দশজন সাধারণ মানুষের মতো নও; এবং যার ভিতরে 'কিছু' আছে সে-ই অস্বাভাবিক হয় এই ধারণায়। তুমিও যে সাধারণ মানুষের লাইনেই দাঁড়াবার উপযুক্ত, তোমার বর্তমান কিংবা সদ্য-প্রাক্তন চিন্তাপ্রণালী কি তার সাক্ষ্য দ্যায় না? এই অবস্থায় আর সবাই যা করত তুমিও তাই করছ, অর্থাৎ বিদ্ধ হয়েছ আক্রোশে, ঘৃণায়, বেদনায়—শিক্ষা তোমাকে কি দিয়েছে তাহলে?—তুমি 'কী', তার একটা অস্পষ্ট ধারণামাত্র—প্রবৃত্তির মোড় ফেরাবার ঘণ্টা বাজানোর সামান্যতম শক্তিও নেই তার। আসল কথা, মানুষের মৌল কয়েকটি রাস্তা আছে, একই 'কারণ' একই রাস্তা দিয়ে তোমাকে বয়ে নিয়ে যাবে, যেখান থেকে মুক্তি নেই কারো—আসলে মানুষ উপরে-উপরে যদিও পাশা খেলায় ছক নয় ভিতরে ভিতরে তবু সে এক গভীরতর অঙ্ক, যে অঙ্কের বঙ্কিম পদ্ধতি কেউ জানল না, যে নিয়ম মানল না কোনো সিঁড়ি।' এই ভাবনা পাগল করে দিল আমাকে, যখন দেখা গেল আমি সাধারণ অতিসাধারণ মানুষমাত্র, আর এই চিন্তার ভগ্নাংশ বিদ্যুতের মতো জ্বালিয়ে দিল ক্ষুধিত তরল সেই ইস্পাতের নদীর লকলকে ফলা। নিজেকে অন্য-সবাই থেকে আলাদা করবার ইচ্ছায়, যখন সেই ইচ্ছাকে আমি লালন করলাম প্রাণের গভীরে, গানের ধ্রুবপদের মতো ফিরে-ফিরে আসতে লাগল, নিজেকে আর পাঁচজন থেকে আলাদা করবার অছিলায় এই ঘটনাকে নতুনভাবে ব্যবহার করলাম আমি। এখন আমার মনে হচ্ছে—পেয়েছি, মনে মনে আমি ছিলাম এরি তল্লাশে, এই 'কারণ', এই কারণ এখন বুঝতে পারছি জনাব আতিকুল্লাহ যা বলে থাকেন, আমি, রক্তমাংসের আতিকুল্লাহ, তা বিশ্বাস করি না। আমার প্রবণতা বৈপরীত্যে অবিরলভাবে বেড়ে ওঠার দিকে। একজন উন্মোচন বিশ্লেষণ নিষ্কাশনে নিজেকে রাখতে চায় পরিশুদ্ধ, আর একজন জনাব আতিকুল্লাহর ইস্ত্রি-করা পরিষ্কার শার্ট প্যান্ট নিয়ে ধুলোর উপরে বসে যায় কিছুই না ভেবে, বোকার মতো। যেহেতু আমার বাইরের বাস্তব মানুষটি থাকে শহরে এবং বুদ্ধিজীবী, তাই এতকাল আমি নিঃশব্দ চিৎকারে 'কারণ' খুঁজে বেড়িয়েছি। আসলে আমি তাঁকে কেন হত্যা করতে চাচ্ছি? স্নেহচ্যুতির আশঙ্কায়? না, স্নেহের আতিশয্যের জন্য, যার জন্যই একদা আমি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম এমন ভাবনায়? না, বৈরিতা? আমার আর

রিনার ঘরের দরোজায় যে চোখ একদিন দেখেছিলাম ঠাণ্ডা ও ভয়াবহ, মার আর ঐ ভদ্রলোকটির নিজস্ব ঘরে সেই চোখেরই হিংস্রতম রূপ দেওয়ার স্পৃহা? অন্তরে অন্তরে যেহেতু নিশ্চয় আমি জানি, আমি একজন অস্বাভাবিক প্রকৃতির মানুষ—নির্জনতা সর্বনাশ করেছে আমাকে—আর কেউ গূঢ়তর ব্যাপারটা যাতে না জানে, তাই স্বাভাবিক, বাস্তব, সাধারণ হবার জন্য ভিতরে ভিতরে আমার কি করুণ দ্বন্দ্ববহুল প্রয়াস আমিই তা জানি। পাগলের মতো আমি খুঁজে বেড়িয়েছি এমন একটি উপায়, লোকে যাকে নিতান্ত বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখতে পারে আপনার মতো করে এবং অবশেষে অকস্মাৎ যা স্বর্গের ফলের মতো এসে গেল আমার আবিষ্টকরতলে। সবচেয়ে দুঃখ এই যে আসন্ন নাটকে আমাকে, অস্বাভাবিকতা নিয়ে যার প্রচ্ছন্ন গর্ব ছিল উত্তুঙ্গ, হাত পাততে হলো সেই স্বাভাবিকতার কাছে, লোকে যাকে 'বাস্তব' বলে থাকে—হায়, গর্ব আমার টিকল না, আমার এই পরিণতি হলো। লোকে বলবে, 'অতো বড় ধাড়ি ছেলের সুমুখে মা প্রেম করতে গিছলো, ছেলেটার তা সহ্য হবে কেন? কতদূর গড়িয়েছিল ভেতরে ভেতরে, কে জানে? নাকের ডগায় এইসব করতে দেখে ছেলেটা অসহ্য হয়ে শেষে এই কাণ্ড বাধিয়ে বসল।' অবশ্য আড়ালে-আবডালে বলবে লোকে, কেননা এই নাটকে আমাকে যে চরিত্রে অভিনয় করতে হবে, যথেষ্ট কুশলী সে। আমার চিন্তাপ্রণালী যখন এই পথ বেয়ে কুটিল চক্রান্তে আবর্তিত, তখন একদা এক সন্ধ্যায় জনাব আতিকুল্লাহ বন্ধুর মতো আমার কাঁধে হাত রেখে আস্তে আস্তে বলল, দুকানে মোম ঢেলেও আমি যা শুনতে চাইনি, 'চারদিকে থেকে তুমি অনেকগুলো 'কারণ' পেয়ে গেছ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যার একটি সম্পূর্ণ বাস্তব এবং যার অপেক্ষায় ছিলে, কেননা বাস্তব কারণ ছাড়া এমন একটি আসন্ন নাটকের প্রধান নায়কের চরিত্রে অংশগ্রহণ করতে তোমার বাধত। তুমি ভাবতে নিজের মনোবিকার থেকে তোমার এই উত্থিত হয়েছে এবং সত্যিকার না ঘটে এই ঘটনা তোমার মনোরাজ্যেই অনবরত বিভিন্ন ছন্দে ঘুরপাক খেত, রিনরিন করে অগোচর রক্তক্ষরণ হতো তোমার, যা তোমার জ্ঞান হওয়া অবধি হয়ে আসছে, আর এমনিভাবে এই নাটকে তোমার মানস-রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে কমাত তোমার আয়ুর পরিসর। যত দূর মনে হয়, আসন্ন নাটকে লোকে তোমাকে ভুল বুঝতে অর্থাৎ তোমার অভিনয় হবে সমৃদ্ধ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এবার অন্তত একদিক থেকে নিশ্চিত হয়ে তুমি হত্যাকাণ্ডে অগ্রসর হতে পার।'

১৯৬২

জলপরি

না : শম্পাকে আমি পাইনি। চাওয়া-পাওয়া : এ-সব আমার কাছে অসহ্য শব্দ। কিন্তু আজ ঐ সব শব্দেই নিজেকে প্রকাশ করতে হলো। সত্য হয়তো এরকমই, যা সবাইকে তার মিনার থেকে নামিয়ে আনে সমতলে, এনে এক করে দ্যায় সবাইকে—কিছুতেই আলাদা হতে দ্যায় না। বস্তুত, চাওয়া-পাওয়া এ-সব শব্দে শুধু নয়, এ সব শব্দের তাৎপর্যও আমি বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু আজ যেমন এ সব শব্দও আমাকে ব্যবহার করতে হচ্ছে, তেমনি এ সব শব্দের তাৎপর্যও আজ আমার কাছে একেবারে নিরর্থক নয়।

শম্পার সঙ্গে আমার চেনা বছর কয়েক আগে, দিন কয়েক তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় মাত্র। কিন্তু, তার মধ্যেই শম্পা—সে আমার প্রথম প্রেম, এবং হয়তো শেষও। আমি আমার পরিচিতদের মতন যদি বারবার ভালোবাসতে পারতাম গভীরতম ভালো না বেসে, তাহলে বোধহয় বেঁচে যেতাম। কিন্তু ঈশ্বর কারো কারো ললাট লিখন অন্যরকম করেন বলেই তো যুগে যুগে নতুন গল্প লেখা হয়। এক গল্প নতুন করে লেখা হয় আবার।

তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা কোনো-এক বিয়ের মজলিশে। রাতে। আলোয় হাসিতে লোকজনে শামিয়ানায় কলরবে বেলুনে পোশাকে জ্বলজ্বল করেছিল সেই সন্ধ্যা, সেই বাড়ি—স্বপ্নের সন্ধ্যা, স্বপ্নের বাড়ি। সেখানেই আমার দুটি চোখ আবিষ্কার করে নিয়েছিল অন্য দুটি চোখকে। যে চোখগুলো এত বড় বড় এত অনির্বচনীয় যেন তার ভিতরে অনায়াসে ঘুমোনো যায়। দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী ভরে। আর আমি, আমিও বোধ হয় আবিষ্কৃত হলাম দুটি চোখের আলোয়, চোখের ঝিনুকের ভিতরকার আশ্চর্য মুক্তোর মতন। জানলাম নিজের শরীর, নিজের মন। বিয়ে-বাড়ির সেই সাজানো দরোজা, লাল শামিয়ানা, গাছের ভিতরে ভিতরে লাল নীল সবুজ ফলের মতন বালব, সবুজ কুঞ্জ, এক একটি টেবিল ঘিরে মৌমাছির মতন কয়েকজনের গল্পলোক ও হাস্যদ্যুতি যেন একটা পটভূমির মতন মনে হতে লাগল। বিবাহের ঐ পটভূমিতেই লেখা হয়ে গেল আর একটি মিলনের সুসমাচার। সেদিনই পরিচয়। সেই পরিচয়ের পটভূমিকায় জ্বলজ্বল করতে লাগল রাত্রি। একটি চাউনি বুকের ভিতর বহুদূর খুঁড়ে বসে গেল। একটি কটাক্ষ যেন দুলে উঠল বুকের ভিতরের সাত সাগরের জল। ছিন্ন দুএকটি কথার টুকরো ঝরে পড়ল আশ্বিনের বৃষ্টির মতন। আর স-ব আমাকে ঘিরে। আমাদের দুজনকে ঘিরে। ক্রমশ মনে হতে

লাগল সেই ভিড়ের ভিতরে শুধু দুজন জেগে আছে। আর সবাই চারপাশে থেকেও যেন বহুদূরে চলে গেছে।

তারপর দুদিনের মধ্যেই দেখা হলো আবার পরিচয় থেকে আলাপ। শম্পা আমার হৃদয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল। আমি তার চোখের ভিতরে পালাতে চাইলাম—যে চোখ ধরে ফেলেছে আমাকে। আমার ভালো লাগতে লাগল। ধরা পড়েও আমি খুশি হলাম। যে ধরে সে শুধু ধরেই না, সে-ও খানিকটা ধরা দ্যায় এই সত্য আমি জানলাম। কিন্তু এ জানা জ্ঞানের মতন এল না, এল আনন্দের পোশাক পরে। আমার ধূসর দিন ঝলসে উঠল উজ্জ্বলতায়। সেই হৃদয়-বিদারী চাউনি, সাগর-দোলানো কটাক্ষ, হাসি-যা তীরের মতন ভেদ করে যায়, আর আশ্বিনের পশলা বৃষ্টির মতন কথা। হৃদয় থেকে ঐ দিগন্ত পর্যন্ত একটি দীঘল বাঁশি বেজে উঠল। এ এক আশ্চর্য আনন্দ, যা আমার রাত্রিকে নির্ঘুম করে দিল। এ কোন আনন্দ, যা আমাকে কাঁদাল। আমি কাঁদলাম। কেন কাঁদলাম জানি না। কেঁদে কেঁদে আমি সুখী হলাম। পৃথিবীতে এসে অজস্র দুঃখের ধারা মধ্যে কয়েকটি মুহূর্ত জয়ী হয়ে রইল আনন্দে। একটি অক্ষয় শিশিতে ভরে-থাকা অফুরান সৌরভ চিরকালের সম্পদ হয়ে রইল আমার।

এরকম কিছুদিন গেল, শম্পার সঙ্গে আমার চেনাজানার কয়েকটি মাত্র দিন। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো : শম্পার সঙ্গে আমার যে চেনাজানা তা কোনোদিনই খুব বাস্তবতার পর্যায়ে নেমে আসেনি। বইয়ে যেমন পড়া যায় তেমনিভাবে আমরা কোনোদিনই একে অপরের কাছে প্রকাশিত হইনি। কিন্তু গোপন ছিলাম না। আমার আচরণে তার প্রতি আমার মনোভাব হয়তো একটু স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেত। কিন্তু শম্পার ব্যবহারে লুকানো কিছু না থাকলেও কোথায় যেন একটা আড়াল থাকত। সে নিজেকে কিছুতেই আবেগে ভাসিয়ে দিত না, কোথায় একটা শাসন থাকত তার। কিন্তু 'শাসন' শব্দটি এখানে যথাযথ প্রযোজ্য হচ্ছে না। তার ব্যবহারে এমন একটি সহজতা ছিল, যেখানে শাসন-কথাটি সুপ্রয়োগ নয়। অথচ দূরত্ব ছিল। মাঝে মাঝে তাকে অত্যন্ত কাছের মনে হতো। সম্পূর্ণ পরিচিত। মাঝে একেবারে আমার অচেনা একটি মেয়ে বলে তাকে মনে হতো।

আসলে আমি নিজেকে নিয়ে এরকম ব্যস্ত ছিলাম যে এসব ব্যাপার তলিয়ে ভেবেই দেখিনি। ভেবে দেখিনি, ততদিন, যতদিন আমি একটি বিস্মিত আঘাতের সম্মুখীন হইনি। হঠাৎ একদিন শুনলাম, শম্পার বিয়ে। উজ্জ্বলতা যেন মুহূর্তে পিঙ্গল ধূসরতায় পর্যবসিত হয়ে গেল। যেন এক ফুঁয়ে কেউ নিভিয়ে দিল ঝাড়লণ্ঠনের সবগুলি আলো। শরীরে ছুরি বিঁধলে যে যাতনা হয়, এ তার চেয়ে শততম তীব্র। প্রথমে মনে হলো, শম্পা আমাকে ঠকিয়েছে। পরে মনে হলো : কই, শম্পার সঙ্গে তো এরকম কোনো শর্ত হয়নি যে সে আমাকে ছাড়ার আর কাউকে বিয়ে করবে না। এমনকি আমাদের ভালোবাসা কোনোদিন উচ্চারিত হয়নি। আমার তরফ থেকে তো নয়ই। কিন্তু শম্পা কি আমাকে সত্যিকার ভালোবেসেছে? ভালো লাগা

আর ভালোবাসা কি এক? তাহলে কি আমি ভুল করলাম? কিন্তু নিজেকে ঠিক মূর্খের স্বর্গের অধিবাসী বলে মনে হচ্ছিল না আমার। এখন নিজেকে অনেক নিরাসক্তভাবে দেখতে পারি। আবেগের বাইরে গিয়ে। তাতেও শম্পার হাসি-চাউনি-কথার ভিতর থেকে এক গোপন মধুর অর্থ বেরিয়ে আসতে থাকে কেবলি। কিন্তু এখন আর মধুর কি? সব মাধুর্য এখন তিক্ততায় পরিবর্তিত হয়ে গেছে। না : দিনে দিনে আমি বুঝতে পারলাম মাধুরীর কিছু অবলেশ রয়ে গেছে তবু। আমি দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। অন্ধকার থেকে হঠাৎ তীব্র আলোর সামনে এনে ফেললে যেমন হয়, আমার চোখে ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। কিন্ত আমি আলো বলছি কাকে, আর অন্ধকারই-বা কাকে। কোনটা যে আলো কোনটা যে অন্ধকার, তা কে নির্ণয় করবে।

অন্তত আমি নির্ণয় করতে পারলাম না। শম্পার সঙ্গে ফের দেখা হলো। সে ঠিক আগের মতন আছে সেই মোহিনী হাসি। মোহিনী কটাক্ষ। মোহিনী কথা। আমি সব গুলিয়ে ফেললাম, আমার সব বানিয়ে-রাখা কথা এলোমেলো হয়ে গেল। কিন্তু খুব ভিতরে আমি খুশি হয়ে উঠলাম শম্পা বদলায়নি বলে। আমার মন বলল : শম্পা যেন চিরদিন এমনি থাকে। আমার কাছে শম্পা চিরদিন এক রইল। এই খুশি আমাকে আলোকিত করে তুলল আবার। শম্পাকে সরাসরি কোনো কথা জিজ্ঞেস করা হলো না আমার। পরে এই নিয়ে মনে কোনোদিন অনুতাপ উপস্থিত হলে যেন স্বজ্ঞার ভিতর দিয়ে আমি বুঝতে পারতাম : শম্পার কাছ থেকে থেকে যেন সরাসরি উত্তর আমি কোনোদিনই পাব না। আরো পরে আমার ভয় করতে লাগল শম্পাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে। যদি একটি মারাত্মক উক্তি শুনতে হয়-হৃদয়বিদারক উত্তর। তার চেয়ে ঐ প্রশ্নটি রহস্যই হয়ে থাক। ওর রহস্য-মাধুরী কোনোদিন ফুরোবে না। শম্পাকে ঐ প্রশ্ন আর কোনোদিন করা হয়নি। করার কথাও মনে হয়নি আর।

শম্পার বিয়ের পরে একদিন ওর নতুন বাড়িতে গেলাম। ওর মানে ওর স্বামীর। ওদের। লেকের ধারে সুন্দর নির্জন একতলা ছোটো বাড়ি। শান্ত জলে ছায়া ফেলে আছে। সেদিন বিকেলটাও ছিল মনোরম। আমার মনে কোনো কাঁটা ছিল না। আমি শান্ত স্বচ্ছ মন নিয়ে শম্পার কাছে গিয়েছিলাম। শাড়ি-গয়নায়-সজ্জায় হয়তো-বা শরীরে শম্পাকে একটু অন্যরকম মনে হচ্ছিল। কিন্তু আবার সব মিলিয়ে সে যে একটু অন্যরকম হয়েছে তা মনে হচ্ছিল না। হাসি, চাউনি, কথাবার্তা সব সেই আগের মতন সহজ-সচ্ছল। আগের মতন দীপ্যমান। খুব সপ্রতিভতা নিয়ে গেলেও একটু কি মলিন হচ্ছিল আমাকে? আঁটো গেঞ্জি ও ট্রাউজার-পরা শম্পার স্বামী কথায় কথায় হা-হা করে হাসছিলেন। তাঁর সুন্দর স্বাস্থ্য, সুন্দর চেহারা, সুন্দর পোশাক, সুন্দর ব্যবহার। আমার মনে হচ্ছিল, তাঁর কোথাও অভাব নেই। সঙ্গে যোগ হয়েছে এই চমৎকার বাড়ি, রূপসী স্ত্রী, উজ্জ্বল চাকরি। পৃথিবীতে এক কোটি লোক সমস্ত ভাগ্য নিয়ে জন্মায়। আমার এরকম মনে হচ্ছিল। কেন যে লোকে বলে, ওসবের একটি যে পায় অন্যটা সে পায় না, তা আমি বুঝি না। আমি তো দেখি : সে পায় সে সবই পায়, যে পায় না সে কিছুই পায় না।

শম্পার স্বামী কারণে-অকারণে হো-হো করে হাসছিলেন। বলছিলেন, 'আপনারা অধ্যাপক মানুষ অফুরন্ত অবসর, বছরে ছমাস ছুটি, আর আমাদের দেখুন উদয়াস্ত—'। অপ্রাঙ্গিক হলেও বলি : শম্পার স্বামী একজন ইঞ্জিনিয়ার। আমরা সবুজ ঘাসের উপর প্রজাপতি-গড়নের বেতের চেয়ারে বসেছিলাম। সামনে প্রজাপতি-গড়নের একটি বেতের টেবিল ছিল। শম্পা ঝকঝকে টি-পট থেকে চা ঢালছিল। তার ডান কানের দুল বিকেলের তারার মতন জ্বলছিল। তার মুখে খুশি, চুলে খুশি, পোশাকে খুশি। চারপাশ ফুলের বেড। তাতে একশোরকম ফুল ফুটেছিল। একশোরঙের স্বপ্ন ফুটেছিল। শম্পা, শম্পার স্বামী দুজনই চঞ্চল। বারে বারে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ছে। ঘরে যাচ্ছে। বারান্দায় যাচ্ছে। শম্পা একবার রঙচঙে একটি সিনেমা-পত্রিকা নিয়ে এল। তার কয়েকটি ছবি-টবি দেখে উল্টে রেখে দিল। শম্পার স্বামী হঠাৎ উঠে টকটকে একটা রক্তগোলাপ ছিঁড়ে নিয়ে টেবিলে রাখলেন। অন্ধকারে রক্তগোলাপটা মিশে গেলে আমি উঠলাম।

যে-উদার আতিথ্যে শম্পার স্বামী আমাকে গ্রহণ করেছিলেন, কিছুদিন পর আর সেটা থাকল না। এই হয়তো প্রাকৃতিক নিয়ম। শম্পার সঙ্গে বসে গল্প করছিলাম। শম্পাও উল বুনতে বুনতে কথা বলছিল। গভীর করে চোখ তুলে তাকাচ্ছিল মাঝে মাঝে। যে চাউনিগুলি আমি অতি যত্নে অতি গোপনে আমার ভবিষ্যৎ-বাকশে জমিয়ে রাখছিলাম। এমন সময় বাইরে তাঁর গাড়ির শব্দ শুনে আমার বুক ধ্বক করে উঠল। আর শম্পা উল বুনতে বুনতে সহজ গলায় বলল, 'ঐ উনি এলেন বোধহয়।' শম্পার স্বামী ঘরে ঢুকলেন জুতোর কড়া শব্দ তুলে, বললেন 'এই-তো।' হঠাৎ তাঁর গলার স্বর বদলে গেল। বললেন, 'এই তো? একটু বেশি বেশি আসা-যাওয়া করছে মনে হচ্ছে আপনি?' আমি হতভম্ব হয় গিয়ে কোনো কথা খুঁজে পেলাম না। আরো গলা চড়িয়ে উনি বললেন, 'পেয়েছেন কি আপনি? রোজ রোজ আসা-যাওয়া? যান, বেড়িয়ে যান এই মুহূর্তে, আর কখনো যেন দেখতে না পাই আপনাকে এ বাড়িতে। যান। এখনি চলে যান।' ঘাড় নিচু করে আমি বেরিয়ে এলাম। শম্পার দিকে একবার না তাকিয়ে পারলাম না। তার মুখে ভাবান্তর নেই। নিঃশব্দে উল বুনে চলছে সে।

জোর করে ভুলতে গেলাম শম্পাকে। যত ভুলতে যাই, তত আরো জেগে ওঠে। আমার চারপাশের প্রতিটি জিনিশে শম্পার মুখের মুদ্রা অঙ্কিত হয়ে যায়। যেদিকে তাকাই, সে দাঁড়িয়ে থাকে। আর, সমস্ত শম্পা কোনো-একজন শম্পার দিকে সংকেত করে যায়।

সে-দিন একটু রাতে নিজের অজ্ঞাতে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। শম্পাদের বাড়ির পিছনদিকে। উজ্জ্বল আকাশ। জ্বলছে কোটি তারা। বাতাস নেই। লেকের জলের মধ্যে শম্পাদের আলো-জ্বলা নিস্তব্ধ বাড়ি জ্বলছে। সব-কিছু একটি স্থির ছবির মতন। কোথাও কোনো শব্দ নেই। আকাশে নিঃশব্দে আলো ঝরছে। লেকের ঠাণ্ডা জলে শম্পাদের আলো-জ্বালা স্থির বাড়ি। চারপাশে কোথাও কোনো লোক

নেই। বাতাস শান্ত শিশুর মতন কোথাও কোনো বাড়ির ছাদে ঘুমিয়ে পড়েছে যেন। আমি লেকের জলের নিথর পাড়ে দাঁড়িয়ে। নেমে এলাম। ঠাণ্ডা পানি। খুব সাবধানে নামলাম পানিতে, একটু ঢেউ না-দিয়ে যাতে লেকের পানি ভিতরের শম্পাদের বাড়ি কিছুতেই ভেঙে না-যায়। ডুব দিলাম তারপর। এক ডুব দিয়ে শম্পাদের পানির ভিতরের বাড়ির দরোজায় ঘা দিলাম। দরোজা খুলে গেল। শম্পা বসে আছে। আর কেউ নেই। শম্পাকে আমি পেলাম।

শম্পার কাছে যাবার পথ আমার জানা হয়ে গেছে। এখন আর আমি কারো পরোয়া করি না। এমনিভাবে তাকে আমি বারেবারে পাই ॥

[১৯৭০]

কে তুমি?

আষাঢ় মাস। চারদিন ধরে ঝর্ঝর করে বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। থামবার কোনো লক্ষণ নেই। মনে হচ্ছে, সৃষ্টির আদিকাল থেকে এই বৃষ্টি ঝরে চলেছে আর অনন্তকাল অবধি চলবে। কোনোদিন কি নীল আকাশ দেখেছিলাম?—মনে পড়ে না। পৃথিবীতে গ্রীষ্মকাল ছিল কোনোদিন?—বিশ্বাস হয় না। অনন্তকাল ধরে বৃষ্টি অবিশ্রাম পড়ছে যেন। আকাশের রঙ ধূসর। তাকিয়ে থাকলে মনে হয় না, বৃষ্টি হচ্ছে—মনে হয়, ময়লা একটা চাদর টাঙানো রয়েছে। আর আকাশটা দূরে না—খুব কাছেই। পাখপাখালি ঝোপেঝাড়ে কোথায় যে লুকিয়েছে। থইথই করছে পুকুর। ব্যাঙ ডাকছে মাঝে মাঝে। ঢালিদের বিরাট বাগানের খানা দিয়ে তোড়ে পানির স্রোত আসছে তো আসছেই—পুকুরের পানি ভরিয়ে দিচ্ছে। ঢালিদের বাগানের অনেক দিনের পুরোনো গোলাপখাশ আমগাছটা গতকাল পড়ে গেছে। বাড়ির সামনের বিশাল গাছটার গুঁড়ির কাছে মাটির খোড়ল বেড়েই চলেছে। একটা মানকচু পাতা মাথায় দিয়ে ভিজতে ভিজতে রমজান গিয়ে দেখে এসেছে—এতকালের বাদামগাছটা যে-কোনো মুহূর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারে। আর গাছটা যদি উপড়ে পড়ে, তাহলে আর কার কী—ঝক্কি পোহাতে হবে রমজানকেই। গাছটা যদি পুকুরধারের রাস্তার উপরে পড়ে, তাহলে তো হাঁটা-চলা বন্ধ। তখনই কুড়াল বের করে গাছ কাটার ব্যবস্থা করতে হবে। এই বর্ষায় 'জোন' কোথায় পাবে? রমজানকেই বৃষ্টি মাথায় করে রাস্তা পরিষ্কার করতে হবে।

সক্কালবেলা উঠে বাগান, রাস্তা, পুকুরঘাট, পুকুরধার এক চক্কর ঘুরে এসেছে রমজান। বাগানের ভেতরের খানা পরিষ্কার করে দিয়েছে। তারপর এসে সেঁধিয়েছে কাঁথার ভেতরে। বাড়ির কুটোগাছটি নাড়ে না রমজান। নাড়তে হয় না। তার বউ ফুলবাসরী সাত সকালে উঠে বাড়ির সব কাজ করে। বাঁজা বউ ফুলবাসরী। গোলগাল। শ্যামলা। ছেলেপুলে হয়নি। হবেও না। তাই নিয়ে ওদের দুজনের মনোবেদনা যতই থাকুক—ফুলবাসরী তেজ নিয়েই ঘুরে বেড়ায়, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত তার কাজ ফুরোয় না, দু'বেলা ঢালির বাড়িতে যাওয়া তো আছেই। রমজানই বরং চোরের মতো থাকে। তাকে কেউ বলেনি, ডাক্তার-টাক্তারও দেখায়নি, কিন্তু তাকে দেখে মনে হবে তাদের ছেলেপুলে না-হওয়ার জন্যে সে-ই দায়ী। ঢালির বাড়ি থেকে কাজকাম করে এসে, ঝাঁপ সরিয়ে, ঘরে ঢুকে ফুলবাসরী আঁধার ঘরে বুঝতে পারে না রমজান জেগে আছে কিনা। এক ঘুম ঘুমিয়ে উঠে জেগেই ছিল রমজান—কিন্তু কাঁথার ভেতর থেকে বেরোয়নি।

ফুলবাসরী বলল, 'ঘুইমোসো নাকি? তোমাকে যেতে বলেসে।'

—'একবার তো ঘুরে এলাম। এককাপ চা দ্যাও দিনি। চা খেয়ে যাই।'

গুড়ের লাল চা বানিয়ে এনে দিল ফুলবাসরী।

—'এই বৃষ্টির সাতদিনের আগে থামতেসে না, বুঝলে?' রমজান বৃষ্টির দিনে একটু গল্প করতে চায়।

বিছানায় উঠে বসে রমজান আরাম করে চায়ে চুমুক দ্যায়।

বাঁজা গোলগাল বেঁটেখাটো ফুলবাসরীর কণ্ঠেও কি রকম আরামের সুর, 'শীতকালের মতো জাড় লাগছে গো। এরকম বৃষ্টি কিন্তু অনেক বছর বাদ হচ্ছে। খালের ওপরে কাঠের গোলটা নাকি ভেসে গেছে—ঢালির বাড়িতে বলাবলি হচ্ছিল' বলতে বলতে ফুলবাসরী উঠোনে নেমে যায়। রমজান বেরিয়ে আসে দাওয়ায়। পানিতে ভিজে দাওয়ার মাটি খসে পড়েছে। ফুলবাসরী একবার যায় মুরগির খোপের কাছে। খদকুড়ো দিয়ে আসে। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে মুরগিগুলো খোপের মধ্যেই আটকা আছে কয়েক দিন—একটু উঠোনে পর্যন্ত বেরোতে পারে না। রমজানকে বলে, 'রোদ উঠলিই পয়লা দাওয়াটা ঠিক করবা—শুকনো মাটি এনে লাগাতে হবে। বাঁশ-টাশগুলোও পচে গেছে। ঢালিচাচাকে বললে ক-টা বাঁশ দেবে না ওনার বাঁশঝাড় থেকে?'

'দেবে। আনবোখন বলে-কয়ে।' রমজানের মনে হয়, বৃষ্টিতে ফুলবাসরী যেন উৎসাহী হয়ে উঠেছে কী-জানি-কেন। খামোখাই বৃষ্টির পানিতে ভিজছে, খামোখাই উঠোনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী-জানি-কেন গোলগাল বেঁটেখাটো শ্যামলা ফুলবাসরীর চোখে একটা আলাদা আলো, পাছা টলছে, খামোখাই বৃষ্টির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে বন-বাদাড়ে।

রমজান বলে, 'আচ্ছা, তুমি খামাখা ভিজতেসো কেন?'

আসলে অবশ্য রমজানেরও এই আষাঢ়ে বৃষ্টি ভালো লাগছে। ওদের ঘটনাহীন জীবনে এই বৃষ্টি দারুণ একটা ঘটনার মতো—উৎসবের মতো এসে পড়েছে। সকালবেলা মানকচুর একটা মস্ত পাতা এনে রেখেছিল রমজান। দাওয়া থেকে পাতাটা তুলে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল।

বৃষ্টি তখনো জড়েই চলেছে। একটানা। বাড়ি থেকে বেরিয়েই রমজানের মনে হলো, চারদিক নির্জন কোথায়?—এ তো দেখি উৎসব চলেছে। পুকুরের পানিতে বৃষ্টি পড়ে বুজকুড়ি উঠছে পুকুর জুড়ে। ছপছপ শব্দ হচ্ছে অবিশ্রাম। খানা দিয়ে সারা বাগানের পানি খলবল করে ছুটে সশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ছে পুকুরের মধ্যে। রাংচিতের বেড়ার পাতাগুলো হয়ে উঠেছে ঘনসবুজ, পায়ের নিচে ঘাস সবুজ। বাদামগাছের পাতা সবুজ। সারা বাগানের পাতা-ডালপালা বৃষ্টির পানিতে, পোকা-পতঙ্গের শব্দে যেন উৎসবের রাত্রির মতো ঝলমল করছে। কয়েক দিনের মধ্যে গাছগুলো যেন দশ হাত বেড়ে উঠেছে। রমজানের মনে হলো, সমস্ত বাগানটা হাসিখুশি। সেও খুশি। ফুলবাসরী, তার শ্যামলা গোলগাল মোটাসোটা বউ খুশি। আষাঢ়ে বৃষ্টি আর রমজান আর বাগান আর ফুলবাসরী সবাই যেন একাকার হয়ে

গেছে। খুশিমনের মধ্যেই রমজানের অবশ্য মনে একবার প্রশ্ন উঠল : ঘরে চাল ক'দিনের আছে? তারপরই মনে হলো : না, আছে, বেশ ক-দিনের মতো আছে।

এসব ভাবতে-ভাবতে বেড়ার দরোজা সরিয়ে ঢালিদের বাড়িতে ঢুকছে, ঢালির বড় ছেলে হাফিজ, সেও রমজানের বয়েসী, বলল, 'রমজান, বাপজান তোমাকে ডেকেছিল।'

'কেন?' রমজান এই কথা জিজ্ঞেস করেছি কি করেনি, বাড়ির ভেতর থেকে পরিত্রাহি চিৎকার শোনা গেল।

দুজনই বাড়ির ভেতরের দিকে ছুটল। রসমান অবশ্য দাঁড়িয়ে গেল বুকসমান বাড়ির দাওয়ার সামনে। হাফিজ দৌড়ে চলে গেল ভেতরে।

ঢালির বউ আছড়ে পড়ল দাওয়ায় এসে : 'হায়! হায়! হায়! সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমার ফিরোজাকে সাপে কেটেছে। আমার ফিরোজা মরে যাচ্ছে!'

ফিরোজা ঢালির ছোট মেয়ে। ঢালির আর ছেলেদের দেখা গেল না। মেয়ে-বউরা ছোটাছুটি করছে। ঢালি ছিলেন দহলিজে। গত বছরও হজ্ব করেছেন। লম্বা, মেহেদি-দেওয়া দাড়ি। মাথায় টুপি। বিশাল চেহারা। হাতে তসবিহ। তিনি মুখে বলছেন বটে, 'মরিয়মের মা, তুমি চুপ করো, চুপ করো, আল্লাহ্ ভরসা!' কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তাঁর হাত থরথর করে কাঁপছে।

রমজান ততক্ষণে দাওয়ায় উঠে গেছে। ঘরের ভেতরে উঁকি মেরে দেখল, অনেক নারী-পুরুষ, তার মধ্যে নিথর হয়ে শুয়ে আছে ফিরোজা। 'ওঝা ডাকো! ওঝা ডাকো!' বলতে বলতে বৃষ্টির ভেতরেই হাফিজ দু'তিনজনকে নিয়ে ছুটল।

দিনভোর খাওয়া-দাওয়া হলো না, বাসায় ফেরা হলো না রমজানের। ঢালিই একটুখানি জমি দিয়ে একটা ঘর তুলে দিয়েছেন ওদের থাকার জন্যে—তাঁরই বাগান-ঘেঁষা পুকুর-ঘেঁষা জমির ভেতরে। রমজান কোন মুখে বাসায় ফেরে এই বিপদের দিনে? বৃষ্টিবাদলার মধ্যেই বরং ফুলবাসরীও খবর পেয়ে চলে এসেছে। ঢালির এই ছোটো মেয়েটিই তার সঙ্গে চাকরবাকরদের মতো আচরণ করত না। মেয়েটা ছিল ঢালির বউ-ছেলে-মেয়ে সবার থেকে আলাদা। শান্ত, স্বভাবচরিত্র ভালো, মিষ্টি। সেজন্যেই বোধহয় আল্লা তুলে নিলেন ওকে।

চারজন ওঝা প্রাণপণ চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারল না ফিরোজাকে। ঢালির বাড়ি ঘেঁষা কয়েক বিঘে ধানী জমির কাছে বেড়া দেওয়া ওদের পারিবারিক গোরস্থান। সেখানে দাদা-দাদীর পাশে বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে ভিজতেই মাটি খোঁড়া হলো, কবরে শুইয়ে দেওয়া হলো ফিরোজাকে।

রমজান তো এই বাড়িরই ছেলের মতো। ওর মনটা বিষাদ-ব্যথায় শূন্য হয়ে গিয়েছি—সাঁঝবেলায় ফিরোজাকে কবর দিয়ে ফিরে আসার সময়।

বৃষ্টি একটু ধরেছিল নিতান্ত কয়েক দিন চলার পর ক্লান্ত হয়েই যেন। পশ্চিম আকাশে একটা মরা লাল আভা ফুটেছিল। ঘরে ঘরে তখনো টেমি হারিকেন জ্বলেছে কি জ্বলেনি, আকাশের আলোয় রমজান নিজের ঘরের দিকে ফিরতে গিয়ে দেখল, তার পায়ে-চলা পথের সামনেই একটা সাপ তরতর করে এঁকেবেঁকে চলে যাচ্ছে। রমজানের মনে হলো : আরে! এই সাপটাই কেটেছে নিশ্চয় ফিরোজাকে!

কেন-যে তার এরকম মনে হলো, তা বলতে পারবে না রমজান। কিন্তু সাপটাকে দেখেই সে যেন নিশ্চিত হয়ে গেল : এই সাপটাই ফিরোজাকে কামড়েছে। পাশের পেয়ারা গাছের একটা ডাল ভেঙে নিয়ে রমজান সাপটা মারার জন্যে ছুটতে লাগল।

আবার টিপটিপ করে গাছে-পাতায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সারাদিন খাওয়া হয়নি গায়ের কাপড় ভেজা—সে-সব মনে থাকল না রমজানের। সাপটার পেছন পেছন সে দৌড়াতে শুরু করল।

বৃষ্টি হয়ে মাটির রাস্তা তকতক ঝকঝক করছে। কোথাও কোথাও রাস্তার ওপর দিয়ে পানি ছুটে চলেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারেও রাস্তা চাঁদের মতন ফর্শা। সাপটা সেই রাস্তার ওপর দিয়েই ছুটছিল। তার পেছন পেছন রমজান ছুটছিল, কিন্তু কিছুতেই সাপটার নাগাল পায় না। এঁকেবেঁকে বিদ্যুৎগতিতে সাপ চলতে থাকে।

রমজান যখন দৌড়োতে দৌড়োতে খালের ধারের পাকা রাস্তায় উঠল, তখন অন্ধকার আর বৃষ্টি যেন একই সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। রমজানের কিরকম নেশা ধরে গিয়েছিল সাপটা ধরার। যার খেয়ে-পরে সে আর তার বউ ফুলবাসরী মানুষ হয়েছে, তার ঋণ শোধের নেশায় পেয়ে বসেছিল তাকে। নিষ্পাপ শান্ত আলাদা ঢালিবাড়ির ছোটো ফুলের মতো মেয়েটার কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। সে তো ঢালির মতো ছিল না—ঢালির ছেলেমেয়েদের মতো ছিল না—তবু তাকেই কেন সাপটা কামড়াল? আধো-অন্ধকারে চোখ দুটো টর্চের মতোই জ্বালিয়ে রেখেছিল রমজান তা না হলে কখন সাপটা চোখের আড়ালে চলে যেত। চলে গিয়েছিলও দুএকবার। তারপর ঠিকই চোখ দিয়ে খুঁজে বের করেছে রমজান।

সাপটা শুনশান খালি পাকা রাস্তা পেয়েই হয়তো—রাস্তা দিয়ে ছুটছিল। রাস্তার পাশের কাল—জোয়ারের পানি না, বৃষ্টির পানিতে ফুলে-ফেঁপে নদীর মতো বয়ে যাচ্ছিল, সাপটা আর রমজান ছুটতে ছুটতে বাজারের কাছে এসে পড়ল।

আজ অবশ্য বাজারে কাকপক্ষীটিও নেই। খাঁ খাঁ করছে। রাত দুটোর আগে ঝাঁপ বন্ধ করে না যে-নূরালি, তারও মুদি দোকান আজ বন্ধ। তার পাশেই বীতাংশু ভট্টাচার্যের হোমিওপ্যাথি দোকানও বন্ধ। খালপাড় অন্ধকার। সাপটা যেন এদিকেই এল। এক মুহূর্তে সাপটা হারিয়ে ফেলে ঝেঁপে-আসা বৃষ্টির ভেতর দাঁড়িয়ে ভাবছিল রমজান। ঐ গোলপাতার জঙ্গলের ভেতরে চলে গেল নাকি? তখনই দেখল, খালের ঐদিক থেকে এই এত বৃষ্টির ভেতর একটা ছেলে ছোটো একটা ডিঙিনৌকা বেয়ে আসছে। স্রোতের তোড়ে তার নৌকো তীরের মতো ছুটে চলেছে। ছেলেটা শুধু হালটা ছুঁয়ে রেখেছে পানিতে।

সাপটাকে দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে খানিকটা দিশাহারা, খানিকটা হতাশ রমজান সম্বিৎ ফিরে পেল গোলপাতার ঝোপের নড়াচড়ায়। তারপরই বোটকা গন্ধে অজ্ঞান হতে হতে দেখল গোলপাতার ঝোপের ভেতর থেকে রাজকীয় চালে বেরিয়ে এল একটা বাঘ। বাঘটি এক মুহূর্ত স্থির থকে ছুটন্ত নৌকোর মাঝির উদ্দেশে লাফ দিল। অন্ধকারেও যেন রক্তের ধারা লাফিয়ে উঠতে দেখল রমজান।

ছেলেটাকে কী বাঁচানো যাবে?—ভাবল রমজান। ভেবে, এদিক-ওদিক তাকাল। সাপটার কথা সেই মুহূর্তে আর তার মনে ছিল না। তখনই দেখল, কাঠের পোলটা পানির ওপরে ঠিকই জেগে আছে। ফুলবাসরী না বলছিল, পোলটা ভেঙে গেছে, ভেসে গেছে? ভুল শুনেছে।

ছুটতে ছুটতে কিন্তু সতর্কভাবে ছুটতে ছুটতে পোল পার হলো রমজান। চোখ তার বাঘটার দিকেই ছিল। বাঘটা সাঁতরে ওপারের দিকে চলেছে। মাঝি-ছেলেটি সমেত খালের পানির ঘূর্ণিতে সতর্কভাবে এপারের সোজা জায়গাটি খুঁজতে খুঁজতে বৃষ্টি ধরে এল আবার। রমজান ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না কী করবে। কিছুই খুঁজে না পেয়ে রমজান একটা বন্ধ দোকানের সামনে বাঁশের চটা দিয়ে তৈরি বেঞ্চিতে বসল। খালের ওপাশেও কয়েকটি দোকান আছে। কয়েক ঘর বসতি আছে রমজান খুব বেশি না—দুএকবার এসেছে এদিকে।

অনেকক্ষণ দৌড়ে—তারপর তো সারাদিনের ক্লান্তি উপবাস আছেই—রমজান আচ্ছন্নের মতো বেঞ্চিতে বসে থাকল। ফুলবাসরীর কথা তার মনে পড়ছিল না, ফিরোজার কথা তার মনে ছিল না, ওঝাদের বিচিত্র সাপের বিষ-ঝাড়ানো মন্ত্র তার মনে ছিল না, কেবল কিরকম একটা ঘোরের মধ্যে থেকেও তার মনে হচ্ছিল সাপটির কথা, যার পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে সে এসেছিল খালপাড়ে। তারপর বাঘটির কথা। বাঘটাই বা কোথায় গেল?

সাপের কথা বাঘের কথা ভাবতে ভাবতে সে আর সাপের কথা বাঘের কথা ভাবছিল না। কী যে ভাবছিল, তাও সে জানে না। খেয়াল হলো, গা শিরশির করে উঠতে। তার গায়ের কাপড়-টাপড় শুকিয়ে গিয়েছিল—কিন্তু একটা ঠাণ্ডা বাতাসে তার শিউরে উঠেছিল। তখন সে অবাক হয়ে দেখল, কখন বৃষ্টি একদম কমে গেছে, আকাশ পরিষ্কার হয়ে হয়ে নীল দেখা যাচ্ছে, শাদা শাদা মেঘ ছুটোছুটিও করছে, যেন, চান্নি রাত। রাতের প্রথম শেয়াল ডেকে ওঠার পর-পরই যেন কোত্থেকে চান্নি রাতের মতোই ফর্শা একটা মেয়েমানুষ সামনে এসে দাঁড়াল।

রমজান অবাক হয়ে বলল, 'কে গা তুমি এত রাত্তিরে?' রমজানের একটুও ভয় লাগল না। অন্য-কিছু না। কিরকম তার মনে হলো মেয়েটার ফর্শা রঙ খানিকটা সন্ধেবেলায়-দেখা সেই বাঘের রঙের মতো।

মেয়েটা হাসতে লাগল। কোনো জবাবই দিল না।

রমজান এবার রেগে গেল। বলল, 'কি ব্যাপার? রা কাড়ছো না কেন?'

মেয়েটা এবার নরম গলায় বলল, 'আমাকে তুমি চেনো না? কত দিন নূরালির মুদিদোকানে আমি তোমাকে দেখিসি। পেয়াজ-নুন-মরিচ কিনতি আসতে তুমি। চাল কিনতি আসতে। দোকানে বাকি রাখার জন্য নূরালি রোজ তোমাকে কথা শোনায়—তাও আমি জানি। জানব না কেন, আমি তো নূরালির দোকানের পেছনের ঘরে থাকি। ওখানেই তো নূরালি রেখেছিল আমাকে। আমি নূরালির মেয়েমানুষ। সাঙা-করা না। এমনি। রাখতো মেয়েমানুষ। ক-দিন হলো তেইড়ে দিয়েছে। কী?—না, আমার ছেলেকে আমি লুকিয়ে দোকানে চাল-ডাল দিয়ে দিই নাকি? মিছে কথা। কিন্তু শুনল না। বের করে দিল। আসল কথা, ওর বে-করা

ছেলেমেয়েরা ঘরে অশান্তি করছে। তা নাহলি নূরালি কিন্তু খারাপ লোক না। আমারে মাতায় তুলে রেখেসেলো।'

তারপরই আকস্মিকভাবে মেয়েটা বলল, 'আমারে রাখতো রাখবা তুমি? শুধু দু-বেলা দুটো খেতে দেবা। আর কিছু না। বছরে ঈদে-বকরিদে একটা শাড়ি দিতি চাও দিয়ো, না দিতি চাও দিয়ো না। আমারে ঐ বাজারের চালের আড়তদার রাখতে চেয়েছিল—আমি রাজি হইনি। কেন-যেন ওকে আমার পসন্দ না। আমার সব সোমায় মনে হয়, ওর কোনো মতলোব আসে। কেন যেন মনে হয়, ও আমাক বর্ডার পার করে ইণ্ডিয়ায় বেচে দিয়ে আসবে। তুমি আমারে রাখবা? তোমারে দেখে মনে হয় ভালোমানুষ।'

রমজান লক্ষ্য করে দ্যাখে, মেয়েটার হাসিমুখ নেই আর। চান্নিরাতেও মনে হচ্ছে, ওর চোখের কোনায় পানি ঝলমল করছে।

কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না রমজান। তারপর বলল, 'তা তুমি এখেনে কেন?'

মেয়েটি ছেঁড়া শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে বলল, 'এখেনে এয়েছিলুম কাজের ধান্দায়।'

রমজান জানে বর্ডার-এলাকার এসব লোকজন নানারকম চোরাচালানির সঙ্গে যুক্ত। এদিকে মেয়েটা কোনো কাজ পেয়ে যেতেও পারে।

কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না রমজান। নিজেরই দিন চলে না তার ফুলবাসরী ছাড়া অন্য কোনো মেয়েমানুষের কথা চিন্তাই করতে পারে না। এসব তাদের জন্যে না।

এই সময় যেন মাটি ফুঁড়ে দুজন লোক জেগে উঠল।

লুঙ্গি-গেঞ্জি-পরা দুজনই। খালি পা। একজন দাড়িঅলা। একজন গোঁফঅলা।

'তোমরা কারা?'

মেয়েটা বলল, 'আমার নাম পূর্ণিমা। ইনি আমার কেউ না। আমি কাজ খুঁজতিসি। আপনারা কেউ যদি আমাকে রাখ্তো রাখতি চান, আমি থাকব না।

গোঁফঅলা বলল, 'মিয়াভাই, মেয়েমানুষটা আমার পসন্দ হয়েছে। কিন্তু তুমি আমার বড় ভাই। তুমিই ওকে রাখো।'

দাড়িঅলা বলল, 'পুলিশের লোক না তো তুমি? পুলিশের গোয়েন্দা হলি কিন্তু জানে খতম করে দেব। তা নাহলি চলো আমার সঙ্গে। ভাতকাপড়ের অভাব হবে না। আর একটা কথা, পেট বাধিয়ে আসোনি তো?'

মেয়েটা একটুও লজ্জা পেল না। হেসে বলল, 'আমার একটা ছেলে আসে। বছর দশ-বারো বয়সের। আর ছেলেপুলে হবে না। আপনি মনের সুখি যা ইচ্ছে করতি পারবেন।'

ছোট ভাই বলল, 'মিয়াভাই, এরে নিয়ে নাও।'

বড় ভাই মেয়েমানুষটিকে বলল 'দেখি, পেছন ফেরো তো।' ভালো করে তাকিয়ে দেখে বলল, 'গড়নপেটন তো ভালোই মনে হচ্ছে।' তারপর বলল, 'আমার

ধেনো জমি আছে অনেক। ঢেঁকিতে পাড় দিতি পারবা তো ধনের মৌসুম এলি? তাহলি, চলো।' তারপর রমজানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার নাম কি?'

রমজান নাম বলল।

বড়ভাই দয়ার্দ্র সুরে বলল, 'তোমারও কাজ দরকার বোধহয়। 'জোন' খাটতি চাও তো চলো।'

রমজান রাজি হয়ে গেল হঠাৎ কী মনে করে।

কয়েক দিনের মধ্যে ঢালি বাড়ির কথা ভুলে গেল রমজান। তার মনে হতে লাগল, ঢালি তাকে ঠকিয়েছে। ঢালির বাড়িতে ক্রীতদাসের মতো খেটেছে সে। কিন্তু কী পেয়েছে? ফুলবাসরীকে বিয়ে করায় ঢালি তাকে জমি দিয়েছে, বাড়ি দিয়েছে। এর পেছনে কোনো ভেদ নেই তো? ফুলবাসরী বাঁজা কেন—কে জানে। আল্লাতালার কুদরত, নাকি অন্য কিছু? তবু ফুলবাসরীর জন্যে তার মন কেমন করে ওঠে মাঝে মাঝে।

আরো কয়েকদিন পরে বড় ভাই নৌকো নিয়ে যাবে সুন্দরবনের ভেতরে। কত রকম কাজ যে করে সে। তার একটা পরিচয়, গরানকাঠের মহাজন। পনেরো-কুড়ি দিন লাগবে সুন্দরবন ঘুরে আসতে—নৌকো বোঝাই করে কাঠ আনতে। ধুমধাম করে চাল-ডাল লোক-লশকর নিয়ে মিয়াভাই চলে গেল। যাবার সময় রমজানকে সবকিছু বুঝিয়ে দিল। তার স্বভাবসুলভ সততা আর আন্তরিকতার জন্যে, ঢালির মতো এখানেও, গরানকাঠের মহাজনের বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠেছিল রমজান। যাবার সময় রমজানকে একটু আড়ালে ডেকে মিয়াভাই বলল, 'রমজান, ঐ পুন্নিমের দিকে একটু নজর রাখিস।'

নজর এমনিতেই রাখছিল রমজান। সেই খালপাড়ের প্রথম রাতটা সে ভোলেনি। বলতে গেলে সেজন্যেই সে এখানে রয়ে গেছে। একটা সন্দেহ আছে তার মেয়েমানুষটাকে নিয়ে। বাঘ সাঁতরে এল এদিকে—আর কোথাও কিছু না, এই মেয়েমানুষ! তবে, মেয়েমানুষ বটে! চান্নিরাতের মতো রঙ, মানকচুর পাতার মতো চওড়া পাছা, কুমোরের তৈরি নতুন হাড়ির মতো মাই। গরানকাঠের মহাজন কী এমনি মজেছে!

চোখে চোখে রাখছিল রমজান পূর্ণিমাকে। ছোট ভাইএর সঙ্গে একটু বেশি খাতির না? মহাজন বেরিয়ে যাবার পরে গুজগুজ ফুসফুস চলছেই। নজর রাখছিল বলেই ধরতে পারল রমজান। ঘরের পেছনে পূর্ণিমা কী করতে গিয়েছিল। সে-ই জানে। ছোট ভাই কোত্থেকে আসছিল। ওখান থেকেই হাত নেড়ে ডাকল পূর্ণিমা। কলাগাছের আড়াল থেকে সব দেখতে ও শুনতে পাচ্ছিল রমজান।

'ছোট ভাই, আমার বুকে বড় ব্যথা। একটু টিপে দেবা?'

'কী বলসো তুমি?'

'যা বলসি, করো শিগগির। তা নাহলি মহান এলি বলব, তুমি আমাকে জোর করে...'

রমজান তারপরই অবাক হয়ে দেখল, একটা কুড়াল হাতে মহাজন কোত্থেকে এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের পেছনে।

ছোট ভাই বলল, 'মিয়াভাই, তুমি!'

'হ্যাঁ!' হুংকার দিয়ে উঠল বড় ভাই। 'সন্দ হচ্ছিল আমার। ওদের তাই সোন্দরবনে পাঠিয়ে আমি চলে এলাম। যা ভেবিসি, তাই। আমার রাখ্ তোর গায় হাত দিলি তুই?'

'মিয়াভাই, আমার দোষ নাই।' মহাজনের চোখের দিকে তাকিয়ে ছোট ভাই আঁচ করেছিল, তার রেহাই নেই। একছুটে গিয়ে চালের বাতায় গোঁজা একটা দা বের করল, 'ইচ্ছে করেই পুন্নিমার গায়ে হাত দিয়েসি আমি। তুই কি করবি কর। সারা জীবন সব আমি শুধু তোরেই দিয়ে গেসি। আর না। এই মেয়েমানুষ আমার। ওরে নিয়ে চলে যাব।'

'কোথায় যাবি তুই? কে তোরে যাতি দিচ্ছে? বড় ভাই যথারীতি অবিচল গলায় বলল, 'তুই পুন্নিমার পায়ে ধরে মাপ চা।'

'মাপ চাচ্ছি!' ব্যঙ্গ করে একথা বলে দা উঁচিয়ে এগিয়ে গেল ছোট ভাই। বড় ভাই কুড়ালের ঘা মারল ছোট ভাইয়ের মাথায়। ছোটভাই দা-টা ছুঁড়ে মেরেছে। দুজনে ঘরের পেছনে রক্তের মধ্যে শুয়ে রইল।

একটু পরই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন একজন দরবেশ।

রমজান দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'সালামআলেকুম, হুজুর।'

'আলায়কুম আসসালাম।'

রমজান বলল, 'হুজুর, আমি আপনার পেছন পেছন ঘুরতিসি অনেক দিন। আমি সব দেখিসি, হুজুর। আপনি কে?'

রমজান অবশ্য তার প্রশ্নের জবাব পেল না। কেননা হঠাৎ পায়ে তীব্র ঝনন্ করে উঠল। আর রমজান পায়ের দিকে তাকিয়ে দ্যাখে, ছোবল নামিয়ে একটা সাপ অতিদ্রুত তার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। তীব্র ব্যথার মধ্যেও রমজান চমকে উঠেছিল—আরে, এটা ওই সাপ না, ঢালির মেয়েকে যেটা কামড়েছিল? কিন্তু ততক্ষণে ব্যথায় ঢলে পড়েছে রমজান। দরবেশকেও আর সে দেখতে পাচ্ছিল না। সাপে কামড়ালে তাগা বাঁধতে দেখেছে কতজনকে রমজান, কিন্তু সে-সব রমজানের মনে পড়ল না। তার শরীর নীল হয়ে আসছিল। তার গোলগাল ছোটখাট বাঁজা বউ ফুলবাসরীর কথাও মনে পড়ল না তার। অনেকদিন আগে বাপের হাত ধরে গঞ্জে গিয়ে একবার সে ইস্টিমারে চড়েছিল। বাপকে ঠিক দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু মনে হচ্ছিল বাপের হাত ধরে সে ইস্টিমারে চড়ে বসেছে। খোলা ডেক-এ কী বাতাস! বিশাল ইস্টিমার সিটি বাজিয়ে নড়ে উঠল। ঢেউএ ঢেউএ ডাঙা দূরে সরে যাচ্ছে। অস্পষ্ট হয়ে আসছে সব। ঘুরে ঘুরে উড়ছে কয়েকটা পাখি। নীল আকাশ। চাকার জল কাটার তুমুল শব্দ। ইস্টিমার চলতে শুরু করেছে ॥

[১৯৯৩]

ব্ল্যাক-আউট

১। অন্ধকার শব্দ একটি অদৃশ্য ও সমান্তরাল রেখা ধরে ক্রমাগত ওঠে পড়ে, ক্রমশ ঘনিয়ে আসে, জোর হতে থাকে, আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে মিলিয়ে যায়, ফিরে আসে, জোর হতে থাকে, শ্রুতির খুব ভিতরে মস্ত বুটজুতো অলৌকিকভাবে পড়তে থাকে, বুকের ভিতরকার অরণ্যে অতিপ্রাকৃতিক ড্রাম বাজে, কখন আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে মিলিয়ে যায়, ফিরে আসে ফের, ক্রমশ ঘনিয়ে আসে, ক্রমাগত ওঠে পড়ে, বুকের উপর আস্ত-কঠিন বুটজুতো পড়তে থাকে, পরে দূরে চলে যায়, আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে মিলিয়ে যায়।

২। ছায়ার ভিতরে গাঢ়তর ছায়া তৈরি করে বসে আছে একটি নিথর শরীর : আজিজ। বাইরের রাস্তার ক্রমশব্দ তার মনোমণ্ডলে একটি ছবি আঁকে : পেশীদৃঢ় মুখ, খাকি মুখ, খাকি শরীর, খাকি হৃদয়।

৩। আজিজের কান বড় হতে হতে একটা মাঠের মতো বিশাল হয়ে ওঠে। তার ভিতর দিয়ে একটি পথ চলে গেছে। সেই পথে একতারা বাজাতে বাজাতে একটি বাউল চলে আসে। কাছে এলে দেখা যায় লোকটি সবুজাভ-প্রায় খাকি পোশাক পরে আছে—হাতে তার একতারা নয়, বন্দুক।

৪। নিঃশব্দে বসে আস আজিজ।

৫। জানালার পাটাতন উঠে পড়ে আজিজ।—ভেন্টিলেটর-এ কাগজ গুঁজে দ্যায়। হাতে নাগাল পায় না বলে সে পায়ের আঙুলের উপর ভর রেখে দাঁড়ায় কাত হয়ে। তার পা টলমল করতে থাকে।

৬। সবুজ মাঠে গোল ও পাটকিলে একটি ফুটবল-এর উপর আজিজ কেবলি চেষ্টা করতে থাকে দাঁড়াবার। অদৃশ্যে তাকে ঘিরে হাসি বাজে।

৭। কোথাও আলো নেই—আকাশে না, পৃথিবীতেও না। কারফ্যু-র কালো পরদা নেমে এসেছে ভূমণ্ডলে—রঙ্গমঞ্চে বা নাটঘরে এখন অনুষ্ঠিত হবে অভিনয়। রাস্তার আলো জ্বলেনি; রাস্তার দু'পাশে বাড়িঘর ও দোকানপাট নীরব ও নিরালোক। সমস্ত শহর যেন উঁচু-নিচু সমাধিতে একটি বিশাল কবরগাহ হয়ে আছে।

৮। অসিত-কঠিন শব্দ একটি অদৃশ্য ও সমান্তরাল রেখা ধরে নির্দিষ্ট নিয়মে ওঠে পড়ে, ক্রমশ ঘনিয়ে আসে, সোজা আজিজের বুকের ভিতরে উঠে আসে।

৯। ভালো করে পরদা টেনে দিচ্ছে আজিজ। সে এবং তার ভাই-বোন ক'টি আর তাদের আব্বা-আম্মা সবাই বসে আছে এই ঘরে নিঃশব্দে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে।

১০। তাদের গলিপথের বুটজুতোর ক্রম-শব্দ তার কানে ক্রমাগত বেজে চলেছে। সব বন্ধ করে দেওয়ায় শব্দ একটু আবছা-ঝাপসা হয়ে গেছে মনে হয়; একবার মনে হয় : সত্যি শুনছে, একবার মনে হয় : না তো।

১১। বাইরে আলো যাবার মতো একটু রন্ধ্র নেই—একরকম নিশ্চিত হয়ে আজিজ আড়াল করে একটি দেশলাইকাঠি জ্বালে। দেশলাইয়ের চমকানো আলো হঠাৎ বসে থাকা শরীরগুলোর উপর রক্তলোভী ছবির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে।

১২। জ্বলে ওঠা মোমবাতির আলোয় সোফা পালঙে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-থাকা পারিবারিক সবাইকে অর্ধালোকে আশ্চর্য লাগে। খুব আপন মনে হয়। একই বাড়িতে থেকেও আজিজ যেন বহু দূরে চলে গিয়েছিল। এখন আবার বাড়ির সবার খুব নিকটে চলে এসেছে, তারা যে এত কাছাকাছি, হৃদয়ের এত সন্নিকটবর্তী, তা যেন এবার জানা গেল। যেন আজিজ কিসের পিছনে হাঁটছিল কী উদ্দেশ্যে তা জানে না, হঠাৎ সেই ছুটন্ত পথের ধারে একটি বিশ্রামনীড় পেয়ে মনে হচ্ছে এখানে অনন্ত কাল কাটিয়ে দেওয়া যায়—উদ্বেগে ভরা; কিন্তু বিশ্রামের একটি বৈকালিক আলস্য দিয়েও মাখানো যেন।

১৩। টেলিভিশন চালিয়ে দেয়া হলো। অন্ করার শব্দ গুলির শব্দের মতো এসে বেঁধে যেন সবার কানে।

১৪। টেলিভিশন থেকে যে আলো এসে পড়েছে, তা যেন সূর্যের মতো মনে হয়। মোমবাতি নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এত আলো! দ্বিতীয় সূর্যের মতো, নিশীথসূর্যের মতো, নিষিদ্ধ সূর্যের মতো। এত আলো! জানালা, দরোজা বা ভেন্টিলেটরের কোনো গোপন ফোকর বেয়ে বাইরে গিয়ে পড়েনি তো! তাহলেই সর্বনাশ! কাগজে, রেডিওতে, টেলিভিশনে বারবার হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে : নিষ্প্রদীপ রজনীতে যেন এক ফোঁটা আলো দেখা না যায়। যদি আলো দেখা যায়...বাকিটা ভাবতে পারে না আজিজ।

১৫। ঘরের মধ্যে টেলিভিশনের চড়া একতরফা আলো। সেই আলোয় যেন অনেকগুলি ভাঙাচোরা মূর্তি স্তব্ধ হয়ে আছে আলো-আঁধারের দোজখে।

১৬। গোলাপবাগে একটি ছোট ছেলে; চতুর্দিকে তছনছ সৌন্দর্যের মাঝখানে একেলা দাঁড়িয়ে।

১৭। টেলিভিশনের শব্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবু সেই শব্দ যেন ঘরময় পায়চারি করে বেড়ায়। যেন সেই শব্দ সমস্ত বাড়িময় ঘোরে। অন্য ঘরগুলি অন্ধকার। অন্য ঘরগুলি শব্দহীন। শুধু এই ঘরে টেলিভিশনের শব্দ, টেলিভিশনের আলো। যা কিছু শব্দ সব টেলিভিশনের, যা কিছু সব টেলিভিশনের। আর সব স্তব্ধ। জীবিতেরা চুপ হয়ে আছে, যন্ত্র কাকলিত।

১৮। অন্ধকার ঘর, অন্ধকার বারান্দা, অন্ধকার আকাশ, অন্ধকার পৃথিবী। ঘনকৃষ্ণ বিশাল একটি জাল পড়ে আছে পৃথিবীর উপর। তার ভিতরে লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে কেবল আকাঙ্ক্ষার শাদা, চকচকে ও ঝিলমিল মাছ।

১৯। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে আজিজের অন্ধকার মূর্তি।

২০। নিস্প্রদীপ রজনী, নিস্প্রদীপ মহড়া; কিন্তু নৈঃশব্দও তার অনুচর। টেলিভিশনের শব্দ কমিয়ে যেন সেই অন্ধকার বাড়িয়ে দেওয়া যাবে। শব্দ যেন আলোর শত্রু। শব্দের ভিতর দিয়ে কখনো কখনো আলো ঠিকরে বেরোয়।

২১। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে আজিজের অন্ধকার মূর্তি।

২২। পাড়ার কোনো বাড়িতে কোনো অনুসন্ধান কাজ চলছে কি? তা নাহলে টহল কেন? অথবা আসন্ন ভয়াল সেই নিয়মিত আওয়াজটিকে হত্যা করার অবচেতন ইচ্ছা থেকেই কি টেলিভিশন চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল? পায়ের শব্দ শুনে ঘরে ভিতরকার মানুষগুলি নিথর হয়ে গিয়েছিল কেন? রাস্তার গম্ভীর বুটজুতো শব্দ কি এতদূর থেকে মানুষগুলোর গলা টিপে ধরেছিল! ব্ল্যাক-আউট চলছে; কারফ্যু চলছে; চোখে দেখিনি, তবু কি ঐ মোড়ে, এই গলিপথটুকু যেখানে বড় রাস্তায় গিয়ে মিশেছে, সেখানে একটি জাল বিছানো অলিভ-রঙ গাড়িকে এসে থামতে দেখিনি?

২৩। বারান্দায় আজিজের অন্ধকার মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে।

২৪। পরক্ষণে আজিজ দ্রুত বারান্দার আলো জ্বেলে দ্যায়, ঘরের আলো জ্বেলে দ্যায়। বারান্দায় আলো জ্বলে ওঠে, তাদের বাড়ির ঘরে ঘরে আলো জ্বলে ওঠে। আজিজ সদর দরোজা খুলে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে রাস্তায়। রাস্তায় লাইটপোস্টে মুহূর্তে পাকা ফলের মতো চমৎকার আলো জ্বলে ওঠে, সারি সারি, মায়াবীর মতো জাদুস্পর্শে সেই আলোজ্বলা সরল রাস্তার দারুণ নির্জনতার ভিতর দিয়ে আজিজ ছুটতে থাকতে। আজিজ যে রাস্তায় যায়, সে রাস্তায় আলো জ্বলে ওঠে। সারা শহর আলোয় আলোকময় হয়ে ওঠে—ঝলমল করতে থাকে—ঝলমলে বিজন সেই ঢাকা শহরের ভিতর দিয়ে আজিজ ছুটতে থাকে একা একা।

২৫। বারান্দায় আজিজের অন্ধকার মূর্তি দাঁড়ানো। বারান্দা অন্ধকার, ঘর অন্ধকার, বাড়ি অন্ধকার, পাড়া অন্ধকার, শহর অন্ধকার, আকাশ অন্ধকার।

২৬। আজিজ ঘরে। টেলিভিশন চলছে। ঘরময় তার শব্দ, তার আলো একটা জীবিত আশ্বাসের মতো মনে হয়। মনে হয় : না, আমরা একা নই। ঘরময় গমগম করছে ভোমরার মতো শব্দ, অন্ধকার ঘরে টেলিভিশনের আলো ওদের শরীরে চলাফেরা করছে ফড়িঙের মতো। টেলিভিশনের শব্দে কখন সেই টহল দিয়ে ফেরা পদশব্দ মরে গেছে। আর একটুও শোনা যায় না।

২৭। ঘরে কেউ নেই, বাড়িতে কেউ নেই, শুধু অন্ধকার খেলা করে। মৃত সেই বাড়িতে শুধু টেলিভিশন চলছে। কোনো শ্রোতা নেই, কোনো দর্শক নেই—উদ্দীপ্ত এক ভদ্রলোক বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন।

২৮। ঘরে মধ্যেকার সবাই চুপচাপ বসে, টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে, কিন্তু কেউ খুব মনোযোগ দিয়ে বক্তৃতা শুনছে মনে হয় না।

২৯। টেলিভিশনের শব্দের মধ্যে অন্য একটি শব্দ শোনা গেল। গুলির শব্দ।

৩০। ঘরের মধ্যে পিন-পতন স্তব্ধতা। রুদ্ধশ্বাস। বক্তৃতারত সেই ভদ্রলোক যেন আরো উদ্দীপিত হয়ে উঠেছেন।

৩১। ঘরের মধ্যে পিন-পতন স্তব্ধতা। রুদ্ধশ্বাস। বক্তৃতারত সেই ভদ্রলোক যেন আরো উদ্দীপিত হয়ে উঠেছেন।

৩২। সম্বিত ফিরে পেতে না-পেতেই বাইরে একসঙ্গে অনেকগুলি পদশব্দ শোনা যায়।

৩৩। পরমুহূর্তে দরোজার উপর প্রবল করাঘাত ও তুমুল পদাঘাত। 'দরওয়াজা খোলো'—দরওয়াজা খোলো!

৩৪। যেন এই আদেশের ব্লটিংপেপার এক মুহূর্তে অদৃশ্যভাবে সবগুলি মুখ থেকে সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে। প্রত্যেকের মৃত মাছের ভাবলেশহীন চোখ অপরের মুখের উপর ন্যস্ত। আজিজ তার আব্বার দিকে তাকায়। করিম শাহেব বিমূঢ়। আম্মাকে মনে হলো আজিজের, যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বেন।

৩৫। বাইরে 'দরওয়াজা খোলো!' ভিতরে টেলিভিশনের বক্তৃতা।

৩৬। আজিজ খাপছাড়াভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে সোফা ছেড়ে। করিম শাহেবের সহসা যেন হোঁশ ফিরে আসে। বলে ওঠেন—না, না, তোকে যেতে হবে না—আমি যাচ্ছি।

৩৭। দরোজা খুলে যায়।

৩৮। দরোজার উপরেই কয়েকটি মুখ ও শরীর, উদ্যত বন্দুক প্রায় সবার। 'ইধার সে গোলি কিয়া!' গুলি করেছ তোমরা। করিম শাহেব বলতে যান : না, আমরা তো গুলি করিনি, কারা যেন...। পাঁচ-ছজন ছোকরা, কাঁধে বা হাতে প্রত্যেকের বন্দুক, একজনের হাতে রিভলভারও রয়েছে।

৩৯। 'চালো! আন্দার দেখাও।' বুটজুতোর মর্মভেদী মচমচ শব্দ করে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে সবাই।

৪০। 'ইস্কা সাথ চিন পহচানতা আছে তো?' বন্দুক তুলে ধরে একজন জিগেস করে। হ্যাঁ বলা মুশকিল, না বলাও মুশকিল। মুহূর্তে একথা বুঝে নিতে দেরি হয় না করিম শাহেবের। বলেন : চিনি।

চেনো? তাহলে এসব জিনিশ আছে তোমার বাড়িতে?

না।

সাচ বলবে। তা নইলে তোমার বউ-ব্যাটা এখনি লাশ দেখতে পাবে।

সাচ বলবে। তা নইলে তোমরা বই-ব্যাটা এখনি তোমার লাশ দেখতে পাবে।

সাচ বলছি।

আচ্ছা? তব্ চলো। দেখাও।

৪১। রান্নাঘর, শোবার ঘর, পায়খানা, আশপাশ সমস্তটা একবার অতিদ্রুত চক্কর দিয়ে দেখে নেয়। দলটা। যেন কোনো আগ্নেয়াস্ত্র নেই এরকম নিশ্চিত হয়ে ঘরে এসে ঢোকে ফের। এসেই হুকুম করে খাটের তলা থেকে দুটো বড় বড় বাকশো বের করার। কিন্তু নিজেরা হাত দ্যায় না। উঁকি মেরে মেরে দ্যাখে। ঘরময় ছড়িয়ে থাকে ওরা।

৪২। টেলিভিশনে এখন গম্ভীরভাবে খবর পড়ছেন একজন। দেশে সর্বত্র স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে।

৪৩। একটি ছোকরা আজিজের সামনে বন্দুক খুলে কার্তুজ ভরে, তারপর তার বুকের উপর বন্দুকটা ধরে থাকে। সারাক্ষণ। আর সবাই অন্যত্র ব্যস্ত। এই ছেলেটির সুন্দর মুখে এক ধরনের ঠাণ্ডা জিঘাংসা যেন স্থির হয়ে আছে।

৪৪। আসলে এই ঘরে সবাই আছে : অন্য ঘরে যায়নি, হয়তো সাহসে কুলোয়নি। আজিজের অব্যবহিত ছোট ভাই আজিম, আর একেবারে ছোট ইস্কুলে পড়া আনিস, কলেজে পড়া বোন আয়েশা। আজিজ বড়, সদ্য এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে। একটি কনস্ট্রাকশন ফার্মে এই বয়েসেই চাকরি পেয়েছে মোটা মাইনের।

৪৫। বারবার বলছে ওরা : দেখাও, দেখাও। আজিজের আম্মাকে ভীত সংকুচিত কিন্তু আশ্চর্য তৎপর মনে হয়। আব্বা স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে। আম্মা পালঙের তলা থেকে বড় বাকশো দুটো বের করে দেখালেন। ওরা নিজেরা হাত দিচ্ছে না। একটু যেন অধৈর্য। বাকশো খুলে দেখাতে না-দেখাতেই বলছে, আলমারি খোলো।

৪৬। আজিজের বুকের উপরেই বন্দুক ধরে ছোকরাটা পালঙে আধ-শোয়া হয়ে শুয়েছে।

৪৭। আজিজের ভাবনাশক্তি লুপ্ত হয়েছে যেন। যেন সে একটি শূন্যবিন্দুর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কিংবা নিজেই হয়ে উঠেছে এক ফাঁপা ও ওজনহীন শূন্যবিন্দু।

৪৮। টেলিভিশন চলতে থাকে।

৪৯। হঠাৎ যেন নজরে পড়ে আজিজের—আয়েশাকে। আয়েশা বিবর্ণ মুখে মাথা নত করে বসে আছে। তার মুখ রক্তশূন্য। দেখতে দেখতে আজিজের খেয়াল হয় : কখন ওরা আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। আলো জ্বালাল কখন? আশ্চর্য তো! সারাক্ষণ তো আমি এই ঘরেই ছিলাম : কিন্তু আলো জ্বালাতে দেখলাম না তো? আজিজ কিছুতেই ভেবে উঠতে পারে না। ওরা কি ঘরে ঢুকেই আলো জ্বালিয়েছে? নাকি পরে? যেন এই প্রশ্নের উপর তার জীবন-মরণ নির্ভর করছে, এরকম অধৈর্য আর অস্থির হয়ে ওঠে সে ভিতরে ভিতরে। সেই অস্থিরতা তার শরীরেও সঞ্চারিত হয় কখন। আর তখনই বন্দুকের ঠাণ্ডা নলটা যা শার্টের উপর দিয়েও টের পাচ্ছিল।

সে তার বুকের উপর নড়ে ওঠে। যেন তাকে তার অস্তিত্ব স্মরণ করিয়ে দ্যায়। তখন সে যেন বাস্তবে ফিরে আসে, তার বুজের উপর পরিষ্কার স্থির বন্দুকের নল দেখতে পায়। জবাব পাবে না জেনে আস্তে আস্তে সে যেন হাল ছেড়ে দ্যায়। তার ভিতর থেকে কেউ যেন অদৃশ্যভাবে সমস্ত শক্তি শোষণ করে নিতে থাকে। অনতিকাল পরেই সে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে যায়।

৫০। টেলিভিশনের একজন গায়িকা সুমধুর কণ্ঠে গান গাইতে থাকেন।

৫১। আলমারি খুলে দেখাতে দেখাতে কাপড়ের ভাঁজ থেকে একটি চমৎকার কারুকাজ করা চারকোনা কৌটো মেঝেয় পড়ে যায় শব্দ করে। এই কৌটোর মধ্যে সংসার খরচ থেকে কিছু কিছু টাকা আম্মা জমিয়ে রাখছিলেন অনেকদিন ধরে। কৌটোটা মেজে থেকে যে তুলল, সে তার ভিতর থেকে সমস্ত টাকাটাই তুলে পকেটের ভিতর রেখে দিল। এক মুহূর্ত তার খুশি চোখ কোটোর উপরকার কারুকাজ দ্যাখে। পরে শূন্য কারুকাজময় কৌটো সে আম্মার হাতে ফেরত দ্যায়।

৫২। আজিজের বুক ছুঁয়ে-থাকা বন্দুকের নল হঠাৎ বিস্ফারিত হয়। আজিজ মেঝেতে শুয়ে পড়ে, ঘরময় এক হাজার ছিদ্রঅলা একটি ফোয়ারা তৈরি হয়।

৫৩। টেলিভিশনে গায়িকা চমৎকার ঠোঁট গোল করে চমৎকার চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গান গেয়ে যাচ্ছে।

৫৪। বন্দুকের নল আজিজের বুক ছুঁয়ে আছে।

৫৫। আজিজ একবার নতমুখে আয়েশার দিকে তাকিয়ে দ্যাখে। হঠাৎ আয়েশাকে দুজন ছোকরা দুই সরকারি হাতে দুই বাহু ধরে পাশের অন্ধকার ঘরের দিকে নিয়ে চলেন। আয়েশা মর্মভেদী চিৎকার করে ওঠে। তবু তাকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে।

৫৬। আয়েশা নীরবে নত মুখে বসে আছে।

৫৭। ওরা বোধ হয় একটু জিরিয়ে নিতে চায়। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে দাঁড়িয়ে ওরা টেলিভিশনের দিকে তাকায়। গায়িকা যেন জানতে পেরে হেসে হেসে গান গেয়ে চলেন।

৫৮। আজিজের পা টনটন করে, কনকন করে, যেন হাঁটু ভেঙে পড়তে চায়। অনন্তকাল ধরে বুকে আসন্ন মৃত্যু নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে।

৫৯। টেলিভিশনে গান চলছে

৬০। সহসা এক ঝটকায় বন্দুকটা কেড়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎগতিশক্তিতে বন্দুকধারীর পেটে একটা লাথি মারে। তার বন্দুক থেকে বৃষ্টির মতো গুলি ছিটিয়ে পড়ে ঘরে। সব ক-জন শত্রু ধরাশায়ী।

৬১। আজিজ দাঁড়িয়ে। একজন তার বুজের উপর বন্দুকের নল স্থির রেখে তারই বিছানায় শুয়ে আছে। তার সুন্দর মুখে, নতুন-ওঠা গোঁফে, ছোট সরু চোখে যেন শয়তান ছদ্মবেশ পরে আছে।

৬২। আজিজ মেঝের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, তার বুকের এক পাশের আলপিনের মতো ছোট একটি ছিদ্র থেকে বেগে বেরিয়ে এসে সরু একটি রক্তের নদী বয়ে চলেছে। চলেছে ঠিক দরোজার দিকে, যার বাইরে গেলেই মুক্তি।

৬৩। আজিজ দাঁড়িয়ে। বন্দুকের নল তার বুক ছুঁয়ে আছে।

৬৪। রিকশায় চলেছে আজিজ। নীলক্ষেতে রেলগেটএর কাছে একজন বন্দুকধারী রিকশা থামায়। অত্যন্ত অল্পবয়সী ছেলে, বারো তেরো বছরের বেশি কিছুতেই হবে না, তারও কম। বয়সের চেয়ে আয়তনে বড় মনে হয়। 'উতারো', বলে আজিজকে। আজিজ নিঃশব্দে নেমে পড়ে। রিকশার সীট উল্টে দেখে নিয়ে বলে, 'যাও।' রিকশাঅলার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আজিজের দিকে তাকায়ও না।

৬৫। টেলিভিশনে গান চলেছে।

৬৬। ছোকরাগুলো সোফায় পালঙে ছিটিয়ে শুয়ে বসে আছে। একজন দাঁড়িয়ে। নতমুখে বসে আছে আয়েশা। আম্মার বসে আছেন সংকুচিত হয়ে। আব্বা বসে আছেন যেন বসে নেই।

৬৭। গান শেষ। ঘোষকের মুখে পরবর্তী অনুষ্ঠান বিবৃত হয়। একজন সাংবাদিক ঢাকা শহরের বর্তমান অবস্থা, যা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, বর্ণনা করতে শুরু করেন।

৬৮। হঠাৎ ছোট্ট আনিসের দিকে চোখ পড়ে আজিজের। আনিসের মুখটা ব্যথায়-বেদনায়-বিস্ময়ে কিরকম হয়ে গেছে। এতটুকু ছেলে, ওর অপরাধ কী! ওর জন্যে অসম্ভব মায়া করতে থাকে বলে চোখ ফিরিয়ে নেয় আজিজ।

৬৯। 'বন্ধ করো!' 'বন্ধ করো!' এক সঙ্গে দু'তিনটে অধৈর্য গলা। বিরক্তিতে, হুকুমে মেশানো। একটা কাজ করতে পেরে করিম শাহেবের স্থাণু ভাবটা কেটে যায় যেন। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে কিন্তু দ্রুত ভঙ্গিতে তিনি টেলিভিশনটা বন্ধ করে দিলেন। সাংবাদিক ভদ্রলোকটি চকিতে উধাও। টেলিভিশন বন্ধ করে ফিরে এসে করিম শাহেব আবার অসহায় বোধ করতে থাকেন। ভিতরে ভিতরে কি যেন দ্রুত তাঁর সমস্ত শক্তি শোষণ করে নিচ্ছে। শক্তির তুষার সূর্যতাপ লেগে দ্রুত গলতে শুরু করেছে। ফতুর হয়ে যাবার আগে করিম শাহেব কাতর দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকান। ছোকরাদের দিকে। যদি একটা হুকুম পাওয়া যায়। যদি একটা কাজ পাওয়া যায়।

৭০। এখন সবাই কিরকম যেন অসহায় বোধ করতে থাকে। টেলিভিশন যতক্ষণ চালু ছিল ততক্ষণ যেন কোথায় একটা ভরসা বাজছিল। এখন যেন সমস্ত কেন্দ্রিত হয়েছে আসন্ন ঘটনার উপর।

৭১। এ্যাকুইরিয়ামের কাছে গিয়ে একজন দাঁড়ায়।

এইটা কি?

এ্যাকুইরিয়াম।

কি?

মাছ রাখে, মাছ পোষে।

একজন বোধ হয় চেনে। হুকুম করে : আলো জ্বালাও।

করিম শাহেব আলো জ্বালিয়ে দিলেন। চারকোনা কাচের আধারে পানি ডোবার মতো ঘোলা। দু'তিনটে মাছ নিচে শ্যাওলায় নুড়িপাথরে মুখ গুঁজে মৃত পড়ে আছে ধুলো-ময়লা ও অব্যবহার্য চাবির মতো।

৭২। আজিজের দাঁড়িয়ে থাকতে আর কোনো কষ্ট হয় না। বুকে বন্দুকের উঁচানো নল ঠেকিয়ে সে যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনন্তকাল পার করে দিতে পারবে।

৭৩। ঠিক ডোবার জলের মতো বোবা বধির পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এ্যাকুইরিয়াম

৭৪। দাঁড়িয়ে আছে আজিজ। তার ভিতরকার লাল-নীল-সোনা মাছগুলি মরে পড়ে আছে।

৭৫। ওরা আবার আর একটা আলমারি খুলিয়েছে। একটার পর একটা তাক দেখে। দ্রুত এলোমেলো করে। আম্মার যত্ন করে সাজানো ধোপার বাড়ি থেকে কাচিয়ে আনা, কোনো কোনোটি নিজের হাতে ইস্তিরি করা কাপড়-চোপড় এলোমেলো হয়ে তালগোল পাকিয়ে যায়। মেঝের উপর ডালা খোলা একটি বাকশো পড়েছিল। আম্মার একটু সাজিয়ে পালঙের উপর কাপড় রাখতে যাচ্ছিলেন। ওরা বলে : রাখো, রাখো, এখানে রাখো, জলদি কারো। অগত্যা মেঝের উপরেই রাখতে হয়। স্তূপের পর স্তূপ জমে ওঠে। সাজানো কাপড়-চোপড় ছত্রখান হয়ে যায়। একমুঠো গয়না ছিল সুন্দর একটি আধারে। একজন ছোঁ মেরে গয়নাগুলো নিয়ে নেয়।

৭৬। আজিজের বুক থেকে বন্দুক সরে গেছে। তবু সে দাঁড়িয়ে থাকে এক জায়গায়। চলচ্ছক্তিহীন

৭৭। ঠিক একটা সোনলি মাছের মতো একজনের হাত পিছলে সোনার একটি হার পড়ে যায় মেঝেয়। মেঝেতে পড়ে মাছের মতোই সাঁৎরে চলে যাচ্ছিল ওটা। অন্য একজন কুড়িয়ে নেয় সেটা। তৎক্ষণাৎ সেটা কঠিন সোনার হারে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

৭৮। 'চালো, ইয়ার।'

'চালো। চালো।'

ছোকরারা দাঁড়িয়ে ঠিকঠাক হয়ে নেয়।

'দ্যাখো, কিছু মনে কোরো না। আমরা কি খুব খারাপ আদমি?'

ঠোঁটের কোনায় চমৎকার হাসি এই প্রথম দেখা যায়।

হাসির উত্তরে হাসি। না, না।

পরক্ষণে হাসি নিবিয়ে ফেলে বলে : দেখো, কোনো ঝুটঝামেলা না হয় যেন। মুখ পাংশু হয়ে ওঠে করিম শাহেবের। না, না, কখনোই না।

'ঠিক হ্যায়।'

করিম শাহেবের মুখ আবেগ আর কৃতজ্ঞতায় উছলে ওঠে। তার মুখে শব্দ যোগায় না আর।

৭৯। এবার আর দরোজা খোলার হুকুম দ্যায় না ওরা। নিজেরা দরোজা খোলে। খুলে একটুও দেরি করে না, দ্রুত বেরিয়ে পড়ে। মেঝের উপর পাঁচ-ছয় জোড়া বুটজুতোর মর্মভেদী শব্দ হয়। সেই শব্দে বিজয়ের আর ফূর্তির আনন্দ মিশে আছে যেন।

৮০। দরোজা বন্ধ করতে ইতস্তত করে করিম শাহেব। কী জানি : আবার মুখের সামনে দরোজা বন্ধ করলে কি মনে করে যদি অপমান বোধ করে? যদি ফিরে আসে? আজিজ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে। তাঁর পাশে আম্মা। তারপর করিম শাহেব এমনভাবে দরোজা বন্ধ করতে থাকেন যেন এতটুকু শব্দ না হয়।

৮১। ছোকরার দল নেমে এসেছে রাস্তায়। কী আলো! এর মধ্যে কখন সম্পূর্ণ চাঁদ উঠে এসেছে আকাশে। এত আলো! চরাচর ভেসে যায় আলোয়, আজিজের বুকে বন্দুকের নল ধরে ছিল যে ছেলেটি, সে বন্দুক তুলে ধরে চাঁদের উদ্দেশে। গোল, নিটোল, পরিপূর্ণ সোনালিহাস্যময় চাঁদের প্রতি ঊর্ধ্বোত্থিত ক্রুদ্ধ বন্দুক থেকে আতীব্র গুলি উড়ে যায় ॥

[১৯৭২]

গ্রীন রোড

সামনেই বইমেলা আসছে।

আজ সকালবেলাতেই নাশতা খেয়ে, বেবি-ট্যাক্সি ধরে, বাংলাবাজারে চলে এসেছেন অধ্যাপক কাজী আজিজুর রহমান। একটু বেলা হলেই যা জ্যাম হয় রাস্তায়। বিশেষ করে গুলিস্তান থেকে সদরঘাট পর্যন্ত যেতে-আসতে তো প্রাণান্তকর অবস্থা। এসব তাঁর রোজকার অবস্থা। গ্রীন রোড থেকে কবি নজরুল কলেজে আসতে-যেতে হয় তাঁকে নিয়মিত।

এখন অবশ্য পুজোর ছুটি। কলেজ বন্ধ।

প্রেসে পুরোদমে কাজ চলছে। প্রকাশকরা এখন সচেতন হয়ে উঠেছেন। বইমেলার আগেই বই বের করে দিতে হবে।

অধ্যাপক কাজী আজিজুর রহমানের বড় একটি বই বেরোচ্ছে। 'নজরুল-জীবনী'। কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবনী। এর আগে তাঁর আর-একটি বই বেরিয়েছে। 'রবীন্দ্র-জীবনী'। বেশ কয়েক বছর আগে বেরিয়েছিল বইটি। সেটা প্রকাশ করেছিলেন বিখ্যাত প্রকাশনসংস্থা 'বিনোদন'। 'বিনোদন'-এর জাহাঙ্গীর হোসেন শাহেব।

অনেকদিন থেকে নজরুল-জীবনী লিখবার তাগিদ দিচ্ছিলেন জাহাঙ্গীর শাহেব। কাজী আজিজুর রহমানের নিজের দিক থেকেও তাগাদা ছিল। কবি নজরুল ইসলামকে মনে হয় অলৌকিক এক প্রতিভা। কোত্থেকে কীভাবে যে তিনি ঐসব কবিতা-গান লিখেছিলেন, ভাবা যায় না। তারপর জটিল জীবন। তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায় না ঠিকমতো। অনেকদিন থেকে একটু একটু কাজ করছিলেন। খানিকটা হঠাৎই তাঁর হাতে অভাবনীয়ভাবে আসে কবি নজরুলের একটি পাণ্ডুলিপি। দার্জিলিঙে বসে একটি খাতায় কবি নজরুল এই কবিতাগানগুলি লিখে দিয়েছিলেন জাহানারা চৌধুরীকে। জাতীয় জাদুঘরের প্রাক্তন মহাপরিচালক ড. এনামুল হক ভালোবেসে অধ্যাপক কাজী আজিজুর রহমানকে এই পাণ্ডুলিপির একটি ফটোস্ট্যাট কপি ব্যবহার করতে দিয়েছেন। কাজী আজিজুর রহমান নজরুল-জীবনী লিখছেন, অনেককাল ধরে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন—তা জানতেন ড. এনামুল হক।

হঠাৎ একদিন আজিজুর রহমানের বাসায় এসেছিলেন 'বিনোদন' প্রকাশনসংস্থার বর্ণধার জাহাঙ্গীর হোসেন। একটি কাজ নিয়ে। একটি রান্নার বই

বের করছেন তিনি। তার ভাষা দেখে দিতে হবে। টাকার জন্যে এরকম বেশ কিছু কাজ করতে হয়েছে অধ্যাপক কাজী আজিজুর রহমানকে। নোটবইও লিখেছেন প্রথম জীবনে। আরো সব কত কী! উপায় নেই। ক'টি টাকা মাইনে পান? ভাগ্যিশ, বাংলাটা ভালো জানেন। বেশির ভাগ 'বিনোদন'এরই বই। জাহাঙ্গীর শাহেব তাঁর ওপর নির্ভর করেন।

যাই হোক, নজরুলের ঐ দার্জিলিঙে-লেখা কবিতার পাণ্ডুলিপি দেখে জাহাঙ্গীর হোসেন এবারই বইমেলায় 'নজরুল-জীবনী' দিতে হবে, জানিয়ে দেন কাজী আজিজুর রহমানকে।

সেই বইএরই প্রুফ দেখা চলছে।

প্রথম প্রুফ দেখে দিয়েছেন একজন। দ্বিতীয় প্রুফ থেকে নিজেই দেখছেন কাজী আজিজুর রহমান। ভিতরে ভিতরে পরে-পাওয়া অনেক ম্যাটার ঢুকিয়ে দিতে হচ্ছে। বড় বই হবে। ২৫ ফর্মার কম না।

কাজী আজিজুর রহমান ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। সংগ্রাম করতে হয়েছে তাঁকে। ঠাণ্ডা মাথা নাহলে সেটা সম্ভব হতো না। পৈতৃক বাড়ি আছে। ভাড়া দিতে হয় না, পুত্রসন্তান তিনি একাই—আর চার বোন। কষ্ট করেই ছেলেমেয়েদের মানুষ করছেন—ছেলে ডাক্তারি পড়ছে ফাইনাল ইয়ারে, মেয়ে ফিলসফিতে এম.এ. পাশ করেছিল, তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। ছেলে ডাক্তারি পাশ করে গেলে আর তাঁর চিন্তা নেই। হোস্টেলে গেলে সুবিধা বলে এখন হোস্টেলে চলে গেছে। বাড়িতে ওঁরা স্বামী-স্ত্রী একা থাকেন। মেয়ে-জামাই আসে মাঝে মাঝে। ছেলেও দেখা করে প্রায়ই।

বেলা এগারোটার দিকে জাহাঙ্গীর হোসেন এলেন। তাঁর রুমে, তাঁর টেবিলে বসেই কাজ করছেন কাজী আজিজুর রহমান।

এসেই চা-বিস্কুটের ফরমাশ দিলেন।

'নজরুল-জীবনী'র প্রচ্ছদ হয়ে গেছে। বের করে দেখালেন।

দেখে মুগ্ধ হলেন কাজী আজিজুর রহমান। চমৎকার প্রচ্ছদ।

'কে করেছেন?'

'ধ্রুব। ধ্রুব এষ।' বললেন জাহাঙ্গীর হোসেন।

'বাহ! চমৎকার!' কাজী আজিজুর রহমান বললেন। 'নজরুল-জীবনী' বইটি, তিনি বিশ্বাস করেন, ভালো হবে। সারাজীবন তো সংসার চালাতে উঞ্ছবৃত্তি করতে হয়েছে। এই একটা কাজ ভালো করে করেছেন। আশা করা যায়, সমাদৃত হবে বইটি। জাহাঙ্গীর হোসেন শিক্ষিত প্রকাশক। পাণ্ডুলিপি দেখে তিনি প্রীত হয়েছেন। আশা করছেন, এবার বইমেলায় সাড়া জাগাবে বইটি।

তাড়া তাড়া প্রুফ সামনে। অনেকক্ষণ পরে একটি বিরতি পড়ল কাজে। জাহাঙ্গীর হোসেনের সঙ্গে চা খেতে খেতে গল্প করতে বেশ ভালো লাগছে। সারাজীবন বলতে গেলে বেগার খেটেছেন। নিজস্ব বই বের হচ্ছে, রাশীকৃত প্রুফ পড়ে আছে—এসব সামনে নিয়ে অনেকদিন পরে একটি আন্তরিক পরিতৃপ্তি বোধ করছেন কাজী আজিজুর রহমান।

কাজ ছিল জাহাঙ্গীর হোসেনের। তখনি বেরিয়ে যাবেন। বললেন, 'আপনি আছেন তো বিকেল পর্যন্ত?'

'হ্যাঁ।'

'আমি দুপুরের পরেই আসছি। বিকেলে হুমায়ুন আহমেদের বাড়িতে যাব ধানমণ্ডিতে। আপনাকে গ্রীন রোডে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে যাব।' জাহাঙ্গীর হোসেন বললেন।

'আচ্ছা। ঠিক আছে।' মনে মনে খুশি হলেন কাজী আজিজুর রহমান। রাস্তাঘাট প্রায় বিভীষিকা মনে হয়। জাহাঙ্গীর হোসেনের গাড়িতে একটু আরামে ফেরা যাবে।

তারপর জাহাঙ্গীর হোসেন বললেন, 'দুপুরে আপনার খাবার এনে দেবে।'

'দরকার নেই।' বললেন কাজী আজিজুর রহমান, 'আমি বিউটি বোর্ডিং থেকে খেয়ে আসব।'

জাহাঙ্গীর হোসেন বেরিয়ে গেলেন। যাবার আগে তাঁর লোকজনদের আর-একবার বলে গেলেন কাজী আজিজুর রহমানকে চা-টা যখন যা দরকার হয়, দিতে।

অনেকক্ষণ গল্প হয়েছে। বিরতির পরে চাঙা হয়ে আবার প্রুফে মনোনিবেশ করলেন কাজী আজিজুর রহমান। বাড়ি থেকে নতুন কিছু তথ্য সংবলিত পাণ্ডুলিপি, কিছু পত্রকর্তিকা নিয়ে এসেছেন। যথাস্থানে সে-সব ঢুকিয়ে দিতে লাগলেন। কিছু কিছু যোগও করলেন নতুন বাক্য—নতুন বিশ্লেষণ।

নজরুল-জীবনীর কয়েকটি বিষয় তো বেশ জটিল। মা-র সঙ্গে সম্পর্ক, দুই বিয়ে, প্রেমিকাদের সঙ্গে সম্পর্ক, তারপর কোথায় যে কখন থাকছেন—লোকটা যেন জীবনভোর অবিশ্রাম চরকির মতো ঘুরেছেন, আত্মজীবনী নেই, ডায়েরি লেখেননি, স্মৃতিচারকরাও ভুল করেছেন অনেকসময়, সন-তারিখ দেননি, তাঁদের দোষ কী, তাঁরাও তো এসব লিখেছেন বৃদ্ধ বয়সে।

কাজী আজিজুর রহমানের অবশ্য কোনো তাড়া ছিল না। পাঁচ-সাত বছর ধরে একটু একটু করে লিখেছেন। অনেক ভেবে-চিন্তে নিজের ধরনে একটা সমাধান দিয়েছেন। তাঁর বইএর দু-চারটে চ্যাপ্টার মাত্র ছাপা হয়েছে। নজরুল-চর্চা যাঁরা করেন, তাঁরা তাঁকে চেনেনও না।

এত গভীর মনোযোগ দিয়ে কাজ করছিলেন যে, প্রায় দুটো বেজে গেছে যখন, তখন উঠলেন কাজী আজিজুর রহমান।

ঘাড় গুঁজে কাজ করেছেন এতক্ষণ, ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। তিন তলা থেকে নেমে একটা রিকশা নিয়ে বিউটি বোর্ডিঙে গেলেন কাজী আজিজুর রহমান। আশ্বিন মাস। আকাশে শাদা মেঘ। নীল মেঘ। রোদের তেজ এখনি কমে এসেছে। দুপুর বেলার বাতাসেও গরম নেই এখন আর।

বাংলাবাজারে যখনই কাজ করতে আসেন কাজী আজিজুর রহমান, দুপুর হলে খেয়ে নেন বউটি বোর্ডিঙেই। বাড়ির মতো পরিবেশটা ভালো লাগে তাঁর। হৈ-চৈ নেই, সেটাও একটা কারণ। আর পরিচ্ছন্ন।

আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন, ওখান থেকে বেরিয়ে হেঁটেই ফিরবেন কাজী আজিজুর রহমান। যে-ক'দিন এসেছেন 'বিনোদন' অফিসে, রোজ তাঁর এই নিয়ম। দুপুরে খাওয়ার পরে একটু মিষ্টি খাওয়া। এ তাঁর বহুদিনের অভ্যেস। খাওয়ার পরে একটু মিষ্টি খেলে ভালো লাগে।

মিষ্টির দোকানে এখন দুপুরবেলা ভিড় নেই। কয়েকটা কড়কড়ে পরোটা পড়ে আছে। রাজভোগ আর ছানার অমৃতি দিতে বললেন। এরকম মিষ্টি নতুন শহরে পাওয়া অসম্ভব।

বছর ৩৫ বোধহয় বয়েস হবে ছেলেটির।

মিষ্টি আর খাবার পানির গেলাশ দিল টেবিলে। দোকানের পানি অবশ্য খান না কাজী আজিজুর রহমান। কাঁধের ব্যাগ থেকে পানির বোতল বের করে টেবিলে রাখলেন।

কয়েকদিন ধরে আসছেন তো এখানে। একদিন কথায় কথায় নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন কাজী আজিজুর রহমান। কবি নজরুল কলেজের অধ্যাপক।

ছেলেটিই মালিক এই মিষ্টির দোকানের। 'অন্নদা পাল এ্যান্ড গ্র্যান্ড সন্স'-এর।

সোজাসুজিই বলল ছেলেটা, 'স্যার, আর বোধহয় থাকতে পারবো না এখানে।'

'কেন?' একটু অবাক হয়ে গেলেন কাজী আজিজুর রহমান।

'চাঁদা দিতে দিতে হয়রান। এখন দোকানটাই দখল করতে চায়। নারায়ণগঞ্জে আমার দাদার দোকান আছে। আপাতত হয়তো সেখানেই যেতে হবে।'

কী বলবেন কাজী আজিজুর রহমান?

ছেলেটা আর কথা বাড়াল না। মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল তাঁর। রাস্তায় বেরিয়ে, হেঁটে 'বিনোদন' অফিসে যেতে যেতে, আশ্বিনের চমৎকার উজ্জ্বল রোদে বাতাসে মন খারাপ অবশ্য আর থাকল না কাজী আজিজুর রহমানের। তারপর তো একদম কাজে ডুবে গেলেন।

কখন বিকেলের আলো নিভে গেছে, খেয়ালই ছিল না। খেয়াল হলো, যখন জাহাঙ্গীর হোসেন ফিরলেন।

এসেই চায়ের হুকুম দিলেন।

তারপর চা খেতে খেতেই বললেন, 'চলেন, দেরি করা যাবে না। হুমায়ুনের সঙ্গে ঠিক ছ-টায় এ্যাপয়েন্টমেন্ট।'

কম্পিউটারের হাবিব শাহেবকে ডেকে সব বুঝিয়ে দিলেন কাজী আজিজুর রহমান। তারপর জাহাঙ্গীর হোসেনের সঙ্গে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়তে হলো।

বাংলাবাজারের এইসব রাস্তায় গাড়ি রাখা অসম্ভব। খানিক দূর রিকশায় গিয়ে তারপর গাড়িতে উঠতে হলো।

জাহাঙ্গীর হোসেন গাড়িতে উঠে বললেন, 'ধানমণ্ডি। হুমায়ুন আহমেদের চাড়িতে চলো।'

দিন এখন দ্রুত ছোট হয়ে যাচ্ছে। আলো জ্বলে উঠেছে রাস্তায় রাস্তায়।

সারাদিন কাজ করে ক্লান্ত লাগছিল কাজী আজিজুর রহমানের। একই সঙ্গে একটি পরিতৃপ্তি বোধ করছিলেন।

গাড়ি কখনো জ্যামে পড়ছে, কখনো শাঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে—এই করে করে সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে যখন এসে পড়েছে, তখন জাহাঙ্গীর হোসেন বললেন, 'এম্নিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে, গ্রীন রোড হয়ে গেলে দেরি হয়ে যাবে আরো, আপনি এখানে নেমে গেলে অসুবিধা হবে না তো?'

'কোনো অসুবিধে নেই।' বললেন কাজী আজিজুর রহমান, 'রিকশা নিয়ে বা হেঁটে চলে যাব।'

জাহাঙ্গীর হোসেন বললেন, 'কাল সকাল-সকাল আসবেন। বই সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত রোজই কিন্তু আসতে হবে আপনার।'

'আসব। সত্যিকার অর্থে এটাই আমার প্রথম বই। আমার নিজের গরজেই আসব।' বলে নেমে গেলেন কাজী আজিজুর রহমান।

বিদ্যুৎবেগে জাহাঙ্গীর হোসেনের গাড়ি এগিয়ে গেল। কাজী আজিজুর রহমান টের পাচ্ছিলেন, জাহাঙীর হোসেন একটি চাপা উত্তেজনায় ভুগছিলেন সারা রাস্তা।

গ্রীন রোডে তখন রীতিমতো সন্ধ্যা নেমে এসেছে। জমকালো সন্ধ্যা। রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। দোকানে দোকানে আলো। বাড়িতে বাড়িতে আলো। নতুন যে উঁচু উঁচু হাসপাতাল হয়েছে সেগুলো হোটেলের মতো ঝলমল করছে। রাস্তায় রিকশা, বেবি-ট্যাক্সি, টেম্পো, গাড়ি ছুটে চলেছে অবিশ্রাম। ক্রিং ক্রিং প্যাঁ পোঁ চলেছেই।

এটুকু রাস্তা হেঁটেই যাওয়া যাক—ভাবলেন কাজী আজিজুর রহমান। খানিক দূর এগোতেই কাজী আজিজুর রহমান দেখলেন আঁধার ঘনিয়ে আসছে। আর সন্ধ্যা লাগতে-না-লাগতেই পাশের বনবাদাড়ে ঝিঁঝির ডাক শুরু হয়ে গেছে। বাঁদিকে ধানখেতের পর ধানখেত। ডানদিকে ঝুপড়ি ঝুপড়ি গাছ। ভুট্টার খেত। পাশে ছোট্ট একটা কুঁড়েঘর। তারপর অড়হর খেত। বড় বড় আমগাছ কাঁঠালগাছ আরো কত নাম-না-জানা গাছ অন্ধকার করে রেখেছে।

কুলি রোডের রাস্তায় ধুলোয় পা ডেবে যেতে লাগল। গরুর গাড়ি যাওয়া-আসা করে এই রাস্তায়। কাজী আজিজুর রহমানের সারা শরীর ধুলোয় ভেসে যেতে লাগল। পাজামা ধুলোয় ধূসর হয়ে গেল।

কাজী আজিজুর রহমান ভাবল, আজ ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরতে এত দেরি হলো, আম্মা নিশ্চয় রাগ করবেন। এই তো সেদিন, কলেজে যখন পড়তো, সন্ধে করতেই একদিন আম্মা তাকে এক চড় লাগিয়েছিলেন। এখন অবশ্য গায়ে হাত তোলেন না—ইউনিভার্সিটিতে ওঠার পর থেকে—কিন্তু রাগ ঠিকই করেন। আজ বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ফিরতে ফিরতে এত দেরি হয়ে গেল।

'হুক্কা—হুয়া! হুক্কা—হুয়া!' হঠাৎ কাছেই শেয়ালের ডাক শুনে চমকে খানিকটা পিছিয়ে গেল কাজী আজিজুর রহমান।

তারপর দূর থেকে বটগাছটা লক্ষ করে হাঁটতে লাগল আবার। বটগাছটা এত উঁচু যে কুলি রোডে ঢোকার শুরু থেকেই প্রায় গাছটার চূড়া দেখা যায়। মাঝে মাঝে

লাল লাল ফলে ছেয়ে যায় গাছটা। তার পাশেই দু-তিনটে পলাশগাছ। চৈত্র মাসে তাতে একটা পাতা থাকে না, ঝরে যায় সব, শুধু টকটকে রক্তাক্ত ফুলে চারদিক যেন আভাময় হয়ে ওঠে। তখন যেন চেনাই যায় না আলাদা করে।

বটগাছের নিচে এক ফকিরের ঝুপড়ি। ফকির শাহেবকে দেখেছে মাঝে মাঝে কাজী আজিজুর রহমান। তাঁর বয়েস নাকি একশোর ওপরে। সব সময় দেখেছে তাঁকে শাদা কাপড় পরতে। শীতে গ্রীষ্মে নির্বিকার। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে যখন ঝমঝম করে দিনের পর দিন বৃষ্টি হতে থাকে, তখনো ঐ ঝুপড়ির মধ্যে তিনি কাটিয়ে দিচ্ছেন। কী খেয়ে বাঁচেন, কী করেন, কেউ তা জানে না।

ফকিরের ডেরা পেরিয়ে এল কাজী আজিজুর রহমান।

তারপর দুলারা মিয়ার বাড়ি। ছ-ফুট লম্বা দুলারা মিয়া এ পাড়ার সর্দার।

দূর থেকে দোকানটা দেখা যাচ্ছে। হারিকেনের মিটমিটে আলো জ্বলছে। এই দোকানটাই এ রাস্তার একমাত্র দোকান। রাত ন-টায় বন্ধ হয়ে যায়।

তারপর তোয়েব মিয়ার বাড়ি।

তারপর ওদের বাড়ি।

সন্ধে উতরে গেছে সবে। হারিকেন জ্বালা হয়েছে।

আব্বা তো ঘরে। আম্মা বোধহয় রান্নাঘরে।

খোলা বাড়ি। এদিককার বাড়ি যেমন হয়। পাশের জমির সীমানা মাদার গাছের বেড়া দিয়ে।

বারান্দায় উঠতেই শিরিনের সঙ্গে দেখা।

—'আম্মা কোথায় রে?' জিগেস করে আজিজ।

সে-কথার জবাব না দিয়ে শিরিন মুচকি হাসে, 'ভাইয়া, কে এসেছে, জানো?' রহস্যময় গলা শিরিনের।

'কী ব্যাপার? কে এসেছে আবার?' কিছুই বুঝতে না-পেরে অবাক হয়ে যায় আজিজ।

'ডালিয়া।' চোখ নামিয়ে বলে শিরিন।

বুকের ভেতরে একটা ধাক্কা খায় আজিজ।

মুখ ফুটে শুধু বলে, 'ও।'

'যাই। খবর দিই, তুমি এসে গেছ।'

নিরে ছোট্ট ঘরটিতে ঢুকে যায় আজিজ।

আম্মার কী কারণে যেন আজ মেজাজ শরিফ। দেরি হওয়ার জন্যে কিছু বললেন না। শুধু একবার জিগেস করলেন, 'কী ব্যাপার, খোকা, এত দেরি হলো কেন?'

আজকাল নতুন মিথ্যে কথা বলতে শিখেছে খোকা। বলল, 'লাইব্রেরিতে গিয়েছিলাম।'

আর কিছু বললেন না আম্মা। রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন।

মুখ-হাত ধুয়ে চা-টা খেল খোকা।

ডালিয়াকে নিয়ে এল ওরা দুই বোন। নার্গিস, শিরিন। বড় আপা, মেজো আপার বিয়ে হয়ে গেছে। এরা খোকার ছোট। কিন্তু সবাই খুব হাসছে। ডালিয়াও খুব হাসছে। ওদেরই বয়েসী।

'খোকা ভাই, কেমন আছেন?'

কী-যে অপরূপ সুন্দরী হয়ে উঠেছে ডালিয়া দিন-কে-দিন। কয়েক মাস আগে যখন দেখেছিল, তার চেয়ে আজ আরো সুন্দর লাগছে।

লজ্জায় মাথা তুলতে পারে না খোকা।

নার্ভাস হেসে বলে, 'এই তো। তোমার খবর কী?'

কিছু একটা বলতে হয়, তাই বলল খোকা।

শিরিন বলে, 'চলো না, ভাইয়া, বন্যার পানি কতটা বাড়ল সবাই মিলে দেখে আসি।'

শিরিন ভাই-বোনদের সবার ছোট। সব বিষয়ে উৎসাহী। নার্গিসও তার প্রস্তাবে উৎসাহী। বলে, 'চল ভাইয়া, ডালিয়াকে নিয়ে ঘুরে আসি সবাই।'

'কাঠের পোল বোধহয় ভেসে গেছে কবে।' বলল খোকা।

ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠেছে।

ছোট্ট দোকানটির লণ্ঠন জ্বলছে।

ওরা চারজন বেরিয়ে এল। বাড়ির সামনে বাগান। আমগাছ, কাঁঠালগাছ। এসব আছে অনেককাল থেকে। আম্মা শখ করে লাগিয়েছেন কলাগাছ, পেঁপেগাছ, আতাগাছ।

ওরা নেমে এল রাস্তায়। ধুলোর রাস্তা জ্যোৎস্নার আলোয় ঝকমক করছে। আকাশে অজস্র তারা ফুটে আছে। এত পরিষ্কার আকাশ যে, শাদা মেঘ ভেসে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে তাও।

একটা পাখি ডেকে উঠল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে, ছোট দোকানটা পেরিয়ে একটু এগোতেই দেখা গেল, বন্যার থইথই পানি।

শিরিন চেঁচিয়ে উঠল, 'ইশ, পানি এ্যাদ্দুর এসে গেছে!'

এই তো দু-তিন দিন আগে এসেছিল ওরা তিন ভাই-বোন। সকালবেলা। তখন তো পানি এ্যাদ্দুর আসেনি।

দেখা গেল, খালে অনেকগুলো নৌকো বাঁধা। বড় বড় নৌকো। প্রত্যেক বর্ষাকালে, বন্যার সময় এইসব বড় বড় নৌকোয় কাঠ আসে। নৌকোগুলোয় মিটমিটে আলো জ্বলছে। লোকজনের কথাবার্তা শোনা গেল। বন্যার সময় কুলি রোডের এই জায়গার জন্য চেহারা। বেশ-একটা জমজমাট ভাব। অন্যসময় তো কাকপক্ষী নেই। নিথর। কাঠের পোল পেরিয়ে গেলেই মস্ত বাগান। দিনের বেলাতেও অন্ধকার। নির্জন।

নার্গিস আর শিরিন একটু এগিয়ে গেছে।

ইচ্ছা করেই নাকি?—পরে ভেবেছে খোকা।

এখন ডালিয়া অস্ফুটে বলল, 'ইউনিভার্সিটি থেকে গোপীবাগ কত দূর? যেতে পারেন না একবার? একে ধরে ওকে ধরে আসতে হয় আমার।' তারপর একটু হেসে বলল, 'খোকা নাম দিয়েছে ঠিকই। কিচ্ছু বোঝেন না।' তারপরই গলা চড়িয়ে বলল, 'এই নার্গিস-শিরিন, চলো ফিরি এবার।'

জ্যোৎস্নায়-অন্ধকারে মাখামাখি হয়ে আছে কুলি রোড।

দোকানে নির্বিকার আলো জ্বলছে।

কোন্ গাছের ডালপালার ভেতর থেকে একটা রাত-পাখি ডেকে উঠল।

রাত্রিবেলা নার্গিস-শিরিনের সঙ্গে ডালিয়া এক খাটে শুতে গেল।

তার ছোট্ট ঘরে শুয়ে পড়ল খোকা। ঘুম আসছিল না তার। সেই রাত-পাখিটাই কি ডেকে চলেছে জ্যোৎস্নার ভেতরে? খোকা জানে না কেন তার চোখের পানিতে বালিশের কোনা ভিজে যেতে লাগল ॥

[২০০০]

এক অমানুষের গল্প

একরোখা একটা জন্তুর মতো ছুটছিল স্কুটার, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রশিদের মনটাও যেন তিনটে ছোট্ট অতিদ্রুত ঘূর্ণমান চাকায় ভর করে শাঁ-শাঁ করে চলছিল, ভীষণ টাকার দরকার তার, পকেটে এক প্যাকেট জ্বলন্ত অগ্নি, ধানমণ্ডি পেরিয়ে নির্জন রাস্তা বেয়ে জন্তুটা যেন দ্রুত ছুটে চলেছিল, দুদিকে তখন লোকজনের বসতি কমে এসেছে, অনেকটা মফস্বলের মতো এক-একটা মাঠ খেত চষা জমি গাছপালা নির্মীয়মাণ বাড়ি ছবির মতো সরে সরে যাচ্ছিল টাকার চিন্তায়। আহমদ শাহেবকে পাবে কিনা সেই চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। স্কুটারের গতির নেশা ভিতরটা মদের একটা পাত্রের মতো ভরে রেখেছিল, স্কুটারে চড়লেই ছুটে চলার অনুভূতিটা ভরে ওঠে আবেগের বাষ্পে, আর সেই সময়ই—প্রবল ব্রেক কষে থেমে গেল স্কুটারটা।

ছিটকে পড়েছে ঠিক রাস্তার উপরেই। বেঁচে আছে কিনা, কে জানে। কিছু ভাববার আগেই দৌড়ে নেমে এসেছে রশিদ। মেয়েমানুষ? তবু এক মুহূর্ত ইতস্তত করে, এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। মেয়েটি তখন উঠে-বসা থেকে দাঁড়াচ্ছে শাড়ি-কাপড়ের ধুলো-টুলো ঝেড়ে।

রশিদের কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ চাপা থাকেনি—কোথাও লাগেনি তো আপনার?

—না, তেমন কিছু না, পায়ে একটু...

—পায়ে? কোথায়? পায়ের পাতায়? না, গোড়ালির ওপরে?

পায়ের দিকে তাকাতে গিয়ে রশিদের নজরে পড়েছে দামি হাইহিল জুতো : সু-দর্শন কালো স্ট্র্যাপ যেন ফরশা পায়ের পাতা কামড়ে ধরেছে।

স্কুটার ড্রাইভার ততক্ষণে, বোধহয় কিছু হয়নি সেই সাহসেই নেমে এসেছে। বলেছে, মেয়েটির দিকে নয়, রশিদের দিকে তাকিয়ে—'আমার তো দোষ নাই, স্যার।

—থামো তুমি। ধমকে উঠেছে রশিদ : মেয়েটিকে অপ্রতিভভাবে ফের বলেছে,—দেখুন, চোট পান যদি কোথাও, চলুন, ধারে কাছে ডাক্তারখানা আছে নিশ্চয়।

—না, মানে, মেয়েটির ইতস্তত করা দেখে, রশিদ যেন নিজের অজ্ঞাতেই না-বুঝেই স্কুটার চালককে বলে—তুমি বোসো গিয়ে, আমি আসছি।—তারপর মেয়েটিকে জিগেশ করে—আপনি থাকেন কোথায়?

—এই তো, কাছেই, বলে মেয়েটি হাত উঠিয়ে দেখায়।

—তাহলে আর আপনাকে কী বলি... রশিদ ইতস্তত করেছে, কিন্তু ততক্ষণে তার অভিজ্ঞ চোখ মেয়েটির সর্বাঙ্গে ঘুরে এসেছে, কোথায় একটা অন্য-কিছুর গন্ধ শুঁকেছে যেন তার নাক, বলেছে 'কাছেই আপনার বাড়ি বললেন না? কথা খুঁজে না-পেয়ে পুররাবৃত্তি করেছে নিজের কথার।

—হ্যাঁ, মানে, আমি থাকি রাজশাহিতে, ওখানেই আমাদের বাড়ি। আমাদের একটা আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে এসেছি এখানে।

—ও।

মেয়েটি নিজে থেকে কোনো প্রশ্ন করেনি। কিন্তু কেবলি রশিদের চেকশার্ট, বেল্‌বটম ট্রাউজার্স, চোখ-থেকে নামিয়ে ফেলা হাতের গগলস-এর উপরে বারবার গিয়ে পড়েছে তার চোখ। বারবার একরকম মুগ্ধতার মৌমাছির মতো মেয়েটির চোখ গিয়ে বসেছে রশিদের চেকশার্ট, বেল্‌বটম ট্রাউজার্স, গগলস, চকচকে জুতোর উপর—এবং সবশেষ মুগ্ধ দৃষ্টি ফেলেছে সে মুখের উপর।

রশিদের বুদ্ধি বুঝি হঠাৎ খুলে গেছে, একটু ইতস্তত দ্রুততার ভঙ্গি করে বলেছে—'আমি এখন তো একটা জরুরি কাজে যাচ্ছি, এক কাজ করুন না, কাল আসুন স্টেডিয়ামের সামনে, আমি থাকব—

—কটার সময়?

—কটার সময় হলে সুবিধা হবে আপনার?

—এই ধরুন দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে?

—ঠিক আছে।

রশিদ আর-একবার যাবার কথা বলে স্কুটারে গিয়ে ওঠে। মেয়েটি হাসিমুখে, যেন পায়ের কথা একদম ভুলে গিয়ে, বিদায় দ্যায় ওকে।

—প্রস। স্কুটার-ড্রাইভার ঝুঁকে গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে বলে ওঠে—মাল-পানি কিছু গেল নাকি স্যার?

নিজের ধারণা একেবারে লুকিয়ে সাধু সেজে বলে রশিদ—'আরে, কী বলো তুমি? ভদ্রলোকের মেয়ে না?

নির্জন রাস্তায় গাড়ি চালাতে চালাতে ড্রাইভার বলে—'ভদ্রলোকের মাইয়া না, তা তো কই নাই, স্যার। ভদ্রলোকের মাইয়ারাই তো আহে এই লাইনে। কিন্তু মাইয়া বোধ হয় নিউ আমদানি। বেবি টেক্সির সামনে কিভাবে পড়ল, দেখলেন না? আমি বেবি ট্যাক্সি কই চালাই, হে কই পড়ে।' বলে নিজের রসিকতায় নিজে বুঝি হেসেই ওঠে ড্রাইভার।

রশিদের মাথায় অর্থচিন্তা ঘুরে এলেও, এখন তার মনে হয়, এটা কি আর খেয়াল করেনি সে? সেজন্যেই ধমকে ওঠে—রাখো ওসব কথা। চালাও তুমি।' মেয়েটির সঙ্গে কাল দেখা হবে, স্কুটার ড্রাইভার টের পায়নি, বুদ্ধি করে সরিয়ে দিয়েছিল আগেই,—ভেবে তৃপ্তিপ্রসাদ অনুভব করে রশিদ।

২

প্রথমে দেখে তো চিনতেই পারেনি। মোরোগফুলের মতো টকটকে লাল শাড়ি, মোরোগফুলের মতো জ্বলজ্বল লাল ব্লাউজ, মোরগের ঝুঁটির মতো কেশ, কাঁধে ঝোলানো চমৎকার ভ্যানিটি ব্যাগ।

চিনল এদিক-ওদিক তাকানোর ধরন দেখে—গো-গো গগলসের ভিতর থেকে কালো চোখে সন্ধিৎসা জ্বালিয়ে খোঁজার ধরন দেখে। ঝলমলে সিগারেটের দোকানের সামনে স্টার সিগারেট টানছিল রশিদ রাজকীয় ভঙ্গিতে। ওকে দেখে এগিয়ে গেল—এসেছেন তাহলে? এমন ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল যেন এতক্ষণ প্রতীক্ষার একটা দীর্ঘ দড়ি ভিতরে ভিতরে ধিকিধিকি জ্বলছিল না, যেন বারবার মনে হয়নি, যে, মেয়েটি না-ও আসতে পারে। হঠাৎ এক ঝলক দেখা, সে যা ভাবছে তা না-ও হতে পারে, তার ভুল হতে পারে। কিংবা, ভুল না-হলেও মেয়েটি চলে যেতে পারে অন্য আয়তনে অন্যখানে অন্য কোথাও।

রশিদের কথা শুনে, কোনো জবাব না-দিয়ে, মেয়েটি মিষ্টি হাসল কেবল। যেন তার উপস্থিতির জবাব আছে রক্তিম শাড়ি-কাপড়ে, উজ্জ্বল ঝকঝকে হাসিতে, চলার ছন্দময় ভঙ্গিতে।

কিন্তু না, রশিদের অপ্রতিভ হওয়ার কোনো কারণ নেই। তারও কাপড়-চোপড় আধুনিকতম : শরীর খামচে-ধরা শার্ট, এরকম খামচে-ধরা যে দুই বোতামের মাঝখানে মাঝখানে গা দেখা যাচ্ছে, রোমশ বুক-পেট, কেননা গেঞ্জি নেই ভিতরে; ডবল নেটের সবুজরঙা ট্রাউজার, সোয়েডের খয়েরি রঙের জুতো।

এদিক থেকে ওদিক থেকে দৃষ্টি এসে পড়ছে মেয়েটার উপর ওদের উপর। এলোমেলো হাওয়া-লাগা বৃষ্টির মতো দৃষ্টি। একটা বিরাট চাকার গায়ে অগুনতি পিঁপড়ের মতো স্টেডিয়ামের বারান্দা দিয়ে লোকজন চলাফেরা করছে। চাকার গায়ে কি আগুন লেগেছে?—লোকজনের চলাফেরার ধরন দেখে তাই মনে হয় : যেন সবাই পালাচ্ছে। পালানোর আগে যেন যতদূর সাধ্য দীর্ঘ দৃষ্টিপাতে দেখে নিচ্ছে এক তরুণ যুগলকে। প্রণয়ী ধরে নিচ্ছে নিশ্চয়। সুবেশ-সুবেশিনী প্রণয়ীযুগল—হয়তো ভিতরে ভিতরে ঈর্ষা-হিংসায় জ্বলেপুড়েও মরছে কেউ কেউ। আ, গল্প-উপন্যাস আর সত্যিকার জীবনে কত আলাদা!

—চলুন, কোথাও গিয়ে বসি। আইসক্রীম খাবেন? চলুন, ঈগলুতে যাই। রশিদ প্রস্তাব করে।

অসম্মতির কোনো কারণ নেই। রিকশা ডেকে উঠে পড়ে তারপর।

খররৌদ্র-জ্বলা মরুভূমি থেকে ওরা যেন একটা তরুছায়াময় ওয়েসিসের মধ্যে চলে আসে। আইসক্রীমের দোকানের ভিতরে গিয়ে বসে ওরা। আবার কিছু দৃষ্টি-বৃষ্টি।

—আমার নাম রশিদ। আপনার নামটাই কিন্তু জানা হয়নি। সোফায় ডুবে গিয়ে রশিদ বলে।

—সাবিহা। সাবিহা বলে সবাই আমাকে ডাকে।

—ও। তা কোথায় যেন বাড়ি বলছিলেন?

—খুলনা। খুলনা থেকে বেড়াতে এসেছি এক আত্মীয়ের বাড়ি।

মুখে কিছু বলে না রশিদ, কিন্তু ভেতরে ভ্রু কুঞ্চিত হয় তার। খুলনা? সেদিন কি বলছিল খুলনায় বাড়ি?

—পড়ালেখা করেন বোধ হয়?

—হ্যাঁ, এইচ. এস. সি. পরীক্ষা দিয়ে এসেছি।

এইচ. এস. সি. পরীক্ষা কবে হলো? সে ওসব খোঁজ রাখে না অবশ্য। হতে পারে। আজকাল নাকি বছরে দুবার করে পরীক্ষা হচ্ছে। সেদিন কে বলছিল : কলেজ গার্ল। ভিতরে একটু উত্তেজিত হয় রশিদ। আজকাল অবশ্য নেহাৎ বাচ্চা-বাচ্চা মেয়েরাই কলেজে পড়ে। কী বলে, ভালো করে বুক-টুকু ওঠেনি, এই এতটুকু-টুকু মেয়ে, আশ্চর্য লাগে, এক-একটা মেয়ে এত ছোট, যে কলেজে পড়ে বিশ্বাসই হয় না। বকশিবাজার থেকে, ইডেন থেকে সে কি দ্যাখেনি ঐ সব ছোট ছোট মেয়েদের বেরোতে? তুলনায়, সাবিহা-মেয়েটি রীতিমতো ধিঙ্গি। তা, মফস্বলে হয়তো একটু বেশি বয়সে পড়ে। কিংবা হয়তো কারো কারো একটু বেশি বয়েস হয়ে যায়। কিংবা কারো কারো শরীরই থাকে বাড়ন্ত।

গোল্ডফ্লেকের প্যাকেট খুলে ফশ করে সিগারেট জ্বালায় রশিদ—কিছু যদি মনে না করেন, আপনার ফাদার-মাদার আছে তো?

—হ্যাঁ, আব্বা বিজনেসম্যান। খুলনায় দোতলা-বাড়ি আছে আমাদের।

এটা কি আমি জানতে চেয়েছিলাম?—ও।

—ছুটিতে ঢাকা দেখতে এসেছি। তা আপনি কি করেন, বললেন না তো?

—আমি? আমি ওসব পড়ালেখা কবেই ছেড়ে দিয়েছি। ব্যবসা করি টুকটাক।

—কিসের ব্যবসা?

—এই আর কি—কাজ যা—এমন কিছু না—ছোটখাট—

সাবিহার আইসক্রীম খাওয়া শেষ হলো।

—ঢাকায় আছেন কিছুদিন? জিগেশ করল রশিদ।

—হ্যাঁ। পরীক্ষার পরে এখন তো কয়েক মাস ছুটি।

কথার ফাঁকে ফাঁকে দেখছে রশিদ। ফাইন মাল! ফাসকেলাস। আর কায়দাও জানে বেশ সাজগোজের। আঁচল সরে গেছে। দীঘল তরুণ ডাঁটের উপর ফুটে উঠেছে জ্বলজ্বলে মোরোগের ফুল।

—সিনেমা দেখবেন?

—সিনেমা?—হ্যাঁ—না, না, না—কাজ আছে আমার, যেতে হবে এখনি। বলে সাবিহা ভ্যানিটিব্যাগ খুলে হাঁটতে লাগল। তারপর বলে উঠল—এয্যা—

—কি হলো?

—না, তেমন কিছু না—

—বলুন না, যদি অসুবিধে না-থাকে, যদি আমাকে একেবারে পর মনে না করেন? প্রেমের একটু রস লাগাল রশিদ, খুশি নিজের বাচনে।

—আ, মানে আমি টাকা আনতে ভুলে গেছি—এক জায়গায় যেতে হবে।

—ও। ও কিছু না—রশিদ যেন ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল সাবিহার অতিতুচ্ছ টাকার ভাবনা। মুহূর্তে পকেট থেকে বের করে আনল মানিব্যাগ। কত টাকা লাগবে, বলুন?'

—না, না, বেশি না। কী-যে ভুল হলো—গোটা ত্রিশেক টাকা হলেই চলবে।

তিনটে ঝকঝকে দশ টাকার নোট হালকা কোমল পাখির মতো নেচে উঠল রশিদের আঙুলে।

টাকাটা নেবার সময় সাবিহা কি ইচ্ছে করে ধরে থাকল এক মুহূর্ত রশিদের আঙুল?

ফেরত-পাওয়া তিনটে টাকাই বকশিশ করল রশিদ—দেখল সাবিহা। গোল্ড-ফ্লেক জ্বলল আবার। ওঠবার সময় রশিদের পিঠে কি মোরোগফুলের চূড়ার মৃদু স্পর্শ লাগল?

বাইরে যখন এল, তখন হলকা ছুটছে। সাবিহার লাল শাড়ি আবার জ্বলে উঠল আগুনের শিখার মতো। আইসক্রীমের দোকান থেকে বেরোবার সময় যেন আগুনের একটা ঝাপটা লাগল চোখে-মুখে। তুষারের দেশ থেকে হঠাৎ একেবারে দারুণ গ্রীষ্মমণ্ডলে এসে পড়েছে ওরা।

—এখনই যাবে?

—হুঁ, খুব জরুরি দরকার।

—স্কুটার ডেকে দিই—অতি মধুর গলায় বলল রশিদ।

—সামনে শুক্রবার—বলাকার সামনে আসুন—আমি থাকব—নটা থেকে দশটার মধ্যে—দেরি করবেন না কিন্তু—

স্কুটার ডাকতে হলো না—ওদের দেখে নিজেই এসে দাঁড়াল। শালা, দ্যাখো ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলেও ওদের দেখা নেই, এখন, শালার মেয়েমানুষ দেখে, ঠিক হামলে পড়েছে।

নিশানের মতো লাল আঁচল উড়িয়ে, শরীরে চমৎকার দোলা লাগিয়ে, স্কুটারে উঠে বসল সাবিহা। নিজেই বলল আপনি আসবেন কিন্তু—আমি ঠিক দশটার মধ্যে আসছি বলাকার সামনে—

শা-লি! তোমাকে আমি চিনি নাই, ভাবছ? প্যান্টের বাঁ দিকের পকেট থেকে স্টার সিগারেট বের করে দুপুরের গনগনে রোদে তোপখানা রোড ধরে মতিঝিলের দিকে রওনা দিল রশিদ। এক ব্যাঙ্কের ম্যানেজার একটি দুর্দান্ত মার্কিন পর্নো-পত্রিকা তাকে দেবে বলেছে। যদি পাওয়া যায়, দামি কাস্টমার আছে হাতে। এতগুলো টাকা বেরিয়ে গেল! শা-লা!

৩

সাবিহাকে দেখে দূর থেকেই এক গাল হাসল রশিদ। কাছে এসে বলল—সিনেমা দেখবেন তো চলেন, শিগগির! যা ভিড়! পরে আর টিকিট পাওয়া যাবে না।'

সাবিহাকে অসম্ভব নিকট মনে হচ্ছিল। আশ্চর্য, রশিদের ভিতরে একটি ছলছলানি বয়ে গেল : 'মায়া লাগল বড্ড' যেন মনে মনে উচ্চারণ করল রশিদ। আর তখনই, তার ভিতরে সিদ্ধান্ত জন্ম নিল—'একটু দাঁড়ান' বলে ভিড়-টিড় পেরিয়ে টিকেটের লাইনে গিয়ে দাঁড়াল। যেন সাবিহার বিমর্ষ ভাব কাটাবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সে।

সেদিন সারাদিন সাবিহার সঙ্গে কাটল রশিদের। সিনেমা দেখল খেল রেস্তোরাঁয়। তারপর শতশত দৃষ্টিতীরের ভিতরে থেকে হাঁটতে লাগল দুজন—বায়তুল মোকাররম, স্টেডিয়াম, রমনা ভবন চষে ফেলল।

হাঁটতে হাটতে সাবিহা বলল—জানেন, মানুষ যে কী বদমাশ হয়! আমাকে সিনেমায় নামাবে বলে যশোর থেকে নিয়ে এল। রমা-রমা করে কত খোশমোদ তখন—আর এখন—

রশিদ বলল—কার কথা বলছেন আপনি?'

—ও—না। বলছিলাম কী, টাকা-পয়সা কিছু আছে নাকি আপনার কাছে? সবরকম শাড়িই আছে আমার, কিন্তু ঢাকায় এসে দেখলাম নতুন দু-একটা শাড়ি উঠেছে, আর একজোড়া জুতো খুব পছন্দ হয়েছে আমার, এলিফ্যান্ট রোডে দেখলাম—

চলুন না, চলুন— গোল্ডফ্লেকের প্যাকেটের ভিতর থেকে স্টার সিগারেট ধরিয়ে বলল রশিদ। 'চলুন না, আমি থাকতে কোনো ভাবনা নেই। আপনার তো দরকার নেই, আপনার শখ, শখ দরকারের চেয়ে বড়—

সারা শহর ঘুরে শাড়ি কেনা হলো, পছন্দের জুতো কেনা হলো—অবশ্য দেখা গেল কোনোটাই ঠিক আগে পছন্দ করে রাখা হয়নি, সবই নতুন করে দেখে-শুনে কেনা হলো।

এন্তার খরচ করল রশিদ। শুধু স্কুটারে ওঠার সময়, সন্ধেবেলা, নিজেও উঠে বসল সাবিহার পাশে।—চলুন, আপনার বাসাটা চিনে আসি, রশিদের এই প্রস্তাবে যেন আঁৎকে উঠল সাবিহা। এতগুলো টাকা গচ্চা গেল, তোমার বাসাটা চিনে নিই। কিন্তু বাইরে সে ভাব নেই, বাইরের রশিদ দরাজ দিল—বে-পরোয়া।

সাবিহা যেন আঁৎকে উঠল, সাবিহার চোখ-মুখ থেকে ভয় যায় না।—আজ থাক, একটু অসুবিধা আছে—বারবার বলতে লাগল সাবিহা।

—থাক, উদারভাবে বলল রশিদ—কোনো দরকার নেই। যাওয়া যাবে আর একদিন। মনে মনে বলল—হারামজাদি, তুমি না যাও—আমার এতগুলো টাকা—অতি কষ্টের পয়সা—স্কুটার থেকে বড় রাস্তার উপরেই নেমে পড়ল রশিদ। সাবিহা একটুকু পথ হেঁটে যাবে : এখান থেকে ফিরে যাবে রশিদ।

৪

—জানেন, আমার বাবা খুব গরিব, সাবিহা বলছিল।

পার্কের ঘাসের উপর বসে ওরা। দুপুর চলে যাচ্ছে। এখনও ভিড় হতে শুরু করেনি। গাছের ছায়া সবে লম্বা হতে শুরু করেছে।

—হু, কিন্তু ওসব বলে লাভ নেই। ওসব শুনে মন খারাপ হয়ে যায় আমার।

—জানেন আমার মাকে নষ্ট করেছে কে?

অনেকক্ষণ ওরা চুপ করে বসে থাকে। আশ্চর্য, এই শহরের বুকের ভিতর থেকে কোথায় কোকিল ডাকছে। বুকের মধ্যে এসে লাগে।

আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা বলি। আপনার আপত্তি থাকলে বলবেন।

—কী, ছবি? কেন? ও তো অনেক হলো। এখন মনে হচ্ছে, সিনেমায় চান্স আমি কোনোদিন পাব না। খামোখা—

—না, আমি অন্য ছবির কথা বলছি। নেকেড্। এ্যাকশন ফটো। এমন কিছু না। আমার নিজস্ব ব্যাপার। কেউ জানছে না— প্যান্টের হিপ-পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করে সাবিহার হাতে দ্যায় রশিদ—এইরকম।

৫

রোববারের বিকেল।

সমস্ত শহর রূপকথার পুরীর মতো নিঝঝুম পড়ে আছে। জনশূন্য রাস্তাগুলো দীর্ঘ আর বিশাল হয়ে গেছে, সারিসারি বন্ধ দোকানপাট, নির্জন অফিসবাড়ি, হঠাৎ হঠাৎ খোলা একটা ডিসপেনসারি, কি-একটা পান-সিগারেটের দোকান, কি প্রায় অবিশ্বাস্য ভিড়ে রেস্তোঁরা কলকাকলি আর গান-বাজনায় উজ্জ্বল ঝলমল করছে। সারা সপ্তা তুলকালাম ছুটোছুটির পর ক্লান্ত হয়ে গিয়ে সমস্ত শহর যেন ঘুমোচ্ছে, কিংবা যেন এক রতিক্লান্তা নারী সারারাত্রি জাগরণের পর এখন অবসাদে নিদ্রায় শ্রান্তিতে ধ্বস্ত। বাতাস, বিকেল—এই সমস্ত যেন আজ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে। ছুটির অলস মন্থর অকর্মণ্য হাওয়া মেখে চকিতে কোনো গাড়ি ছুটে যাচ্ছে, কিংবা চলেছে কোনো রিকশা, অথবা মানুষজন হেঁটে যাচ্ছে ফুটপাতে।

'স্টুডিও মন্তাজ'-এর সামনের ফুটপাতে একটু অধৈর্যভাবেই উত্তেজিত পায়চারি করছিল রশিদ। সাবিহা শেষ-পর্যন্ত আসবে তো? নাকি আসবে না? মেয়েটার পিছনে অনেক টাকা ঢেলেছে সে, হুইলের সুতো অনেকদূর অবধি ছেড়েছে, এখন সুতো গোটানোর পালা। চালে ভুল হয়নি তো তার? কিংবা সে কি প্রথম থেকেই চাল চালছে? তা তো নয়। ভাগ্য! কপাল! কপালগুণেই মেয়েটিকে পেয়ে গেছে সে। আরে শালা, এ প্রায় সিনেমার মতো ব্যাপার। কিন্তু নাঃ, জীবন আর সিনেমা আলাদা। সাবিহার প্রতি এক ফোঁটা প্রেমের তাড়না অনুভব করেনি রশিদ। বরং পদে পদে মনে হয়েছে তার : বাহ, চমৎকার খেলুড়ে-মেয়ে। ভালো, টাকা চাই?—নাও, কিন্তু আমার ফাঁদে পা দিতে হবে একদিন। আমি তো তোমাকে চিনি—পদে পদে। কেননা, আমিও যে তাই। বিবিসাব! ডালমে কুছ কালা হ্যায় : তুমি তো একদিনও যেতে বলনি তোমার বাসায়। বড় রাস্তায় থেমেছ, তুমি সেখান থেকে বিদায় দিয়েছ, তোমার বাড়িটা একদিনও চিনিয়ে দাওনি। হয়তো তোমার আগাগোড়া কাহিনীই বানানো। হয়তো তোমার নামও সাবিহা না—অন্য কিছু, সফুরা বা ঐ জাতীয় কোনো কিছু, পুরোনো, সেকেলে, গ্রাম্য। আর আমি, আমার

নামও কি রশিদ, আবদুর রশিদ? হুঁ, নিজের প্রতি ব্যঙ্গাত্মক হাসে রশিদ—আমরা দু'জন এক কিসিমের, এক লাইনের।

স্টুডিও-র মালিক মাহবুব কাউন্টারে বসে বসে রশিদের ছটফটানি দ্যাখে—ঠিক এক জায়গায় থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, দ্যাখে—রশিদের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসে, বলে—কি ওস্তাদ পাখি উড়ে গেল নাকি?

—আরে না, না, গম্ভীর হয়ে যায় রশিদ—আসবে—আসবে।

রশিদ যে-যুবকটিকে এনে বসিয়ে রেখেছে, তার কোনো চাঞ্চল্য নেই। সে ওদের কথা শুনে নিঃশব্দ হাসে।

—সিগারেট খান, মাহবুব প্যাকেট খুলে দ্যায়।

রশিদ প্রাণপণে সিগারেট টানে। ফুটপাতে ফের গিয়ে দাঁড়াতেই তার বুকের ভিতর ধক্ করে ওঠে। কিন্তু এক মুখে ফোঁটা ভাবান্তর দেখা যায় না।

খুট্‌খুট্ করে ফুটপাতে হাইহিলের শব্দ তুলে আসছে। সেই মোরোগফুলের অগ্নিউচ্ছ্বাসের মতো লাল শাড়িটি পরে আছে—কিন্তু এখন যেন একটু মলিন লাগছে, নিবন্ত মুমূর্ষু আগুনের মতো। ঠোঁটে লাল লিপস্টিক আছে—কিন্তু কিরকম ফ্যাকাশে যেন তার রঙ। বিকেলের রাস্তায় এখন কিছু লোক যাতায়াত করছে যেন। সাবিহার প্রশস্ত পিছন, ভরা কলসির মতো পিছন দুলিয়ে হাঁটা রাস্তার লোকেরা দু'চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছে যেন। নাঃ, ভুল হয়নি রশিদের। ফিগার কিরে শালা! ফিগার দেখলেই হয়ে আসে। নাহ, চালে ভুল হয়নি আমার, চালে ভুল হয় না রশিদের।

সাবিহা কাছে আসতে মনের ভাব সম্পূর্ণ লুকিয়ে রশিদ একটু-বিরক্ত-একটু-বিস্ময় মেশানো গলায় বলল—কী, স্কুটারে এলেন না কেন? কাল যাবার সময়ে আলাদা করে দশটা টাকা দিয়ে দিয়েছিল সাবিহাকে স্কুটারে আসার জন্যে।

বাসে আসাই সুবিধে—ওখান থেকে তো বাস ছাড়ে—বেশ ভালোভাবেই বসে আসা যায়—বলতে বলতে সাবিহা স্টুডিওর সামনে এসে পড়ে।

মাহবুব নার্ভাস হয়ে গিয় সট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে, যন্ত্রচালিতের মতো হাত উঠে আসে তার কপালে, অস্ফুটে বলে—সালাম। পরক্ষণে আরো নার্ভাস হয়ে গিয়ে বোকার মতো হাসে!

রশিদের সঙ্গে-আসা ছেলেটি চুপ করে বসেই থাকে, তার গালের পেশী একটুও নড়ে না।

সাবিহার সঙ্গে দুজনেরই পরিচয় করিয়ে দ্যায় রশিদ এবং একটু দেরি না-করে রশিদ সাবিহাকে বলে ভিতরে যেতে। মাহবুব নিজে দরোজা খুলে দ্যায়, রশিদ বলে—আপনি যান আগে, বলে মাহবুবকে একরকম জোর করেই ঢুকিয়ে দ্যায়। মাহবুব অবাক, নার্ভাসবোধ করে, এবং খুশি। রশিদ পিছন থেকে 'দেরি করবেন না যেন' বলে দরোজা বন্ধ করে দ্যায়।

রশিদ এসে বসে মাহবুবের জায়গায়। মাহবুব, তার বন্ধু, এই স্টুডিওর মালিক। রশিদ এর আগেও এই উদ্দেশে এই স্টুডিওটি ব্যবহার করেছে। স্টুডিওটি ভালো।

মাহবুব সব সময়ই ছুটির দিনে বেছে নেয়। তার কথা হচ্ছে : তোমরা যা ইচ্ছে করো, আমাকে একবার ব্যবহার করতে দিতে হবে। রশিদের নিজস্ব ক্যামেরা-ট্যামেরা নেই; কিন্তু বন্ধুবান্ধব যতক্ষণ আছে, চিন্তাও নেই। নিজস্ব কিছু নেই তার, অন্যদের জিনিশেই চালিয়ে দ্যায়।

মাহবুব সিগারেটের প্যাকেটটা গুঁজে দিয়েছিল রশিদের হাতে। রশিদ এখন তৃপ্ত, হয়তো-বা ভিতরে একটু উত্তেজিত, তরিবৎ করে একটা সিগারেট ধরায়। ইচ্ছা করে বেপরোয়াভাবে হাসে শব্দ না-করে শহিদের দিকে তাকিয়ে। বলে—শালা, দ্যাখ, পাগলা কুত্তা হইয়া আছিল—যা, ভিতরে খেল দেইখা আয়—

শহিদ, চোখ বুজে, সামান্যতম ঘাড় কাৎ করে অস্ফুটে বলে—না।

রশিদ বলে ওঠে—তুই শালা একটি পাথর—

তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় রশিদ। বড় রাস্তার উপরে স্টুডিও, কোত্থেকে কে দেখে ফ্যালে, অত হাসাহাসি দরকার নেই। বাবা, এইসব মেয়েকে কত কেউ 'ফলো' করতে পারে। স্টুডিও-র মধ্যে ঢুকেছে, ছবি তুলতে এসেছে—আর কোনো কিছু না, বাবা। তবু কোত্থেকে কি হয়, কে জানে। সাবধানের মার নেই। একেবারে ঝাঁপ-টাপ ফেলে দিতে ভয় লাগে। তাই ওরা থাকে বাইরে। হঠাৎ খদ্দের-টদ্দেরও আসতে পারে কেউ।

তারপরে আর কথা জমে না। কিংবা সারাক্ষণ ওদের মন পর্যন্ত থাকে ভিতরে, সুতরাং কথা চালচালি হয় না আর। তবে বেশিক্ষণ বসে থাকতে হয় না। দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসে মাহবুব। রশিদ খুব খুশি হয়। শালা ফোকোটে যে ঘণ্টাখানেক চালিয়ে দ্যায়নি, তাই যথেষ্ট। চোখ টিপে নামিয়ে, বলে—কী, আউট?

মাহবুব লজ্জার হাসি হাসে—শালি এক নম্বরের মাল।

একবার রাস্তার দিকে চেয়ে কেউ লক্ষ্য করছে কিনা দেখে নিয়ে সপ্রতিভ ভঙ্গিতে চোখের ইশারায় শহিদকে আসতে বলে দ্রুত দরোজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ে রশিদ।

টুলের উপর বসে আছে সাবিহা, কালো একটা সায়া আর ব্লাউজটা শুধু পরা। শাড়ি কার্পেটে লুটোচ্ছে।

সবগুলো উজ্জ্বল আলো ফটফট করে জ্বেলে দিল রশিদ। ক্যামেরা আগেই ঠিক করে রেখেছিল। শহিদকে জামা-কাপড় খোলার ইশারা করে সাবিহাকে বলল চোখের দিকে তাকিয়ে—খুলে ফেলুন ও-সব।

তারপর ক্লিক...ক্লিক। মাঝে মাঝে নির্দেশ দিচ্ছে। একের পর এক। অনেক ভঙ্গিতে। স্বাভাবিক ও অস্বভাবী, উদ্ভট বেয়াড়া আসনে। সবরকম ক্রেতার দিকে নজর রাখতে হয় তো তার। সে যখন ব্যবসাতে নেমেছে।

দ্রুত অনেকগুলো ছবি তুলল রশিদ। কিন্তু আশ্চর্য নিরাসক্তিতে। শুধু মনে মনে প্রশংসা করল : সত্যি, ফিগার বটে মেয়েটার। দারুণ বুক, দারুণ পাছা। শেষ হয়ে যেতে শহিদকে ইঙ্গিত করল। ফটাফট করে উজ্জ্বল আলোগুলো যতক্ষণে নিবল, ততক্ষণে শহিদও উঠে পড়েছে।

সাবিহা, আমূল নগ্ন, চিৎশায়িত, চোখ খুলে দেখল রশিদকে। হাত নাড়িয়ে মেঝেয় শুয়ে শুয়েই ডাকল রশিদকে 'এসো, তুমি।' এই প্রথম সাবিহা রশিদকে 'তুমি' বলে ডাকল।

রশিদ বলল, 'না।'

পলকে উঠে বসল সাবিহা—তুমি এসো এবার।

শহিদ ওদিকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করে নিচ্ছে। রশিদ বলল—না, আমি না।

সাবিহা রশিদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর উঠে কাপড় পরতে লাগল।

রশিদ পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকার একখানা নোট বের করে ওর হাতে দিয়ে বলল—রাখো এটা, ঠিকঠাক হয়ে বাইরে এসো। এই প্রথম রশিদ সাবিহাকে 'তুমি' বলল।

সাবিহা বাইরে এলে, রশিদ বলল—স্কুটার ডেকে দেবো নাকি বাসেই যাবে?

শহিদ চলে গিয়েছিল।

বাইরে ততক্ষণে সন্ধে নেমে এসেছে।

শাড়ি-কাপড়-পরা সাবিহাকে দেখে মাহবুবের মনে হলো যে, সুদূর ও অচেনা মেয়েকে জীবনে সে এই প্রথম দেখছে। সে আবার নার্ভাস হয়ে গেল। বোকার মতো হেসে জড়িত গলায় বলল—আসবে আবার! সাবিহা কোনো জবাব দিল না।

রশিদ বেরিয়ে এল রাস্তায়—চলো, তোমাকে বাসে উঠিয়ে দেই।

সাবিহা রশিদের দিকে একবারও তাকাচ্ছে না। তার মুখ-চোখ সব লাল, নাকের ডগা, কানের পাতা লাল ও গরম হয়ে আছে।

অন্ধকারের পটভূমিকায় রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। ওরা হেঁটে চলেছে ফুটপাত ধরে।

সাবিহা দাঁড়িয়ে পড়ল, ঐখানে বাসস্ট্যান্ড। বলল—ঠিক আছে, আর যেতে হবে না। বলল, কিন্তু তাকাল না।

সিগারেটের বিজ্ঞাপনের স্থির লাল-সবুজ আলো জ্বলছে, ওরা সেই আলোয় দাঁড়িয়ে। ওদিকে ডি-আই-টি-র চূড়া। আলোকিত ঘড়িটি কি চলছে? পরে কবে দেখা হবে সব সময় ঠিক হয়ে যায় ওদের। ওরা তো কেউ কারো বাড়ি চেনে না। সে-সব পরবর্তী সাক্ষাৎকার আজ আর নির্ধারিত হলো না। এখন কয়েকটি মুহূর্ত মুখোমুখি ওরা শব্দহীন দাঁড়িয়ে। লাল-সবুজ নিয়ন-আলো ওদের উপরে এসে পড়ে ওদের মুখাবয়বকে যেন কোন অচেনা বিদেশি সুদূর এক ভাস্কর্যের অংশ করে তুলেছিল ॥

[১৯৭৭]

চোখ

১

কে এই রমণী? —নর্তকী, বাররামা, বিদুষী। নগরীর সমস্ত পুরুষ অগ্নিলুব্ধ পতঙ্গের মতো ধাবমান। রাজপুরুষেরা, বাগ্মী, কবি, চিত্রকর, ভাস্কর ও দার্শনিকেরা। গৃহবধূ ও প্রণয়িনীরা হয়ে উঠেছে শঙ্কিত, এমনকি অন্য বাররামরাও।

গোধূলি সমাগত হতে-না-হতে চঞ্চলার গৃহে পুরুষেরা সমবেত হতে থাকে। সকলেই তার প্রণয়প্রার্থী, সকলেই তার কৃপাভিখারী। আর চঞ্চলার জন্মগ্রহণ গ্রামে হলেও নগরীতে যখন সে নীত হয়েছে তখন তাকে মনে হয় এক আশ্চর্য মৃণালে উদ্যত পঙ্কজের মতো। তার মুখের মণ্ডলে যেন বিলুপ্ত কোনো প্রাচীন নগরীর কারুকার্য খচিত; তার কেশদাম যেন নিশীথের অন্ধকারের দ্বারা রচিত; গাত্রবর্ণ কনকাভ : দেহ দীঘল ও তন্বী; স্তন নিটোল, পরিপূর্ণ ও কোমল-কঠিন দুটি ফলের মতো; শ্রোণী নিবিড়, পরিপূর্ণ ও কোমল-কঠিন দুটি ফলের মতো; করাঙ্গুলি সদ্যজাত অগ্নিশিখ পর্বতের মতো; পদাঙ্গুলি রক্তশিখ সদ্যজাত পল্লবের মতো। চঞ্চলা এক শরীরিণী রমণী; কিন্তু শরীরসর্বস্বা নয়—তার হাস্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মেধার দ্যুতি; হয়তো গভীর নয় কিন্তু চারু তার বাচনভঙ্গি; কবিতা ও ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও দর্শন-সমেত সব বিষয় সম্পর্কেই আছে তার প্রাথমিক জ্ঞান। সেজন্যে তার সঙ্গে আলাপের আবহ থাকে সচ্ছল বাতাসের মতো। আর সে, বাররামা, জানে বাক্যের সঙ্গে কি করে মেশাতে হয় কটাক্ষ, হর্ষের উদ্বেলতার সঙ্গে কি করে সংগত হয় নিতম্বের হিল্লোল। তার শরীর যেন একটি সংগীত; যেন একটি সোনালি পানপাত্রের উত্থাপন; আর তার রতিকুশলতা বাদ্য-যন্ত্রে মৃদু-সমতল-তীব্র-অতিতীব্র এইমতো ক্রমোচ্চলীলা সুদক্ষ করাঙ্গুলির।

চঞ্চলা একটু স্বতন্ত্র। সাধারণ স্নানাগারে সে কখনো যায় না, কেমন যেন তার রুচি হয় না সাধারণ্যে নগ্ন হতে। চঞ্চলার খ্যাতি ও পুরুষমহলে প্রতিপত্তি ও আকর্ষণ হয়তো এত বেশি এজন্য যে বাররমণী হলেও তাকে সাধারণ্যে নগ্ন দেখা যায় না। বছরে একবারই, নগরীর বাৎসরিক উৎসবে মন্দিরে প্রণতি সমাপন করে সে আমূল নগ্ন হয়ে সমুদ্রে স্নান করতে যায়। বৎসরে ঐ একবারই তাকে নগরবাসী নগ্ন দেখতে পায়। কিন্তু উৎসবের উন্মাদনায় সবাই এত ব্যস্ত থাকে তখন যে, নগ্নিকা চঞ্চলার দিকে আলাদা দৃষ্টিপাতের অবসর থাকে না কারো। কেবল হাজার

হাজার নরনারীর ভিতরে লুকিয়ে এক রাজপুরুষ পৃথিবীর তীব্রতম ক্ষুধা নিয়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। রাজপুরুষ চঞ্চলার এক প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক। গত তিন বছরে সে এই উৎসবের দিনটিতে চঞ্চলাকে দেখার জন্যে ভিড়ের ভিতরে লুকিয়ে তাকে। তারপর স্থালী হাতে আমূল নগ্ন চঞ্চলা যখন মন্দিরদ্বার থেকে বহির্গত হয়ে একটি দীপ্র ঘোটকীর মতো সমুদ্রের উদ্দেশে চলতে থাকে, তখন জনতার মধ্যে থেকে তাকে অনুসরণ করে এক রাজপুরুষ। তাকে সমুদ্র অবধি অনুসরণ করে রাজপুরুষ, নীল সিন্ধুজলে রূপসীর অবতরণ অবধি, এবং তারও পর তার স্নান সমাপন অবধি তার ক্ষুৎকাতর চক্ষুদ্বয় জ্বলন্ত জাগ্রত থাকে। এই রাজপুরুষ দীর্ঘাঙ্গ ও সুদর্শন। অথচ কত তুচ্ছ নাগরিক চঞ্চলার হৃদয় ও শরীরের দখল পেয়েছে, কিন্তু এই রাজপুরুষকে চঞ্চলা কি-এক অজ্ঞাত কারণে প্রত্যাখ্যানের পর প্রত্যাখ্যান করেছে। কতদিন চঞ্চলাকে এক-পলক দেখার আশায় তার বাড়িতে গিয়ে বসে থেকেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিন্তু আশ্চর্য, চঞ্চলা তাকে বলতে গেলে একরকম অপমানই করেছে। বেচারা রাজপুরুষ তাই তাকে নগ্নিকা দেখার আশায় সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে।

ব্যক্তিত্বসম্পন্না চঞ্চলার গৃহে এই নগরীর শ্রেষ্ঠ পুরুষদের সমাবেশ। রাজপুরুষ, কবি, বাগ্মী, ভাস্কর, চিত্রকর। বাররমণী সে, তার গৃহদ্বার সকলের জন্যে উন্মুক্ত, কিন্তু হৃদয়দ্বার নয়। এই নগরীতেই এমন রূপসী আছে যে চঞ্চলার চেয়ে সুন্দরী, এমন রমণী আছে যে চঞ্চলার চেয়ে মেধাবিণী, কিন্তু রূপ এবং মেধার এমন সমন্বয় কি আছে আর? নেই। চঞ্চলার আছে সেই ব্যক্তিত্বের ব্যবহার, যা নেই স্তননিতম্বসর্বস্বা অন্য বাররমণীদের। তাই তার উদার নিমন্ত্রণের মধ্যেও একটি নির্বাচন আছে। আর-যে নারীর ব্যক্তিত্ব আছে, নির্বাচন আছে, সে আহ্বান করে নিয়ে আসে দ্বন্দ্ব, বিরোধ, প্রতিদ্বন্দ্ব। অর্থাৎ ঘটনা, নিস্তাপ সমতল জীবনযাপন নয়—পতনে-উত্থানে দোলায়িত ঘটনা। এবং সেরকম একটি ঘটনাই সংঘটিত হলো সেদিন।

২

সেদিন সূর্য অস্ত যেতে না-যেতে প্রদীপ প্রজ্বলিত হতে-না-হতে চঞ্চলার গৃহে উপস্থিত হয় কবি। কবি স্বভাবই ঈষৎ তীব্র অস্থির ও ধৈর্যহীন। যখন সে উপস্থিত হলো, তখনও চঞ্চলার সান্ধ্যকালীন স্নান ও প্রসাধন সাঙ্গ হয়নি। কবি সানন্দে বসে বসে পা নাচায়।

সম্প্রসাধন সম্পন্ন করে ভিতর থেকে অনেকক্ষণ পরে চঞ্চলা যখন বেরিয়ে এল হাস্যোজ্জ্বল মুখে, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ, রীতিমতো রাত্রি নেমেছে। বলল—কি ব্যাপার, কবি আজ এত তাড়াতাড়ি?

কবি সে কথার উত্তর না-দিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে—আরে, এ যে দেখছি কক্ষের ভিতরেই চন্দ্রোদয়। সত্যি চঞ্চলা, তুমি আজ অচঞ্চল দ্বিতীয় চন্দ্রের মতো

দীপ্যমান। আমি কিছু কবিতা রচনা করেছি, কিন্তু মনে হচ্ছে ঈশ্বর-রচিত সৃষ্টির কাছে সেসব তুচ্ছ।

হয়েছে, খুব হয়েছে! আঁখিজাদু হেনে বলল যুবতী।

কবি রীতিমতো নাটকী আবেদন সৃষ্টি করে—আহা আজ রজনীতে না জানি সে কোন ভাগ্যবান পুরুষ এই রূপসরোবরে স্নান করবে?

—ওহ, খুব হিংসা হচ্ছে, না?—চঞ্চলা একটি ফোয়ারার মতো কলহাস্য করে ওঠে। তারপর ফোয়ারা শমিত করে বলে—কেন, চন্দ্ররশ্মি এই কবির উপরে কি এসে পড়েনি কোনো দিন?

—তা পড়েছে। তা পড়েছে। কবির সপ্রতিভতা একতিল ভ্রষ্ট হয় না। কিন্তু—সেসব তো মনে হয় কোন পূর্বজন্মের কথা। এত সুদূর অতীতে বিষয় বলে মনে হয়, যার অর্ধেক স্মৃতির ভিতরে প্রবিষ্ট বাকি অর্ধেক স্বপ্নের অংশ। আর তুমি, চঞ্চলা, তোমাকে মনে হয় সাধারণ নারী নও তুমি। তুমি দেবী, তুমি ভিনাস, এইমাত্র সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়ে এলে, তোমার কেশরাশি এখনো সিক্ত, তোমার শরীর এখনো নীল লবণাম্বুজলের স্মরণে শীতল, তোমার আননে এখনো লিপ্ত হয়ে আছে দুএককণা সমুদ্রশীকর, দেবী তুমি, সমুদ্রউত্থিত ভিনাস তুমি—

কবির স্তোত্র যখন এইভাবে অবিরলধারে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে, আর কানের দুল ঝিলকিয়ে মাথা ঈষৎ কাৎ করে সহাস্যে আশ্চর্য এক ভঙ্গিতে এই স্তোত্রপাঠ শ্রবণ করছে চঞ্চলা, কেননা বাধা দেওয়া বৃথা, কেননা বাধা পেলে কবির বচন আরো উদ্বেলিত হয়ে উঠবে—ঠিক সেই সময় কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করে ভাস্কর। দীর্ঘ, বলশালী, সুষম শরীর সে নিজেই এক ব্রোঞ্জ ও পাথরের গড়া ভাস্কর্যের তুল্য।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করেই সে কবিকণ্ঠ নিঃসৃত স্তব শুনতে পেল। হাস্যমুখে সে তাকে শায় দ্যায়—ঠিক বলেছ, কবি। প্রকৃত কবিদৃষ্টি আছে তোমার। আমি ক-দিন থেকে ভাবছিলাম চঞ্চলাকে মডেল করে ভিনাসের একটি মূর্তি রচনা করা যায় কিনা। এখন নিশ্চিত হলাম। দ্বিধামুক্ত এখন কাজে নেমে যাব। কবির অনুমোদন পাওয়া গেছে অজ্ঞাতসারেই।

—বাহ! চমৎকার! কংকনঝংকারে চঞ্চলা স্বনিত-ক্বণিত হয়ে উঠল—শুড়ির সাক্ষী মাতাল এসে গেছে।

ভাস্কর আরাম করে বসে একটি কেদারায়। কানেও নেয় না চঞ্চলার কথা। বলে—আমি আগামীকাল থেকেই কাজ শুরু করতে চাই। কাল কি তোমার সময় হবে, চঞ্চলা? আসতে পারবে আমার আলয়ে?

—উহ! তর সইছে না আর কারো! চঞ্চলা কটাক্ষ হানে। এই সময় চিত্রকর, গায়ক, বাদক, বাগ্মী প্রভৃতির একটি দল এসে উপস্থিত হয়। এদের মধ্যে বাগ্মী বয়স্ক, তার একমাথা শ্বেতশুভ্র চুলশাদা। পতাকার মতো উড্ডীন, কিন্তু তার মুখাবয়ব তারুণ্যে প্রদীপ্ত। আর দীর্ঘ কৃশকায় নবযুবকটি গায়ক, এই আসরে সে-ই সবচেয়ে অল্পবয়স্ক,—চঞ্চলার গৃহে আজই সে প্রথম এল। অন্যেরা চঞ্চলার পুরাতন প্রণয়ী ও উমেদার। এরা সব এক আসর থেকে একসঙ্গে এখানে চলে এসেছে।

সম্ভাষণ বিনিময় পর সবাই উপবেশন করল। চঞ্চলা ভিতরে গেল একটুক্ষণের জন্য। চঞ্চলার উদ্দেশে তার স্তব ব্যাহত হওয়ায়, এবং একটু বেশি ভিড় হয়ে যাওয়ায়, কবি ভিতরে ভিতরে বেশ ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে। বেচারা নবীন যুবা গায়কটি তার ব্যঙ্গবাণের লক্ষ্য হয়ে ওঠে।

চঞ্চলা ফিরে আসে একটু পরে। তার পিছু পিছু কয়েকজন দাস-দাসী প্রচুর সুখাদ্য ও সুরা নিয়ে আসে।

তারপর চলে পান, ভোজন, হাস্যরসালাপ। চঞ্চলার কণ্ঠে গীত হয় মধুস্রাবী একটি গান। এইসব যখন চলছে, তখন একজন দাস এসে সংবাদ দ্যায়, কে একজন বার্তাবাহক দেখা করতে চাচ্ছে।

—বার্তাটি নিয়ে এলে হয়। কেউ একজন বলল।—

দাস উত্তর দ্যায়—না, তিনি নিজের হাতে দেবেন, বললেন।—

কবিই বলে—এখানে আসতে বলো তাকে।

কিছুক্ষণ পরেই দাসের সঙ্গে বার্তাবাহকটি এসে উপস্থিত হয় উৎকণ্ঠিত সবার সম্মুখে। অভিবাদন করে সে একটি পত্র চঞ্চলার হাতে অর্পণ করে। পত্রটি পাঠ করতে করতে চঞ্চলার মুখবর্ণ প্রথমে রক্তিম পরে শাদা হয়ে যায়। কবি দ্রুত সেটি নিজের হাতে গ্রহণ করে। তারপর বার্তাবাহকের দিকে ফিরে তাকালে সে অভিবাদন করে প্রস্থান করে।

পত্রটি পাঠ করে কবি গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর গম্ভীর অথচ উত্তেজিত কণ্ঠে কিন্তু যথাসম্ভব আত্মসংবরণ করে বলে—এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁরা সবাই চঞ্চলার ঘনিষ্ঠ। তাই এটি চঞ্চলার প্রতি একটি ব্যক্তিগত পত্র হলেও আমরা সবাই এর অংশভাগী। সেজন্যেই আমি এর সারাৎসার আপনাদের জানাতে চাই। তারপর আমাদের যথাকর্তব্য স্থির করতে হবে। পত্রটি এসেছে আমাদের বিচারসভা থেকে। এতে বলা হয়েছে, চঞ্চলা এই নগরের পুরুষদের বিপথগামী করছে, তাদের চরিত্র নষ্ট করছে, এ-জন্যে নগরের গৃহবধূরা বোধ করছে বিপন্ন, এবং তারা মহান বিচারকবৃন্দের কাছে অভিযোগ পেশ করছে এর বিহিত করার জন্যে। নগরের বিচারসভা এই বিচারের ভার গ্রহণ করেছে। তদনুযায়ী চঞ্চলাকে আগামীকাল বিচারসভায় উপস্থিত থাকতে হবে। প্রধান বিচারপতির স্বাক্ষরে এই পত্র প্রেরিত হয়েছে।

এই বিবরণ শুনে প্রত্যেকের মুখ ব্যথিত, ক্লিষ্ট ও ত্রাসিত হয়ে উঠল। বিচারসভার আহ্বানের অর্থ কি, সবাই জানে। নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড, অথবা নির্বাসন, অথবা অনুরূপ কোনো কঠিন শাস্তি। মুহূর্তে সমস্ত আনন্দ ও আলো নির্বাপিত হয়ে সারা ঘরে নেমে এল হিম নীরবতা।

নীরবতা ভঙ্গ করে চঞ্চলাই প্রথম কথা বলল। বলল—এ কার কীর্তি আমি জানি।

—কার? একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল সকলে।

—এ সেই রাজপুরুষের কীর্তি যাকে আপনারা চেনেন, যিনি এখানে আসেন, কিন্তু দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর আমার প্রণয় প্রার্থনা করেও

তিনি ব্যর্থকাম হয়েছেন। তাই তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে এই কর্ম করেছেন। গৃহবধূরা জানেন তাঁদের অনেকের স্বামী আমার কাছে এসে থাকেন, কিন্তু আমিই তো নই একমাত্র বাররমণী, এই নগরে আরো শত সহস্র বাররমণী আছে আর বিদূষী গুণী বাররমণীদের সান্নিধ্যে আসা পুরুষদের জন্যে যে অপরাধ নয় বরং একটি প্রচলিত নিয়ম তা তাঁরা জানেন। সুতরাং আসলে গৃহবধূরা দায়ী নন। এই ঘটনার জন্যে দায়ী সেই আমার প্রণয়-প্রত্যাখ্যাত রাজপুরুষটি।—চঞ্চলা থেমে থেমে কথা ক-টি উচ্চারণ করে।

ভাস্কর এইখানে বাক্য যোজনা করে। বলে—আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করি, চঞ্চলা। প্রতিদিন কেউ-না-কেউ তো তোমার সঙ্গ পাচ্ছেই, দীর্ঘদিন ধরে তোমার প্রণয়প্রার্থী এই রাজপুরুষটি তাহলে কি অপরাধ করল যে, তুমি তাকে একদিনের জন্যেও কৃপা করলে না?

রোষে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল চঞ্চলা—রাজপুরুষ সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত, সন্দেহ নেই। কিন্তু একজন পুরুষের কাছে নারী কী আকাঙ্ক্ষা করে? তার ব্যক্তিত্ব! ব্যক্তিত্বই হচ্ছে পুরুষের সেই আকর্ষণ যাকে নারী অগ্রাহ্য করতে পারে না। রাজপুরুষকে আমার মনে হয়েছে দীনাতিদীন, ভিখারীর চেয়েও ভিখারী। অল্পতম পরিচয়েই আমি অনেক সময় আত্মদান করেছি, কিন্তু কখনো কোনো ব্যক্তিত্বহীন ভিখারীর কাছে নয়।

—সে তোমার প্রেমে পড়ে ভিখারী—বলতে গেল ভাস্কর, কিন্তু তাকে থামিয়ে কবি বলল—এখন সে-সব আলোচনা অপ্রয়োজনীয়। এখন আমাদের একমাত্র আলোচ্য হওয়া উচিত কোনো রন্ধ্র আছে কিনা যার ভিতর থেকে বাঁচিয়ে আনা যায় চঞ্চলাকে। আপনারা তো জানেন এই বিচারসভা কী ভয়ংকর! বিচারকবৃন্দকে কিঞ্চিৎ প্রভাবিত করা যায় কিনা সেই চিন্তাই হবে আমাদের।

ভাস্কর বলল—বাগ্মী তো আছেন এখানেই, হয়তো তিনি তাঁর অসামান্য ভাষণের দ্বারা—

আত্মপ্রসঙ্গ ওঠায় বাগ্মী ঈষৎ হাস্য করে। তার হাস্যে বিষণ্ন রুদ্ধশ্বাস পরিবেশ একটু হালকা হয়। তারপর বাগ্মী সহাস্যেই বলে—রাজপুরুষ সম্বন্ধে যে-সব অভিযোগ করলেন মহামান্যা চঞ্চলা তার সবগুলো আমাতেও বর্তায়, বোধ হয় সেই দোষে আমিও হয়ে আছি ভিখারীর চেয়েও ভিখারী। উপরন্তু আমার অপরাধ আর-একটু বেশি : আমার কেশ সমুদ্রের ফেনার মতো শ্বেত। এবং সেজন্যেই চঞ্চলার মতো অসামান্যা নারীর কাছে আমি আসছি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—এবং আছি উপবাসী।

বাগ্মীর বাক্যধারা শুনে চঞ্চলাও এত কষ্টের ও চিন্তার মধ্যেও হেসে ফ্যালে।

কবি বলে—আজো আমার ভাগ্য কৃপণ। তা হোক, বাগ্মী মহোদয়, কেবল রতিরণে নয়, প্রকাশ্য যুদ্ধেও জেতা চাই।

আসর আর জমে না। বাগ্মী মহোদয় বাদে আর-সবাই বিষণ্ন মুখে প্রস্থান করে। নবীন গায়ক এম্নিতেই কবি-কর্তৃক যথেষ্ট অপমানিত হয়েছিল। তারপর তার প্রথম আগমনের দিনই এরকম একটি অশুভ সংবাদ। মনে-মনে সে আর দ্বিতীয়বার

এখানে আসবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে। ভাস্কর ভাবছিল, চঞ্চলার একটি প্রতিমূর্তি রচনার যে-আকাঙ্ক্ষা ছিল তার, তা আর বুঝি পূর্ণ হলো না। কবি ভাবল, শেষ পর্যন্ত কি হয় দেখাই যাক। একটা কি অলোকসম্ভব কিছু ঘটতে পারে না!

৩

মৃত্যুদণ্ডই হতে যাচ্ছিল চঞ্চলার। একেবারে শেষ মুহূর্তে প্রায় অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছে বাগ্মীর বুদ্ধিতে। শেষ বিচারের দিন, যখন সমস্ত বিচারক সমাসীন, বাগ্মী হঠাৎ এগিয়ে এসে একটানে খুলে ফ্যালে চঞ্চলার পোশাক। আর মুহূর্তে উন্মোচিত হয়ে যায় অসামান্য এক শরীর—প্রাচীন নগরীর কারুকার্য-খচিত এক মুখমণ্ডল, নিশীথের অন্ধকারে রচিত কেশদাম, দীঘল ও তন্বী শরীর, নিটোল পরিপূর্ণ কোমল কঠিন স্তন ও শ্রোণী। একমুহূর্ত নিস্তব্ধ থেকে সমস্ত বিচারক এক-বাক্যে রায় দেন : 'না, অলৌকিক এই শরীরে কোনো পাপ থাকতে পারে না।'

৪

চঞ্চলার গৃহ আজ আবার উৎসবে উতল হয়ে উঠেছে। দণ্ডমুক্তির উৎসব। যেখানে তার অবধারিত মৃত্যু হতে যাচ্ছিল, সে যে জীবিত ফিরে এসেছে, এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কী হতে পারে! বাগ্মীর অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে চঞ্চলা সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে। বসন নির্মোচনের পর চঞ্চলার আমূল নগ্ন শরীর দেখে বিচারকবৃন্দের বিস্ময়ের অবধি ছিল না। ঘটনার আকস্মিকতায়, অলৌকিক শরীরের মহিমা দেখে বিচারকবৃন্দ প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন, তারপরই যেন একটি রুদ্ধ প্রস্তর ঠেলে সরিয়ে উচ্ছ্বসিত বেরিয়ে এসেছিল প্রশংসার প্রবল স্রোতোধারা। বিচারকবৃন্দ বিমুগ্ধ বিস্ময়ে একবাক্যে বলেছেন, এ শরীরকে কোনো পাপ স্পর্শ করতে পারে না, এ ঈশ্বরের আশীর্বাদ, এ দেবীর সাক্ষাৎ মর্তরূপ। যে-ঈশ্বর এই শরীর সৃষ্টি করেছেন, তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ থাকতে হয়। এ এক নিসর্গপ্রতিমা, স্বয়ং ঈশ্বরী। নগরের সর্বত্র—সমস্ত গৃহে, বিপণিতে, ময়দানে, পথ-চত্বরে, কুঞ্জে পানশালায়, বিনোদন-কেন্দ্রগুলোতে আজ আলোচ্য কেবল একটি অলৌকিক নগ্ন নারীশরীর, একটি মানুষী, চঞ্চলা। নগরময় চঞ্চলার মৃত্যুদণ্ডাদেশ বাতিল হওয়ার সংবাদ রাষ্ট্র হয়েছে, আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রূপকথার মতো একটি ঘটনা। চঞ্চলা হয়ে উঠেছে রূপকথার কেশবতী কন্যা, চন্দ্রমালা-মানিকমালার মতো এক স্বপ্নসম্ভব নায়িকা। চঞ্চলাকে যারা দ্যাখেনি, তাদের আগ্রহ অসীম স্পর্শ করেছে। চঞ্চলাকে যারা দেখেছে, তারা নিজেদের মনে করছে ভাগ্যবান। সমস্ত নগরবাসীর মধ্যে একটি পুলকের ডানা ও সিরাপ প্রবাহিত হচ্ছে। এই সুযোগে চরিতার্থ হচ্ছে বাগ্মীরও ভূমিকা। তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রশংসায় লোকে পঞ্চমুখ।

স্বতন্ত্র একটি গার্হস্থ্য উৎসবের মতো অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হচ্ছে আজ চঞ্চলার গৃহে। চঞ্চলার নির্বাচিত অতিঘনিষ্ঠ ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে। প্রথমে মনে হয়েছিল, চঞ্চলা-ঘটিত এই সমস্যার পরে খানিকটা সতর্ক হবে না কি তারা? পরে মনে হয়েছে, ভয় কী? স্বয়ং বিচারকবৃন্দই শেষ পর্যন্ত রায় দিয়েছেন চঞ্চলার পক্ষে। সুতরাং নির্বিঘ্নে আনন্দ উদযাপিত হোক।

চঞ্চলার গৃহে হলেও আজকের অনুষ্ঠানের আয়োজক এই নগরের একজন বিখ্যাত বণিক—তিনি চঞ্চলার করুণাধন্য। আজই প্রাচ্য থেকে বিচিত্রবিধ বিরল ও মহার্ঘ জিনিশপত্র সমেত তাঁর একটি জাহাজ এসে ভিড়েছে নগরপ্রান্তস্থ সমুদ্রে। আনন্দিত তিনি এই উৎসবের আয়োজন করেছেন। চঞ্চলার ছোট্ট সুন্দর ভবনের প্রতিটি কক্ষ আজ বিচিত্রবর্ণ আলোকমালা ও পুষ্পসজ্জায় দীপ্যমান। কক্ষে কক্ষে সুরভি, সংগীত, সুরা, আলোক, পুষ্প ও আনন্দধ্বনির তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে। গৃহস্বামিনীর এই আনন্দ উৎসবে দাসদাসীরাও শরিক হওয়ার জন্যে সজ্জিত হয়েছে চারু সাজপোষাকে।

ভবনের বৃহৎ কক্ষে আজ সমবেত হয়েছে চঞ্চলার অতি ঘনিষ্ঠেরা—বাগ্মী, ভাস্কর, চিত্রকর, কবি, নাট্যকার, গায়ক, বাদক প্রমুখ। বাগ্মীর অভিনব কৌশল প্রয়োগের প্রশংসা হচ্ছে। তিনিও সবিস্তারে জানাচ্ছেন, কী অবস্থায় কীভাবে তিনি ঐ কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন, এবং বিচারকবৃন্দের দৃষ্টি ও প্রতিক্রিয়ার অনুসূক্ষ্ম বিবরণ। চঞ্চলার কাছে পূর্বাহ্নে বাগ্মী তাঁর কূট অভিপ্রায় ব্যক্ত করেননি, কেবল তাকে কোনো অন্তর্বাস না-পরে আসতে বলেছিলেন—যাতে একটানে পোশাক খুলে ফেলে তাকে নগ্ন করে ফেলা যায়। ঘটনার আকস্মিকতায় চঞ্চলাও হতচকিত হয়ে পড়েছিল, এবং তার লজ্জাকরুণ মুখ লুকিয়েছিল দু'হাতের পাতার আড়ালে। হয়তো লজ্জাই তার শরীরের গুরুভার, ক্ষীণতা ও বঙ্কিমায় এমন লাবণ্য সঞ্চার করেছিল যাতে অভিভূত হয়েছিলেন বিচারকবৃন্দ। আজ এখানেও, চঞ্চলার ভবনে তার রূপের স্তুতি চলছে। বাররমণীদের মধ্যে চঞ্চলা যে শ্রেষ্ঠা এবং তুলনাহীনা, তা কি প্রমাণিত হয়নি? বৃথাই গৃহবধূদের ঈর্ষা, বৃথাই অন্য অন্য বাররমণীদের দগ্ধ হওয়া, প্রেমপ্রত্যাখ্যাত রাজপুরুষের ক্রোধও ব্যর্থ হলো। এক-পর্যায়ে অভিযোগকারী রাজপুরুষকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হাসি-মশকরার অজস্র বাণ বর্ষিত হয়।

বিজয়িনী চঞ্চলার জন্যে প্রত্যেকেই তার ব্যক্তিগত প্রীতির অর্ঘ্য নিয়ে এসেছে। বেচারা তরুণ গায়ক প্রতিজ্ঞা করেছিল যে চঞ্চলার গৃহে আর কখনো আসবে না। কিন্তু এরকম আনন্দ-উৎসবের দিনে কি না এসে পারা যায়? সে একগুচ্ছ দুর্লভ জাতের গোলাপ নিয়ে এসেছে। চঞ্চলার জন্যে কবি আজই কোন ফাঁকে যেন রচনা করেছে একটি চন্দ্রকরোজ্জ্বল কবিতা। সমবেত হর্ষধ্বনির মধ্যে কবি তার কবিতাটি মন্দ্রকণ্ঠে পাঠ করে শোনায়। সকলের মন স্পর্শ করে, সকলের আনন্দ যেন কবিকণ্ঠে উচ্চারণ খুঁজে পেয়েছে। ভাস্কর ঘোষণা করে, সমস্ত কর্ম বাদ দিয়ে সে যতদিন লাগে চঞ্চলার এই অসাধারণ শরীর-সম্পদের একটি অনুকল্প রচনা করবে। শরীরের মৃত্যু তো একদিন হবেই, জরা ও বার্ধক্য তো একদিন শরীরকে আক্রমণ

করবেই, কিন্তু এই শরীরের একটি ছাঁচ চিরকালের মানুষের আনন্দ বর্ধনের জন্যে রেখে যাওয়া চাই। তারপর সুললিত কণ্ঠে চঞ্চলা একটি সংগীত নিবেদন করে—সেই সংগীতের মর্ম শুধু আনন্দ, আনন্দ, আনন্দনিষ্যন্দিত আকাশ। আর যতক্ষণ গান চলতে থাকে, ততক্ষণে চিত্রকর চঞ্চলার একটি গীতরত ছবি অংকন করে চলে, এবং গীত সমাপ্ত হলে সেটি সমর্পণ করে চঞ্চলাকে। চঞ্চলা সবাইকে দেখায় ছবিটি। সবিস্ময়ে সকলে দ্যাখে, চিত্রে অবিকল রূপায়িত হয়েছে সংগীতরত চঞ্চলার মুখশ্রী ও দেহভঙ্গিমা। তারপর সকলের অনুরোধে, কবি যতক্ষণ না তাকে অনুরোধ করে ততক্ষণ অপেক্ষা করছিল, তরুণ গায়ক গান করে। তার কণ্ঠস্বর গম্ভীর ও সুশ্রাব্য। তারপর চঞ্চলা একটি নৃত্য পরিবেশন করে—এই নৃত্যের বিষয় খাঁচা থেকে ছাড়া পাওয়া একটি পাখির ফুরফুরে প্রমুক্তি ও আনন্দ। বাগ্মী তখন অসম্ভব সরস কয়েকটি গল্প পরিবেশন করে—সকলের হাস্যরোল রাত্রির সুনীল আকাশে রঙিন ফানুশের মতো উড়ে যেতে থাকে। রাত্রি যত অধিক হতে থাকে নগরের কোলাহল যত নির্বাপিত হতে থাকে, ততই এই গৃহের আনন্দ যেন হতে থাকে বর্ধিত। সব শেষে, আজকের অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক বণিকশ্রেষ্ঠের প্রস্তাবে, এবং সকলের সানন্দ সমর্থনে, চঞ্চলা একটি সম্পূর্ণ বিবসন নৃত্য পরিবেশন করে। সকলের প্রস্তাব ও অনুরোধকেও ছাড়িয়ে যায় চঞ্চলার নিজস্ব বুদ্ধিমতী যোজনা—বিবসন হয়ে সে উপস্থিত হয় ঠিকই, কিন্তু সালংকারা। তার মস্তকে, কর্ণে, কণ্ঠে, বাহুতে হস্তে, কটিতে, জঘনে, পায়ে অলংকাররাশি স্থির হয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপরই তার বাহুর বিক্ষেপে, জঘনের আন্দোলনে, পদক্ষেপের দ্রুততালে যেন কক্ষের ভিতরে স্বর্গের হিল্লোল একের পর এক স্পন্দিত হয়ে যায়। চঞ্চলার শরীর হয়ে ওঠে একটি সংগীত, সেই নৃত্যে কাম যেন স্বয়ং প্রমূর্ত হয়ে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের একটি ইন্দ্রধনু জ্বেলে দ্যায়।

নৃত্যশেষে দ্রুত ভিতরে অন্তর্হিত হয় চঞ্চলা। এবং অনেকক্ষণ ফেরে না। চঞ্চলার প্রস্থানের পরেও কিছুক্ষণ সবার কাটে নির্বাক এবং রুদ্ধশ্বাস। তারপরই আবার শুরু হয় বাক্যালাপ।

কবি কেবল কাব্যলোকেই অধিষ্ঠান করে না, দেখা যায় তার মাথাও খেলে অচিন্তনীয় সব দিকে দিকে। হঠাৎ সে বলে—আচ্ছা, আজ তো সমস্ত নগর একটি আলোচনাতেই শুধু মুখরিত—চঞ্চলার। আমরা এখানে যারা সম্যকভাবে উপস্থিত তারা তো বটেই, এমনকি মহান বিচারকবৃন্দ, এমনকি সাধারণ নগরবাসী পর্যন্ত সবাই চঞ্চলাতে মুগ্ধ, নিবেদিত, সর্বসমর্পিত। এখন বলুন তো দেখি, এই নগরেই এমন কে আছে, যাকে এসব আনন্দ ও উত্তেজনা কিছুমাত্র স্পর্শ করছে না? যিনি আজ বিচারসভাতেও যাননি, আসেননি এখানেও, এবং চঞ্চলার উপস্থিতি যাকে কিছুমাত্র চঞ্চল করে না, এমন কে আছেন?

জানা ছিল সকলেরই, কিন্তু প্রসঙ্গটা কেউ ভেবেই দ্যাখেনি, এখন প্রসঙ্গ তোলা মাত্র তাঁর কথা মনে পড়ল। তাছাড়া কবির বাক্যের যেন একটি নিটোল ধাঁধার অপরূপ সুরাহা করছে এম্নি কলরোল করে বলে উঠল—দার্শনিক! দার্শনিক মহোদয়!

—ঠিক বলেছেন। কবিও সহর্ষে বলে।—এখন বলুন এই যে অরসিক দার্শনিক, একি সেই প্রস্তরের তুল্য নয় যে হাজার বছর ঝর্নাজলে স্নাত হয়েও একফোঁটা রস পেল না?'

চিত্রকর বলল—তা তো বটেই।

—বেশ। সোৎসাহে বলে কবি—এখন বলুন, এটা কি অমানবিক নয় যে সমস্ত নগরবাসী চঞ্চলার রূপে নিমজ্জিত হলো, অথচ একজন হলো বঞ্চিত?

—বুঝলাম, বুঝলাম—ভাস্কর অধৈর্য। এত ভনিতা না-করে পরিষ্কার করে বলুন তো, কী বলতে চাচ্ছেন আপনি?

—ঠিক। ঠিক সেখানেই এসে আমি পৌঁছেছি, যেখানে সোজা আমার প্রস্তাবটি পেশ করা যাবে। আমার প্রস্তাব আর কিছু না, একটি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বলছি, আজকের এই অবিস্মরণীয় রাত্রেই বেচারা দার্শনিককে জীবনের মধুভাণ্ডের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হোক। অর্থাৎ চঞ্চলা আজ রাত্রেই তাঁর নৈঃশব্দ্য, গাম্ভীর্য, কৌমার্য এবং একাকিত্ব ভঙ্গ করবে।

—অসম্ভব। প্রতিবাদ করে উঠল বাগ্মী।—দার্শনিক মহোদয়কে টলানো যাবে না একটুও। তিনি নির্বাকপ্রায় এবং আত্মস্থই থেকে যাবেন। আপনারা কি লক্ষ্য করেননি, এই নগরে কারো সঙ্গে মিল নেই তাঁর? যদিও তিনি এই নগরের অধিবাসী, আমাদের কি মনে হয় না তিনি এই নগরের নন?

—নগরের না হোন, নাগরিকদের হতে দোষ কী। কবি পরিহাস করে বলে—সেটাই পরীক্ষা হোক রাত্রে। চঞ্চলার বিজয় সম্পূর্ণ হোক।

আর সেই মুহূর্তেই সুবেশিনী চঞ্চলা পুনঃপ্রবেশ করে। কলরব করে ওঠে সবাই। চঞ্চলা বিস্মিত চক্ষে ও কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—আবার কি হলো? এত হুল্লোড়?

কলরব। হর্ষ। আলোমালা। সুরা। সুরভি।

নগরী প্রায় নীরব হয়ে এসেছে। শুধু এই বাড়িটি থেকে উত্থিত হচ্ছে কোলাহল। বাইরে, ঈশ্বরের পৃথিবীতে তখন নেমে এসেছে নীল নিস্তব্ধতা ও শ্বেত শান্তি। বাইরে, ঈশ্বরের নীলিমায় মেঘের ভিতর দিয়ে একটি মসৃণ সোনার তরীর মতো চন্দ্র ভেসে চলেছে।

৫

এখন অনেক রাত্রি। শান্ত হয়ে রয়েছে বেদনা। নগরীর কিনারায় সমুদ্র নিথর হয়ে এসেছে। গম্ভীর হয়ে রয়েছে জাহাজ ও কালপুরুষ।

দার্শনিক মহোদয় একটু অন্যধরনের। তিনি কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। কোনো দার্শনিক বক্তৃতাও তিনি করেন না। জনসমাজে তাঁকে কেউ কোনোদিন দ্যাখেনি। কদাচিৎ তিনি গৃহের বাইরে পদার্পণ করেন। দু-একটি উচ্চারণ তিনি করেছেন, দু-একটি কথা তিনি বলেছেন কারো কারো সঙ্গে। তাতেই রাষ্ট্র হয়ে গেছে তিনি একজন দার্শনিক।

এখন বাইরে জ্যোৎস্নারাত্রি, বাইরে নীলিমা ও নিস্তব্ধতা। কিন্তু প্রকৃতি দার্শনিককে একতিল আকর্ষণ করে না। ঘরের ভিতরে একটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত। তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন একটি কেদারায়। চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। এরকমভাবেই তাঁর অধিকাংশ সময় কাটে।

এমন সময় বহির্দ্বারে দ্রুত করশব্দ শুনে চকিত হয়ে উঠলেন তিনি। দাসদাসীরা নিদ্রাগত। এত রাত্রে কষ্ট করে উঠবে তারা? ভেবে তিনি অগ্রসর হয়ে এসে দুয়ার অবারিত করে দিলেন। আর, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে প্রায় ঠেলে এক সুন্দরী কক্ষের ভিতরে চলে এল।

দার্শনিক একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কে তুমি? কি হয়েছে?

সুন্দরীর আননে ও শরীরে তখনো ত্রাসের চিহ্ন। বলল—আমি এ পথ দিয়ে একটি যানে গৃহে ফিরছিলাম। এমন সময় কয়েকজন দূর্বৃত্ত আমাকে আক্রমণ করে। তাই আমি দ্রুত যান থেকে অবতরণ করে পালিয়ে এসেছি আপনার আশ্রয়ে। আমার নাম চঞ্চলা। আপনি আমাকে বাঁচান।

দার্শনিক চঞ্চলার পোশাকের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। আস্বচ্ছ পোশাকে চঞ্চলার শরীর প্রায় দৃশ্যমান। এই পোশাকে এত রাত্রে কি কেউ বাইরে বেরোয়?—দার্শনিক ভাবলেন। আর চঞ্চলা ভাবল, এই তো, এই তো তিনি আমার শরীরের দিকে তাকিয়ে আছেন, আমার স্বচ্ছ বসন ভেদ করে আমার শরীরী ঐশ্বর্য প্রায় সম্পূর্ণই তাঁর কাছে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে আরো ঐশ্বর্যের। এই তো, এই তো আমার দখলে, প্রস্ফুটিত পুষ্পে ভ্রমরের মতো তাঁর চোখ লগ্ন হয়ে আছে আমার শরীরে। দার্শনিকের বাড়ির সম্মুখের রাস্তার ওপারে পানশালায় কবি-দার্শনিক-চিত্রকর-বাগ্মী-বণিকেরা অপেক্ষমান। সুরাপান করতে করতে তারা জল্পনা-কল্পনা করছে, কোন পরিণাম অপেক্ষা করে আছে তার। বিজয়িনী চঞ্চলা হয়তো একটু পরেই তাদের জানাবে, নগরীতে আর একটি পুরুষও নেই যে নয় তার রূপে মুগ্ধ, লোভাতুর ও নিমজ্জিত।

স্বচ্ছ বসনটিও একটানে খুলে ফেলল চঞ্চলা। তারপর আমূল নগ্নিকা চঞ্চলা নিজেকেও উন্মোচিত করল। সৌরভের মতো নিষ্ক্রান্ত হলো তার কণ্ঠস্বর—দার্শনিক মহোদয়, আপনি আমাকে চেনেন না। আমি চঞ্চলা—এই নগরের বাররমণীদের শ্রেষ্ঠা। আমার কটাক্ষপাতে শিহরিত হয় না এমন পুরুষ নেই এই নগরে, আমি তাদের স্বপ্নকল্পনালোকের রানি। এমন জ্যোৎস্না ও আনন্দময় রজনীতে আপনি কেন, একাকী, বিমর্ষ ও চিন্তামগ্ন?—বলতে বলতে দার্শনিককে লঘু আলিঙ্গন করল চঞ্চলা।

দার্শনিক একখণ্ড শীতল নিস্তাপ রক্তহীন পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

একটু পরে ছিটকে বেরিয়ে এল চঞ্চলা। দলিত ক্রুদ্ধ সাপিনীর মতো চীৎকার করে উঠল—আপনি আমাকে অপমান করছেন, আমার সৌন্দর্যকে অপমান করছেন। এই নগরে এমন কোনো পুরুষ নেই যে আমার আলিঙ্গনের প্রত্যুত্তরে আপনার মতো অনড় ও নিস্তাপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। আপনি কেন জীবনের আনন্দ

থেকে বঞ্চিত রাখবেন নিজেকে? কেন শরীরের আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকবেন? আমি কি আপনার যোগ্যা নই? আপনি কেন আমাকে অপমান করবেন?

তখনো দার্শনিকের দৃষ্টি চঞ্চলার আমূল নগ্ন শরীরে নিপতিত। দার্শনিকের দৃষ্টি দেখে চঞ্চলার এই প্রথম নিজেকে মনে হলো নগ্ন। কিন্তু দার্শনিক তো তাকিয়ে আছেন শুধু, তাঁর শরীর তো সাড়া দিচ্ছে না, আর তাঁর কণ্ঠে কেন বাক্যশূন্য?

চঞ্চলা আবার উষ্ণ আলিঙ্গন করল দার্শনিককে। কাতর কণ্ঠে অনুনয় করল—আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না, দার্শনিক। বন্ধুদের কাছে আমার সম্মান তাহলে ধুলোয় লুটোবে। দয়া করুন আপনি, দয়া করে দয়া করুন। আমি নারী আমাকে গ্রহণ ধন্য করুন। করে আপনি কি পাষাণ? ধিক আপনার মনুষ্যজন্মে! ধিক আপনার পুরুষজন্মে!'

দার্শনিক চঞ্চলার কঠিন আলিঙ্গন ছাড়িয়ে সরে দাঁড়ালেন। তাঁর কঠোর কণ্ঠ যথাসাধ্য বিনীত করে বললেন—চঞ্চলা, তুমি অধীর হোয়ো না। নগরের সমস্ত পুরুষই তো তোমার রূপমুগ্ধ, একজনই না হয় থাকল তার বাইরে?

—কেন, কেন তা হবে? আমার সৌন্দর্যের চেয়ে আপনার বিষণ্নতা কি বেশি মূল্যবান? আমার কি কোনো নিজস্ব সাধ-আহলাদ নেই? আমাকে কি আপনি অন্য সব অশিক্ষিতা রুচিহীনা বাররমণীদের তুল্য জ্ঞান করেন? আমাকে কি আপনি মনে করছেন সাধারণ রূপজীবিনী? জানেন, আমার প্রণয়প্রার্থীদের মধ্যে আছে এই শহরের শ্রেষ্ঠ গুণীরা—কবি, ভাস্কর, চিত্রকর, গায়ক, বাদক, বাগ্মী প্রমুখ। শুধু আপনি আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করলেন। ছি-ছি! বৃথাই আমার নারীজন্ম!—যেন হাহাকার করে উঠল চঞ্চলা।

—না। তোমার দোষ নেই। দোষ আমার! কিন্তু আমি কি করব, চঞ্চলা? আমি তোমার অসামান্য সুন্দর শরীরের ভিতরের কঙ্কাল যে দেখতে পাচ্ছি। আমি কি করব? আমি কি করব? আমি নিরুপায়।

দার্শনিকের কম্পিত কণ্ঠস্বর শুনে তাকাল চঞ্চলা। দেখল, দার্শনিকের চোখ অশ্রুসজল ॥

[১৯৮২]

শিকার

—এই মোড়েই নামতি হবে, স্যার—সমুখের দিকে তাকিয়ে সাবধানে, জিপ চালাতে চালাতে ড্রাইভার বলল। সাবধানে—তার কারণ : রাস্তা বিপজ্জনক, পাকা যদিও কিন্তু অত্যন্ত সরু আর রাস্তার দু'পাশে গর্ত। ড্রাইভার যদিও অভিজ্ঞ, তবু চাপা ও সংকীর্ণ রাস্তায় সরকারি গাড়ি চালাতে সাবধানের মার রাখতে নেই, বিশেষত স্বয়ং একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়র শাহেব যখন সস্ত্রীক সবান্ধব আসীন। এঞ্জিনিয়র শাহেব অবশ্য যুবকশোভন সাহসী এবং নিজে যুবক, কিন্তু তার ড্রাইভার কি ভুল করতে পারে? পারে না। ড্রাইভার জানে, ঈশ্বর জানেন, তারা কয়েকজন বিপজ্জনক রাস্তায় চলেছে।

ক্রমশ এগিয়ে এল মোড়, জটিলতার মোড়।—গাড়ি ঘোরাতে পারবে তো এখানে?—প্রশ্ন করল হারুন, তরুণ এঞ্জিনিয়র প্রশ্ন করল এভাবে, যেন কিভাবে গাড়ি ঘোরাবে সেটাই হলো আসল সমস্যা। ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গিয়ে সে কি নিজের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ঢাকছিল? বহু ভিতরের হাড়-ভাঙা শূন্যতার মুখোশ-পরা জবাব দিচ্ছিল?

—সে আমি ঠিক ঘুরোয়ে নেবোনানে—কৃতার্থ ড্রাইভার আত্মশ্লাঘার হাসি হেসে বলল।

—ওমা, নদী কই এখানে, নদী তো দেখা যাচ্ছে না—গাড়ি থেকে শাড়ি ও শরীর ঠিকমতো নামিয়ে আনতে আনতে বলল জাহানারা—কতদূর যে হাঁটতে হবে—

তীক্ষ্ণভাবে জাহানারাকে লক্ষ্য করতে করতে হারুন মনে মনে বলল 'তোমার নকশা-কাটা শাদা সায়া গাড়ি থেকে নামবার অছিলায় সবাইকে না দেখালে চলছিল না বুঝি।'

হা-হা করে হেসে উঠল ফরহাদ—এই তো ভাবি, এখনই ঘাবড়ে গেলেন যে—

হারুন হাসির একটি চেষ্টা করে বলল—সেজন্যেই তো বলছিলাম, তোমার এসে কাজ নেই—

এখন ঠিক মধ্যদিন। সূর্য মাথার উপর থেকে বোধ হয় সামান্য বেঁকেছে, অঘ্রানের মিষ্টি দুপুর, রোদ উজ্জ্বল কিন্তু নিস্তাপ। মাটির রাস্তা দিয়ে ওরা এগোচ্ছিল। কাঁচা রাস্তা, ধুলো-ওড়া, নির্জীব ও হলদে ঘাসের ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে সে-রাস্তা চলে গেছে। ফরহাদ, হারুন, তার স্ত্রী জাহানারা, আর সবার

পিছনে হারুনের অফিসের ব্যক্তিগত বাহক জোবেদ আলি। জোবেদ আলির হাতে অনভ্যস্তভাবে একটি বন্দুক ধরা রয়েছে, বন্দুকের মালিক ফরহাদ। বিবর্ণ কাঁঠাল গাছের পাতার ভিতর থেকে কি-একটা পাখি ডাকছিল ক্রিক ক্রিক শব্দ করে, ফিকে সবুজ পাতার ভিতর পাখিটার গাঢ়-হলুদ আর নীল রঙে মেশানো ছোট্ট শরীর ঝিলিক দিয়ে উঠল চকিতে। পাখিটার বিদ্যুতে স্পষ্ট হয়ে ফরহাদ বলল—ঘুঘু তো দেখছিনে এদিকে।—তার স্বগোতক্তির কেউ উত্তর দিল না। জোবেদ আলি বলবে বলবে করেও কিছু বলল না, মাথা নিচু করে সবার পিছনে হাঁটতে লাগল। একটা বাঁশঝাড় পড়ল সমুখে, তার মধ্য দিয়ে একটা কুটিরের আভাস দেখা যাচ্ছে, গরিব হিন্দু পরিবারের দেবীমূর্তি-ভরা একটি মাটির ঘর। বাঁশের ঝরা পাতা, মরা পাতা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে পথের উপর। পাশে একটা ডোবা, তাতে পানির চেয়ে কাদা বেশি, অল্প পানির উপর ঝরা মরা পাতা পড়ে আছে, লাল সর পড়ে আছে। সে-সব পেরিয়ে দেখা যাচ্ছে ধনুকের আকারে একটা শাঁকো।

দূর থেকে দেখেই আঁৎকে উঠল জাহানারা।—বাঁশের রেলিং দেওয়া রয়েছে—রেলিং কথাটার ঠাট্টায় ফরহাদ নিজেই হাসল—ওটা ধরে ধরে দিব্যি পার হওয়া যায় আর ঐটা দেখেছেন, ঐ, ঐটা—দূরের একটা সাঁকো দেখল, 'ওতে দেখেছেন ধরবার কিছু নেই, ওতে কি করে পার হয় লোকজন?

জাহানারা সাঁকো লক্ষ্য করেছিল, এখন মুখে খুশির মশাল জ্বেলে বলল—যাক বাবা, বাঁচা গেছে : শাঁকোর নিচেটা দিব্যি শুকনো। আপনারা যেখান থেকেই পার হোন, আমি ঐ নিচ দিয়ে যাচ্ছি।—বলতে বলতে জাহানারা মাটির ঢাল বেয়ে নিচে নেমে গেল, খানিকটা দৌড়ের মতো ভঙ্গি করে। তার মুখে খুশির মশাল জ্বলছে, লাল খুশির মশাল, শ্যাম্পু-করা শুকনো উজ্জ্বল চুল উড্ডীন।

শাঁকো দিয়ে যাবার জন্য হারুন আর ফরহাদ এগিয়ে গেল।

জাহানারা নিচ থেকে অনর্থক এবং অকারণেই সহর্ষ চেঁচিয়ে বলল হারুনকে উদ্দেশ্য করে—তুমি আবার বাহাদুরি দেখাচ্ছ নাকি, ওখান থেকে পড়ে গিয়ে একটা কাণ্ড বাধাবে।' হয়তো স্বামীকে আলাদা করে দেখছে এতে পাছে ফরহাদ আঘাত পায়, তাই যোগ করে—নিচে থেকে এসো-না তোমরা, নিচে জায়গা থাকতে কেন-যে তোমরা উপর থেকে যাচ্ছে? বলতে বলতে জাহানারা একছুটে পার হয়ে ওপারে গিয়ে ওঠে। হারুন আর ফরহাদ শাঁকো দিয়েই পার হয়। "খুব বাহাদুরি দেখানো হচ্ছে ওদের" মনে মনে বলে জাহানারা বিড়বিড় করে। "বাহাদুরি" কথাটা সে প্রকাশ্যে বলেছে, বারবার বলতে তার দ্বিধা করে। ফরহাদ ও হারুনের পিছু পিছু নয়, নিচ দিয়েই বন্দুক কাঁধে এল জোবেদ আলি, শাঁকো পেরিয়ে হারুন খুশি হয়, শিকারে বেরোনোর পর এই প্রথম আন্তরিক খুশি হয়ে বলে—কী যে বলো, জাহানারা? জানো, ভরা বর্ষার সময়েই এই শাঁকো পেরিয়েছি গত বছর। শাঁকোর নিচে তখন পানি থইথই করছে—জাহানারা শুধু হাসল শব্দ না-করে।

আরো খানিকটা গাছপালা ঘরবাড়ি পেরিয়ে হঠাৎ চোখের সামনে খুলে গেল নদী। কুমার নদী। এই অঘ্রান মাসে শীতে শীর্ণ; একান্ত সরু, শাদা ফিতের মতো পড়ে আছে। ওপারে মাঠ দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত, নদীগর্ভেই নরম পলিমাটিতে শোভন

ধানখেত, অনেক নৌকো ডোবানো রয়েছে নদীর পানিতে। নদীর পানি খুব কম, নৌকোর দু পাশের ফলা জেগে আছে। পারাপারের জন্য ছোট্ট একটা খেয়া নৌকা। দুটো বাচ্চা ছেলে তাদের পক্ষে মস্ত একটা নৌকো নিয়ে লগি নিয়ে এপার-ওপার করছে। ওপারে বেশ উঁচু রাস্তা চলে গেছে, ধুলো-ওড়া চওড়া গ্রামের রাস্তা চলে গেছে গ্রাম-গ্রামান্তরে। ওপার থেকে নৌকোয় পার হলো কয়েকজন লোক, একজনের সঙ্গে একটি সাইকেল, গাঁয়ের লোক, হয়তো শহরে এসেছে কোনো কাজে।

নদীর পাড়ে থকথকে কাদা, গরু-বাছুর নদী থেকে ওখান দিয়ে উঠে উঠে ঐদিক খানিকটা জায়গা যেমন কাদায় থকথক করছে, এখানে অতটা না-হলেও কাদায় ভরা। একটা তক্তা ফেলা রয়েছে সেই কাদার উপর, পাশে পাশে রয়েছে বাঁশের খুঁটি ও জাহানারা, তারপর হারুন, শেষে বন্দুক কাঁধে জোবেদ আলি। নৌকোয় আরো দু-চার জন উঠেছে। বুড়ো-শুড়ো লোকগুলো বসে পড়েছে। হারুনের অনুরোধ উপেক্ষা করে কিন্তু তাকে ধরেই নৌকোর উপর দাঁড়িয়ে রইল জাহানারা। লগির ঠেলায় নৌকো দিল ছেড়ে। এক ধাক্কায় ওপারে এসে থামল। ফরহাদ ও আর দুএকজন লাফিয়ে নামতেই নৌকো তীর থেকে নদীর ভিতরে সরে এল। জোবেদ আলি নেমে নৌকোটা ধরার পর নামল জাহানারা, হারুনরা। শাড়ি দেখল জাহানারা। না, কাদা লাগেনি, স্যাণ্ডেলে একটু লেগেছে, সে তো লাগবেই।

নৌকো থেকে নেমে ওরা নদীর ধারে পাড় দিয়ে হাঁটতে লাগল।

জাহানারা বলল—কই, ওরা পার করে দিল নৌকোয়, পয়সা নিল না?

জোবেদ আলি বলল—অফিসারদের দেখলে পয়সা নেয় না।

জাহানারা বলল—বাহ্, বেশ তো।

নদীর ধারের মাটি কোথাও ভিজে, কোথাও শুকনো। ওদিকে দিগন্তবিস্তৃত নগ্ন খেত, কোথাও ফসল লাগানো হয়েছে, কোথাও জমি চষা হয়েছে, কোথাও হাড়-বের-করা ফাটল-ধরা শূন্য মাঠ পড়ে আছে। শুকনো, ভিজে মাটিতে গোরুর খুরের চিহ্ন, মোষের পায়ের দাগ পড়ে আছে। গোরু চরাচ্ছিল একটা রাখাল ছোকরা, কাজ ফেলে হাঁ করে দেখতে লাগল। মাঠ থেকে বেশ উঁচুতে গাছ-ঘেরা ছবির মতন সুন্দর একটা কুঁড়েঘর। সেখানে জনমানুষের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না বলেই আরো রহস্যময় ও অদ্ভুত-সুন্দর মনে হচ্ছিল। নদীর উপর গাঙচিলের মতো দু'তিনটে পাখি উড়ছিল।

ফরহাদ বলল—না, গাঙচিল না ওগুলো, দেখতে অবশ্য খানিকটা গাঙচিলের মতোই। এবার গাঙচিল মেরেছিলাম, খেলাম—

—ওমা, গাঙচিল কি খায়?—জাহানারা প্রশ্নবোধক মুখ করলো—গাঙচিল খায় না তো—

চারদিকে শিকারির তীক্ষ্ণ চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে বলল ফরহাদ—কি জানি, অত সব জানিনে, মারলাম, খেলাম, খেতে কিন্তু ভালোই লাগল—

হেসে ফেলল জাহানারা—যা খায় না, তা খেয়ে বলছেন, ভালোই লাগল। বেশ লোক আপনি যা হোক।

নদীর পাড়ে রাস্তা আবিষ্কার করতে করতে ওরা হাঁটতে লাগল।

—একটা বক—ফরহাদই প্রথম দেখল।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে জাহানারা ও হারুন দেখল, নদীর পানিতে অর্ধমগ্ন একটা নৌকোর উপর একটা বক বসে আছে স্থির হয়ে। জোবেদ আলি আগেই দেখেছিল।

—আপনাদের শিকারীর চোখ—ঠিক ধরেছেন। জাহানারা বলল।

—খেয়ে-দেয়ে বসে আছে—বলতে বলতে ফরহাদ ক্ষিপ্র হয়ে উঠল। হারুনের দিকে ফিরে বলল, তোমরা এখানে দাঁড়াও, আমি এগিয়ে যাই—জোবেদ আলির হাত থেকে বন্দুকটা নিল ফরহাদ, কার্তুজ ভরল শব্দ করে, তারপর এগিয়ে গেল পা টিপে টিপে কুঁজো হয়ে, অন্য দিকে তাকানোর ভান করে।

ফরহাদের ভঙ্গি দেখে ওরা কৌতূহলের মধ্যে কৌতুকের খাদ্য খুঁজে পেয়েছিল। ওরা সবাই হাসছিল। জাহানারা হাসছিল। হারুন নির্মল ও আন্তরিক হাসল। জোবেদ আলি এখন খালি হাতে একটু বিব্রতভাবে হাসছিল মুখ লুকিয়ে, যেন হাত খালি থাকাতেই সে বিব্রত, অবলম্বনের অভাব বোধ করলেও সে না-হেসে থাকতে পারছিল না।

কয়েকটি নিঃশব্দ ও একলক্ষ্য মুহূর্তের পর সমস্ত নিসর্গ জুড়ে শব্দ হলো ভয়ানক। ছিটকে পালাল চারদিকে পাখির দল, চমকে উঠল নদীর ওপারের বাড়ির বউ-ঝি, আর দেখা গেল নৌকোর উপর পাখিটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

জাহানারা বলে উঠল—ওভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেন বকটা?

—কি হলো, বকটা মরেনি তো?—হারুনের কণ্ঠস্বর।

—না, ও উড়তে পারবে না—ফরহাদ বলল—ওর পাখা ভেঙে গেছে।

—নদীর মধ্যে পড়লে ডুবে যাবে যে—জাহানারা বলে।

—না, বক নদীর পানিতে ভাসে, ডোবে না—ফরহাদ জানায়।

হারুনের জিজ্ঞাসা—তা, এখন ধরা যাবে কি করে?

—তাড়িয়ে ধরতে হবে—বলল ফরহাদ—জোবেদ আলি, দ্যাখো তো তুমি, নদীর পানি এখানে বেশি হবে না।

—না, স্যার, পানি হাঁটু পর্যন্ত হবে—জোবেদ আলি বলে—কি বড়জোর উরু পর্যন্ত। বলতে বলতে জোবেদ তার ক্যাম্বিশের জুতো খুলে রাখে, পাজামা গুটিয়ে নিল হাঁটুর উপর পর্যন্ত, তারপর নদীর পানির দিকে এগিয়ে গেল। পাড়ের কাদায় তার পা ডেবে গেল অনেকটা, এক পা তুললে আরেক পা, কিন্তু নদীর পানিতে যখন পৌঁছাল দেখল—সেখানে খুব কাদা নেই, আর পানিও অনুমানের বাইরে নয়। প্রায় অনায়াসে হাঁটুর উপর পাজামা ধরে জোবেদ আলি পানি কেটে কেটে হেঁটে চলে গেল সেই অর্ধেক-ডোবানো নৌকোটার কাছে, যার উপর বকটা ধ্যানীর মতো তখনো আসীন। হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল জোবেদ আলি, আর অমনি বকটা তার একমাত্র ডানা ঝাপটিয়ে লাফিয়ে পড়ল পানিত। বকটাকেই দেখতে দেখতে তীরে দাঁড়ানো ফরহাদ বলল জাহানারাকে—দেখছেন, উড়তে পারছে না।

ওপার থেকে জোবেদ আলিকে সাহায্য করেছে কয়েকটি কিষান ছেলে, তারা হৈ হৈ করে পানিতে সাঁতরিয়ে-চলা বকটাকে কিছুতেই তীরে উঠতে দিচ্ছে না,

ওদের তাড়ায় বকটা ভেসে আসছে এপারেই—যেখানে জাহানারা, হারুন আর ফরহাদ দাঁড়িয়ে আছে। আর পানির ভিতর একবার এদিক একবার ওদিক করছে জোবেদ আলি।

বকটাকে এদিকে আসতে দেখে এতক্ষণে ফের তৎপর হয়ে উঠল ফরহাদ। —তাড়িয়ে ধরতে হবে ওটাকে—বলতে বলতে এগিয়ে গেল—ভাবি, আসবেন না—বকের ঠোঁটটা দেখছেন : অনেক সময় ঐ ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে চোখ নষ্ট করে দ্যায় ওরা—

এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বকটাকে। লম্বা সরু পা ফেলে শাদা বেশ বড় বকটা পানি ছেড়ে ভিজে মাটির উপর দিয়ে এগিয়ে আসছে। জাহানারা পেছিয়ে গেল। হারুন—একটা রাখাল ছোকরা জুটেছিল—তাকে বারবার 'ধর! ধর!' বলছে, উৎসাহ দিচ্ছে, নিজেও যাচ্ছে এগিয়ে। ওদিকে পানিতে পা ডুবিয়ে জোবেদ আলিও তাড়া করছে বকটাকে। সবাই মিলে তাড়িয়ে ধরা গেল শেষপর্যন্ত।—ওটাকে জবাই করে দেই, জ্যান্ত নিয়ে যাওয়া অসুবিধে, কামড়াতে পারে—বলে পকেট থেকে ছুরি বের করে ফরহাদ জোবেদ আলিকে বকটাকে ধরতে দিয়ে নিজে জবাই করে দিল। বকটার লম্বা শাদা গলা দ্বিধা হয়ে গেল। গলগল করে খানিকটা তাজা রক্ত পড়ে বকটার শাদা শরীর লাল করে দিল।

মৃত রক্তাক্ত বকটা ঝুলতে লাগল জোবেদ আলির এক হাতে, আর এক হাতে তার জুতো, পা কাদা-মাখা। হারুন চেয়ে নিল বন্দুকটা। ফরহাদ, শিকারী, সবার আগে। ওরা আবার হাঁটতে লাগল সামনে।

দুপুরবেলার রোদ ও জনশূন্যতা ভেদ করে মাথার উপর দিয়ে একঝাঁক পায়রা উড়ে গেল।—পায়রা না?—হারুন বলল আকাশে তাকিয়ে।

ওগুলো পোষা পায়রা—ফরহাদ জানাল—এক-আধটা পায়রা মারতে পারলে ভালোই হতো।

—কি করে বুঝলেন ওগুলো পোষা? জাহানারা বলতে গিয়েও থেমে যায়, ভাবে : লোকটা, দেখছি, পাখির নাড়িনক্ষত্র সব জানে।

—বক মেরে ঠিক সুখ হয় না, তাও একটা, একসঙ্গে ঝাঁকে ফায়ার করতে না-পারলে লাভ নেই—ফরহাদ বলছিল—তা হারুন, তোমাদের এদিকে বালিহাঁস-টাশ মেলে না?

—এদিকে বালিহাঁস পাবে কোথায়? হারুন বলল—আগে জনবসতি ছিল না, বালিহাঁস দেখা যেত। আর আজকাল তো যেখানে-সেখানে বন্দুক, শিকারী, কাজেই ওরা সব উড়ে গেছে।

যেখানে-সেখানে বন্দুক যেখানে-সেখানে শিকারী—জাহানারা মনে মনে বলছিল—খোঁচাটা কি ধরতে পেরেছে ফরহাদ?

হারুন বলে যাচ্ছিল—সেবার ট্যুরে গিয়েছিলাম, বুঝলে? এই ফরিদপুর শহর থেকে মাইল দশেক দূরে নৌকো করে যাচ্ছিলাম এক জায়গায়, জোবেদ আলি ছিল সাথে, ও-ও দেখেছে, নৌকোর ঠিক গা ঘেঁষে যাচ্ছিল একঝাঁক বালিহাঁস, এত কাছে যেন হাত বাড়ালে ধরা যায়। আমি তো বালিহাঁস চিনতামই না, আমাদের

মধ্যে দুএকজন বলাবলি করায় চিনতে পারলাম, তা আমাদের সঙ্গে তো বন্দুক ছিল না—

'আশ্চর্য লোকটা', জাহানারা মনে মনে বলছিল, 'শুধু কি বন্দুকই ছিল না, শিকারীও তো ছিল না। বন্দুক থাকলেও গুলি করত কে? হারুন নিজে যেটা জানে না, সেটা তার স্বীকার করা উচিত। উচ্চমন্যতা আসলে হীনমন্যতারই একরকম প্রকাশ।'

—গতবার দেশের বাড়িতে গিয়ে হাঁস মেরেছিলাম একটা—ফরহাদ বলল —শামুক-ভাঙা পাখির নাম শুনেছেন, ভাবি? মস্ত বড় বড় দুটো শামুক-ভাঙা পাখি মেরেছিলাম। পাখি দুটোর পিছন পিছন যে কতদূর চলে গিয়েছিলাম। শিকারের যখন নেশা ধরে যায় তখন আর ফেরা যায় না কিছুতেই। বন্দুক নিয়ে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে আমি আর আমার এক চাচাতো ভাই মাইল মাইল চলে গিয়েছিলাম। শেষে শরবনের ভিতর কাদায় মাখামাখি হয়ে প্রায় শুয়ে পড়ে পাখি দুটো মারলাম।

হাঁটতে হাঁটতে ফরহাদ তার শিকারের গল্প করছিল। হারুন খানিকটা অন্যমনস্কভাবে সেই বর্ণনা শুনে যাচ্ছিল। জাহানারা কান পেতে শুনছিল হারুনের বন্ধু এক শৌখিন শিকারীর শখের সব শিকারের গল্প। সে জানে, গল্প করতে করতেও লোকটা তীক্ষ্ম চোখে পাখির সন্ধান করে যাচ্ছে। লোকটাকে অবাক মনে হয়। দুএকবার তার প্রশংসা করে জাহানারা টের পায়, হারুন কোথায় যেন খোঁচা খাচ্ছে, অস্বস্তি বোধ করছে, অপ্রতিভ বোধ করছে। বা—জাহানারা ভাবে—একটু প্রশংসাতেই তোমার ঈর্ষা! পুরুষেরা এত ঈর্ষাকাতর হয়!—হারুন, বাইরের উদার হারুন যে ভিতরে ভিতরে এরকম ছোট ও হীন, তা তো জাহানারা ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। এমনকি জাহানরারও বুঝত না, যদি ক-দিনের জন্যে হারুনের এই শৌখিন শিকারী বন্ধুটি তাদের বাড়িতে বেড়াতে না-আসত। যেন ফরহাদের আগমনে একটি মুখোশ খুলে পড়েছে, অথবা ঈর্ষা মানুষের মজ্জাগত, শুধু কখনো কখনো সে-ঈর্ষা রঙচঙে পোশাক পরে থাকে। গতকাল এসেছে ফরহাদ, হয়তো আগামীকাল কি আগামী পরশু চলে যাবে। প্রথম হারুন তার সঙ্গে স্বাভাবিক ভদ্রজনোচিত ব্যবহারই করেছে, কিন্তু এখন থেকে দেখা যায় : হারুন সবসময় লোকটাকে আঘাত করার চেষ্টা করছে, লুকিয়ে খোঁচা মারার চেষ্টা করছে, কথার ভিতর ভিন্ন অর্থ পুরে বিষ-মাখানো তীরের মতন ছুঁড়ছে। কিন্তু ফরহাদ শিকারী-মানুষ, তার ওসব খেয়াল নেই, সে হারুনের কথার শাদা ও সরল অর্থ নিয়েই সন্তুষ্ট। অনেক সময় ভিতরের খোঁচা না-বুঝতে পেরে বোকার মতো তাল দিচ্ছে হারুনের। তাইতো হারুনের প্রতি রাগ হয় জাহানারার : "দ্যাখো না, ও লোকটা কত সহজ-সরল, আর তুমি কি কূটমনা।" আর এজন্যেই হারুন আরো চটে যাবে জেনেও ইচ্ছে করে জাহানারা তাকে আঘাত করছে, না-করে থাকতে পারে না, যেন হারুনকে শিক্ষা দিতে সে উঠে-পড়ে লেগেছে। হারুন এঞ্জিনিয়র মানুষ, দিনরাত অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকে, অবিরাম ছুটোছুটি করে, হারুন যদি ঐ লোকটির প্রতি একটুও মনোযোগ না-দিত তাও এতো অখুশি হতো না জাহানারা। স্ত্রী ঐ লোকটির প্রশংসা করছে এবং তাকে ছোট করছে—এই হীন ও অলীক সন্দেহে যদি হারুন

ভিতরে আরো ক্ষিপ্ত না-হতো, তাহলে কিছুই ঘটত না। হারুন স্বাভাবিক থাকতে পারছে না বলে জাহানারা অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। এর উল্টোটা কোনোক্রমে সত্যি নয়। অন্তত জাহানারা তা স্বীকার করবে না। কিন্তু জাহানারা জানে, আজ হারুন এসেছে অফিসের জরুরি কাজ ফেলে। গতকালই শিকারে বেরোতে চাচ্ছিল ফরহাদ, আর তখন পর্যন্ত ব্যাপারটা না-বুঝে হঠাৎ কিশোরীর মতো জাহানারা খুশি হয়ে উঠেছিল, জেদ ধরেছিল শিকারে আসবে বলে। কিন্তু হারুন তখন বারণ করেছে। পরদিন, অর্থাৎ আজ, আসবে বলে। এখন বুঝছে জাহানারা, হারুনের ভয় ছিল, পাছে জাহানারা একাই লোকটার সঙ্গে আসে। আরো কি ভয় ছিল তা হারুন জানে, আর তার ঈশ্বর জানে।

কিন্তু জাহানারা? সে কি সত্যিই ফরহাদের প্রতি দুর্বল? অসম্ভব, তা কখনো নয়, জাহানারা তা মরে গেলেও স্বীকার করবে না। যা সত্যি নয়, তা স্বীকার করতে যাবে কেন জাহানারা? সে, জাহানারা, হারুনের বন্ধু ফরহাদকে এই প্রথম দেখল। লোকটা শুনতে পেয়েছে। তাই হারুনের সামনে ও আড়ালে কিছু ন্যায্য প্রশংসা করেছিল জাহানারা, গুণের প্রতি মুগ্ধতা জানিয়েছিল। লোকটা গুণী, তাই গুণের স্বীকৃতি জানিয়েছিল। কিন্তু একটি মেয়ে একজন গুণীকে তার গুণের স্বীকৃতি দিতে গেলে, সেটা প্রেম মনে করা ভুল। আর ফরহাদের আচরণে বা ব্যবহারেও সেরকম কিছু প্রকাশ পায়নি। পেলে, ঘাড় ধরে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিত জাহানারা। বস্তুত, জাহানারার প্রতি ফরহাদের ব্যবহার স্বাভাবিক ও শোভন। তবে, একথাও অসত্য নয়, ফরহাদের ঔদার্যে ও সারল্যে এবং হারুনের সন্দেহের জন্যে ফরহাদের প্রতি তার মুগ্ধতার মাত্রা হয়তো একটু বেশি। হারুন জানে না, তার সন্দেহগ্রস্ত মনোভাবই জাহানারাকে ফরহাদের প্রতি অনুকূল করে তুলেছে। হারুন যত বিরূপ হচ্ছে ফরহাদের প্রতি, জাহানারা হারুনের প্রতি বিরূপতায় তত নিকটবর্তী হচ্ছে ফরহাদের। এবং ইচ্ছে করেই, হারুনকে দেখিয়ে দেখিয়েই। জাহানারা জানে, ফরহাদ হয়তো কাল কি বড়জোর পরশু চলে যাবে এ শহর ছেড়ে, রাজধানীতে, তার কর্মস্থলে। তখন জাহানারাও এসব ভুলে যাবে, ফরহাদেরও মনে থাকবে না নিশ্চয়। হারুনের প্রতি একটু নিষ্ঠুরতায় যেন জাহানারা আনন্দ পাচ্ছিল। জাহানারা জানে, হারুন বা সে কখনো এই প্রসঙ্গের খোলাখুলি আলোচনা করবে না। তারা কেউ অমন গ্রাম্য বা অতীতনিবাসী নয়, কিন্তু নিঃশব্দে গোপনে গোপনে হারুন ও জাহানারার মধ্যে এক ভিতর-সমস্যার প্রশ্নোত্তর ও বোঝাপড়া চলতে থাকে।

রোদ পড়ে আসছে ধীরে ধীরে, ওদের ছায়াগুলো লম্বা হয়ে যাচ্ছে, খোলা বিরাট প্রান্তর যেন আরো দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। দূরে অনেক দূরে একটা ঝিল পড়ে আছে শেষ বিকেলে রোদ পেতে নিয়ে। তার পানি কাচের মতো স্বচ্ছ দেখাচ্ছে এত দূর থেকে।

ঝিলের উপর কয়েকটি পাখি আবছাভাবে ওড়াউড়ি করছে। ফরহাদ বলল—এখন পাখিদের ফেরার সময় হয়ে আসছে।—আমাদেরও এবার ফেরা দরকার—বলল জাহানারা। সে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। শিকার এসে যে-আনন্দ করবে সে ভেবেছিল, তা যেন পেল না। যেন হাঁটতে হাঁটতে নয়, ভাবতে

ভাবতে বিশ্লেষণ করতে করতে সে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল, সে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল সবার উপর। ফিরে যেতে পারলে এখন সে বাঁচে। ফরহাদ বলল—সেকি, একটামাত্র বক নিয়ে—' বলতে বলতে একটা রাখাল ছোকরাকে পেয়ে জিগেস করল ঐ ঝিলের দিকে পাখির ঝাঁক দেখা যায় কিনা। হারুনও বলল—চল, ফেরা যাক। এদিকে বেশি পাখি-টাখি নেই। ওদিকে ড্রাইভার বেচারা গাড়ি নিয়ে বসে আছে।—সেই খেয়াঘাট থেকে মাইল দুয়েক দূরে চলে এসেছে ওরা। এখন ফিরল।

ফিরে চলল ওরা। কাদা এড়িয়ে শুকনো ও সরু একটা পায়ে-চলা পথ ধরল, একেবারে নদীর গা ঘেঁষে চলেছে সেটা। নদীর ওপারে ওপারে গেলে সেই মোড়ে ওঠা মানুষজন নিয়ে একটি নৌকো ছেড়ে যাচ্ছিল কোথায়। জোবেদ আলি তাদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে ওঠে—ও মাঝি ভাই, আমাদের একটু পার করে দাও। মাঝি নৌকো নিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল। বলল—নাওয়ে যাইতে অইলে এদিক আইস্যা উঠতে অইব। জোবেদ আলি দেখল ওদিকে থকথকে কাদা, বলল—ওদিকে তো ভাই একহাঁটু কাদা। উল্টা যাওন যাইব না—বলে মাঝি এগিয়ে গেল। ওদিকে আর একটা ছোকরা একটা নৌকোর উপর বসেছিল চুপচাপ এদিকে তাকিয়েই। তাকে অনুরোধ করায় সে জানায় তার নৌকোয় পানি ওঠে। জোবেদ আলি তাকে জিজ্ঞাসা করে—এখানে কত পানি রে? হাঁটু পানির বেশি অইব না।—ছোকরার এই উত্তরের আগেই জোবেদ আলি পানিতে নেমে যায়। আগেরবার বকটা ধরা সময় সে দেখেছে নদীর পানি বেশি না। দ্রুত পাজামা গুটিয়ে মরা বকটা ফরহাদের হাতে দিয়ে সে নেমে যায় নদীর পানির মধ্যেই। তারপর ওপার থেকে একটা নৌকো ঠেলে দিল। তাতে এক এক করে ওরা তিনজন পার হলো, জোবেদ আলিই নদীর মধ্যে দিব্যি ঠেলে ঠেলে এক-একজনকে অন্য তীরে তুলে দিয়ে গেল। তারপর নৌকোটা আগের জায়গায় স্থির রেখে দিয়ে উঠে আসে জোবেদ আলি।

বিকেলের রোদ ত্যারচা হয়ে পড়ে আরো। কমলালেবুর মতো সূর্য দিগন্তের দেয়াল বেয়ে ঝুলে পড়ে। আদিগন্ত মাঠ খেত গ্রাম নরম হলদে আলোয় ভেসে যায়। লৌকিক এই জগৎটি অলৌকিক দৃশ্যের মতো মনে হয়। ওদের প্রত্যেকের মনে কাজ করে যায় অম্লানের অনুভূতিমালা। ওপারে, নদী ছাড়িয়ে, দিগন্ত পর্যন্ত শূন্য। আর এপারে চাষিদের বসতবাড়ি, ধানখেত, কপি, মুলো ইত্যাদির জমি। সবুজ শস্যে ভরে আছে। বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা খেলে বেড়াচ্ছে কোথাও। এক জায়গায় তিনজন চাষি বসে বসে গল্প করছে হুঁকো খেতে খেতে। কাজ করছে চাষিদের বৌ-ঝিরা। চাষিদের কয়েকটি বৌ-ঝি কাজ ফেলে ওদের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। জাহানারা তাদের সরল মুগ্ধতা ও কৌতূহলের লক্ষ্যজিনিশ হয়ে উঠল। দু'তিনটি বাচ্চা ছেলেমেয়ের সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করে স্বাভাবিক ও হালকা হয়ে এল জাহানারা।

নদীর শুকনো উঁচু পাড় ধরে ওরা হাঁটছিল।—এই গাছে কয়েকটা বক থাকে—ফরহাদ বলল নদীর ধারে এক গৃহস্থের একটি গাছ দেখিয়ে।—কি করে

বুঝলেন? জাহানারা অবাক হয়ে জিগ্যেস করল।—নিচে নোংরা করে রেখেছে কিরকম, দেখছেন না?

বলতে বলতে সচকিত হয়ে উঠল ফরহাদ—দুটো মুচি বক উড়ছে একসঙ্গে। দেখা যাক, যদি একসঙ্গে বসে—জাহানারা ও হারুন দেখল দুটো কালো রঙের বক উড়ছে আকাশে, নদীর উপরের আকাশে। কিন্তু পাখিগুলোর নামবার বা বসবার লক্ষণ দেখা গেল না, উড়তে উড়তে দূরে ঝিলের দিকে চলে গেল। নাঃ, ওদের থামবার ইচ্ছা নেই—জাহানারার এই কথা শুনে হারুন, ফরহাদ, জোবেদ আলি সবাই নির্মল হাসতে লাগল।

পাড়ের উঁচু জায়গা ধরে হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় খানিকটা সবুজ ঘাসের জটলা দেখে ফরহাদ বলল—ভাবি বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, এখানে একটু বসা যাক। আমি ক্লান্ত হইনি, আপনি বসতে চাচ্ছেন, তাই বলেন—জাহানারার এই কথা শুনে ফরহাদ হাসতে লাগল, নিঃশব্দে। রুমাল বিছিয়ে ওরা সব বসে পড়ল। জোবেদ আলি একটু দূরে, পিছনে উবু হয়ে বসল।

নিঃশব্দে বসে থাকল ওরা সবাই, কেউ কোনো কথা বলছিল না, কথা খুঁজে পাচ্ছিল না কেউ।

হঠাৎ দেখা গেল একটা বক যেন রোদের ভিতর থেকে দেহ বের করে এনে নেমে এল নদীর ওপারে। মৃত বকটার মতো আর একটি শাদা বক। তারপর বকটা বিকেলে কুমার নদীর ভিতরে শাদা রোদের মতো নেমে গেল। তীরের অল্প পানির ভিতরে হেঁটে হেঁটে বেড়াতে লাগল। নদীর ধারে ধারে হাঁটতে হাঁটতে বকটা ক্ষণে ক্ষণে পানির ভিতরে মুখ নামিয়ে আনছিল। দীর্ঘ ঠোঁটে ছোট ছোট মাছ শিকার করছিল।

ফরহাদ আর দেরি করল না, দ্রুত উঠল, বন্দুকের মধ্যাংশ দুমড়ে টোটা ভরে নিল। তারপর গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেল নদীর উঁচু-নিচু পাড়ের উপর দিয়ে নিচ দিয়ে। একটা খাড়িতে বসে বন্দুকের লক্ষ্য স্থির করল। কিন্তু বকটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, মাছ খেতে খেতে এগিয়ে যাচ্ছে। উঠে আবার এগিয়ে গেল ফরহাদ। আবার বন্দুকের নিশানা করল চোখ লাগিয়ে। অনেক দিনের অনভ্যস্ততায় আর হঠাৎ উত্তেজনায় হাত কাঁপছিল ফরহাদের। ওদিকে বকটা অত্যন্ত অস্থির, দু'দণ্ড এক জায়গায় বসছে না, কেবলি এগিয়ে যাচ্ছে। একবার উড়ে বেশ খানিকটা দূরে চলে গেল। হতাশ হয়ে বন্দুক রেখে মাথা উঁচিয়ে পাখিটাকে লক্ষ্য করছে ফরহাদ। দেখল পাখিটা উড়ে এসে ফের আগের জায়গায় পানির ভিতরে দাঁড়িয়ে গেল। নদীর পানিতে আর ডাঙায় কাদা-ভরা খানিকটা ঝোপ-জঙ্গল। ফরহাদ উঠে সেই ঝোপের ভিতর গেল মাথা নিচু করে। একটা উঁচু জঙ্গলের ভিতর তার বলিষ্ঠ শরীরটা আড়াল করার চেষ্টা করল। বকটা এখন স্থির হয়ে কোনদিকে তাকিয়ে আছে। ছায়া করে আসছে বিকেলের। জাহানারা, হারুন, আর জোবেদ আলি শ্বাস নিরুদ্ধ করে প্রায় দেখতে লাগল। ঝোপের ভিতর থেকে বন্দুকের নিশানা করল ফরহাদ। শব্দহীন কয়েকটি প্রতীক্ষ মুহূর্ত। তারপর নদী, মাঠ বসতি, নিসর্গ,

মানুষ—চরাচর প্রকম্পিত করে গর্জে উঠল বন্দুক। এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে পরক্ষণে উড়ে গেল বকটা, গায়ে লাগেনি তার, একটুখানির জন্যে বেঁচে গেছে।

হা-হা করে হেসে উঠল হারুন।

বন্দুক নিয়ে ফিরে আসছে ফরহাদ। তার মুখ বিকেলের রোদের মতোই রঙ-ধরা। লাল। তার জুতো আর ট্রাউজার কাদায় মাখামাখি হয়ে আছে।

হা-হা করে হাসছে হারুন।

জাহানারা প্রথম হেসে ফেলেছিল। এখন গম্ভীর, একটুবা বিবর্ণ।

ফরহাদ কাছে এল। হারুন কিছুতেই হাসি থামাতে পারছে না, যেন বিজয়ীর হাসি হাসছে সে। ফরহাদও লজ্জার হাসি হাসল একটু। তারপর হাসি নিভিয়ে জাহানারার দিকে তাকাল। তারপর হারুনের দিকে তাকিয়ে বলল—গুলি বকটার গায়ে লাগেনি, কিন্তু ওখানে গেলে দেখতে পাবে কয়েকটা পালক পড়ে আছে ॥

[১৯৭৮]

নেকড়ে, হায়েনা ও তিন পরী

মেয়েদের আমি মেয়ে বলি না। বলি, ফুল। বলি, পাখি। বলি, পরী। হ্যাঁ, পরী। একটা মেয়ে—তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত শরীর, তার মন : এসব কি পৃথিবীর জিনিশ? সব মিলিয়ে আপনার কি মনে হয় না, মেয়েরা ঠিক মাটির পৃথিবীর না, ওরা আকাশ থেকে নেমে আসা পরী। আমার তো মনে হয়, সব সময়ই মনে হয়, মেয়েদের আমি পরী ছাড়া আর কিছু ভাবি না। পরী। মাটির পৃথিবীর পরী। মাটির—কিন্তু কোথায় একটা মাটির সঙ্গে মিল নেই যেন। এত-যে মেয়েদের সঙ্গে মিশলাম, কোথায় যেন সবটা ধরা যায় না—পিছল মাছের মতো মুঠো পিছলে চলে যায়। ধরা যায় না কিছুতেই। রহস্যময়ী কথায় বলে না, নারী রহস্যময়ী। ওর চেয়ে সত্যি আর কোনো কথা নেই। আর যদি রহস্যময়ীই হয় মেয়েরা, তাহলে পরী বলতে দোষ কী। পরী। পরী। তাই মেয়েরা আমার কাছে পরী ছাড়া আর কিছু নয়।

তবে সব মেয়ে কি পরী? না, তা বলতে পারছি না। যেমন—আমার এই গোলাপবাগ লেনের বাড়িওয়ালি মহিলা। চারতলা বাড়ির মালিকানি। এসব তিন-মণী চার-মণী পাঁচ-মণী মহিলাকে কি আর পরী বলা যায়? যায় না। মহিলার দিকে আমি ফিরেও তাকাই না। কিন্তু উনি?

ওপর থেকে ওনার চাকরানি এসে গরম গরম খিচুড়ি দিয়ে যাচ্ছে, কি বাড়িতে একটা নতুন কিছু রান্না করা হয়েছে টিফিন ক্যারিয়ার ভর্তি করে তার ভাগ পাঠাচ্ছে আমার বাড়িতে। মহিলার স্বামী মধ্যপ্রাচ্যে কোথায় গেছেন যেন ভাগ্যান্বেষণে। হুমো হুমো ছেলেপুলেও আছে। কিন্তু হলে হবে কী। তিন-মণী হলে হবে কী। ভেতরের পরীটা তো সহজে মরে না। সে যে একদিন পরী ছিল, তা কি ভুলতে পারে?

এই যেমন কাল সন্ধেবেলা। কাল আর সন্ধেবেলা বেরোইনি। সামনের ছাদ-ঘেরা চাতালের ফুলগাছগুলো দেখছিলাম। পানি দিয়েছি একটু আগে। এই আমার একটা কাজ। প্রিয় কাজ। ফুলগাছের চর্চা। কোনোদিন কি ভাবতে পেরেছিলাম, ফুলগাছ নিয়ে সময় কাটবে। ফুলগাছ বলা ঠিক হচ্ছে না। ফুলগাছ না কোনোটাই। নানারকম সুন্দর সুন্দর পাতাওয়ালা গাছ। সূর্যের আলো না-পেয়েও বেশ তরতাজা। ফুলগাছে নিড়ানি দিচ্ছি। দেখি মহারানি হেলে-দুলে-পাড়া ঘুরে ফিরছেন।

দেখে একটু হেসে আর একদিকে তাকিয়ে আমি বলে উঠলাম—ইনসপেক্টর শাহেব তাহলে পাড়া টহল দিয়ে ফিরলেন?

তিন-মণীও সিঁড়ির দিকে এগোতে এগোতে আমার দিকে না-তাকিয়ে বলে ওঠে—কত গার্ল-ফ্রেন্ড দেখি আসছে যাচ্ছে। তা আমরা তো আর গার্ল-ফ্রেন্ড না, আমরা বয় ফ্রেন্ড। বলে সিঁড়িতে উঠে যায়।

এ কথা বলার কারণ আছে। আমার কাছে আসে তিন পরী। যখন-তখন ঠিক না, কিন্তু আসে। মহারানির চোখ তো পড়ে আছে আমার ঘরের দিকে। ঠিকই চার তলা থেকে লক্ষ্য করে সব। কাজ কী, স্বামীর পাঠানো রাশি রাশি ডলার গোনা, ব্যাঙ্কে যাওয়া-আসা, ভাড়ার টাকা তোলা—এই তো। বাকি সব সময় আমার দিকে দৃষ্টি। আমি কি করছি না-করছি। মাসে একদিন ভাড়ার টাকাটা দিতে যাই। রশিদটা তখন দ্যায় না। একদিন-দুদিন পরে চাকরানির হাতে পাঠিয়ে দ্যায়, সন্ধের দিকে। ঐ সন্ধেবেলাই তো থাকি বাড়িতে। তাছাড়া থাকা হয় না। সকালবেলা অফিস। দুপুরে ফিরে একটু বিশ্রাম। রাতে খেয়ে এসে ঘুম। এর মধ্যে হঠাৎ যদি পরী-টরী আসে, তাহলে আমার ঘর আলো হয়ে ওঠে। তা নাহলে নিঝঝুম ঘর। কবরের মতো নিঝঝুম। তাই টিভিটা চালিয়ে রাখি। আমি হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছি। টিভি চলছে। ঘুম থেকে উঠে শব্দ শুনলে মনে হয়, না, মরে যাইনি এখনো, কবরের মধ্যে শুয়ে নেই। এখনো বেঁচে আছি। বলবেন, বউ কোথায়? ছেলেমেয়ে? নাকি বিয়ে-থা করিনি?

না, মশাই, বিয়ে-থা করেছি। ছেলেমেয়েও আছে। সবই আছে, কিন্তু কেউই নেই, কিছু নেই, তাই একা। ওরা কেউ বেঁচে নেই, তাও না। ওরা সবাই আছে, দিব্যি আছে, বহাল তবিয়তে আছে। খবর পাই। খবর রাখি। এই ঢাকা শহরেই আছে। কিন্তু আমার সঙ্গে ওদের কোনো সম্পর্ক নেই। তার কারণও ঐ পরী।

ছোট্ট একটা চাকরি করতাম। রিনাও চাকরি করত। দুজনে মিলে কষ্টেসৃষ্টে চালাতাম সংসার। কিন্তু আজ মনে হয়, সেরকম কষ্ট করার সৌভাগ্যও পৃথিবীতে আল্লাতালা সবাইকে দেন না। সেই কষ্ট-করা সুখের দিন অল্প দিনেই চলে গেছে। তারপর এমন হলো, আমার সেই সামান্য চাকরিটাও গেল চলে। আমি তো ভেঙে পড়েছিলাম। রিনা-ই ভাঙতে দ্যায়নি। রিনা-ই আমাকে সজীব জাগ্রত রেখেছিল। শুধু বাঁচিয়ে রাখেনি—সাহস দিয়েছে, ভরসা দিয়েছে। তারপরই জুটল এই চাকরিটা। এ এমন এক চাকরি, যা আমার পক্ষে ছিল অকল্পনীয়। চাকরি হিশেবে যে খুব বড় তা না। বেতনের টাকাও বেশি না। কিন্তু প্রতিদিনই উপরি। শাদা-কালো টেলিভিশন বদলে রঙিন টেলিভিশন হলো। যা কখনো কল্পনাও করিনি, ভিসিআর হলো। ছোট্ট এক চিলতে ফ্রিজের বদলে আমার চেয়ে দৈর্ঘে-প্রস্থে অনেক বড় ফ্রিজ। রিনার কানের ছোট্ট এক দুল ছাড়া গয়নাগাটি কিছুই ছিল না। আগাপাশতলা গয়নায় মুড়ে দিলাম রিনাকে। ছেলে-মেয়ে দুটিও বড় হচ্ছে তখন। ওদের ছিল একটা-দুটো কাপড়। এখন কাপড়ের ওপর কাপড়। জামার ওপর জামা হতে থাকল। ছেলের সাধের ক্যামেরা। মেয়ের সাধের থ্রি-ইন-ওয়ান। পাতলা

ছিপছিপে রিনা, আশ্চর্য, মুটিয়ে তিন-মণী হয়ে গেল। ছিল পরী, হলো মেয়েমানুষ। আর তখন, তখনই আমার চারপাশে একটি-দুটি পরী উড়তে লাগল।

যে-আমি মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে পারতাম না, আশ্চর্য, সেই আমিই চমৎকার কথা বলাও শিখে গেলাম। টাকা কি কথাও বলাতে পারে? হ্যাঁ, কী-না পারে। যে আমি প্রথম যৌবনেও খুব সুন্দর ছিলাম না, মনে মনে রিনা বাদে আর কোনো মেয়েকে ভালোও বাসিনি কোনোদিন, সেই আমাকেই কিনা পরীরা এসে বলতে লাগল, 'ইশ! যা ম্যানলি না আপনি, জামাল ভাই!' 'উহ! কী হ্যান্ডসাম' 'জামাল ভাই এত হাসাতে পারে!' আমার নিজের দুএকটি লুকোনো গুণপনাও আবিষ্কৃত হতে লাগল। সোজা কথায়, পরীরা উড়ছিল, পরীদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও উড়ছিলাম। একদিন বাসায় ফিরে দেখি, রিনার মুখ গম্ভীর। এমনিতে এখন তার ডবল চিন, চেহারার লাবণ্য চলে গিয়েছে, তবে ফর্শা হয়েছে আরো। সে-দিন যেন মুখ দেখলাম ভারি পাথরের মতো। নতুন খাবার টেবিলে বসে অন্যদিন কত হাসাহাসি করে, রাজ্যের গল্প, সেদিন কোনো কথা নেই। খাওয়াদাওয়ার পর শোবার ঘরে এসে আয়েশ করে যখন একটি সিগারেট ধরিয়েছি, রিনা বলল—মেয়েটি কে?

আচমকা বিদ্যুৎ লাগলে যেমন হয়, আমি চমকে উঠলাম। আমার মুখ ছাইবর্ণ হয়ে গেল। বললাম—কোন মেয়েটা কে?

—রুমি বলছিল, কে একটা মেয়েকে দেখেছে তোমার সঙ্গে?

—আমার সঙ্গে? আমি স্পষ্টতই ঢোক গিলছিলাম। না... মানে... ও... আমার অফিসের হয়তো।' আমি যত নার্ভাস হয়ে যাচ্ছিলাম, রিনাকে ততই কঠোর-তীক্ষ্ণ মনে হচ্ছিল।

—কিন্তু তোমার অফিসের কোনো মেয়ের কথা তো শুনিনি কোনোদিন তোমার মুখে?

—বাহ! মেয়ে আছে না অফিসে? মিসেস আলম আছেন। আরো কেউ কেউ আছে।

—হ্যাঁ, আছে। তারা মহিলা। অল্পবয়সী মেয়ে তো কেউ নেই। মুহূর্তে শ্বাপদের মতো জ্বলে উঠল রিনার চোখ।—লজ্জা করে না তোমার? সেয়ানা মেয়েকে নিয়ে ঘুরে বেড়াও যেখানে-সেখানে? ছি-ছি! বেহায়া, বুড়ো ভাম হয়ে গেছ। হা-রা-ম-জা-দা! শু-য়ো-রে-র বা-চ্চা! চীৎকার করতে করতে থরথর করে কাঁপছিল রিনা।—রুমি একা দেখলেও কথা ছিল। ওর বন্ধুরাই আগে দেখেছে। ওর বন্ধুরাই বলেছে, এই, তোর বাপ না? দ্যাখ, একটা ইয়াং মেয়েকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছি-ছি! ছেলে না আমার সুইসাইড করে লজ্জায়। এতদূর অধঃপাতে গেছ তুমি! ছি-ছি! ঘেন্না করি আমি তোমার টাকায়। পাড়াপড়শিরা বলাবলি করে, আলাদিনের জাদুর চেরাগ পেয়েছি আমরা। শেষ-পর্যন্ত টাকাই কাল হলো আমার। ছি-ছি!

রিনা এলোমেলো কথা বলছিল। মাথা ঘুরছিল আমার। এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে, স্বপ্নেও ভাবিনি। রিনা পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল।

বলল—আমি যাকে এত বিশ্বাস করেছিলাম—যাকে এত বিশ্বাস করতাম—বলতে বলতে একছুটে গিয়ে কোরআন শরীফ ছুঁয়ে বলো—ঐ মেয়েকে তুমি কিছু করোনি—কোরআন শরীফ ছোঁও—ছুঁয়ে বলো—বলো।

আমি খাটের ওপর পাথরের মতো বসে থাকলাম।

—আমার সব শেষ হয়ে গেছে— বলে একছুটে কোরআন শরীফ রেখে এসে ডুকরে কেঁদে উঠে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল।

আমি পাথরের মতো বসে থাকলাম।

তখনকার আমি তো আর এখনকার আমি ছিলাম না। বলতে গেলে পরিষ্কারই ধরা পড়ে গেলাম বউয়ের কাছে।

ভাবলাম, যা হওয়ার হয়ে গেছে। ভালো হয়ে যাব এবার।

কিন্তু পরীদের ডানা যে একবার ছুঁয়েছে, এ জীবনে তার কি রক্ষা আছে আর? আমি এড়াতে চাইলেও একটার পর একটা পরী উদিত হতে লাগল আমার জীবনে। রিনাও একসময় পরী ছিল আমার জীবনে। এখন মেয়েমানুষে পরিণত হয়েছে—ভ্যাপসা, মোটা, তিন-মণী মেয়েমানুষ। মোট কথা, পরীদের ডানার ঝাপট থেকে রেহাই পেলাম না আমি আর। পরীরাও ছুটে আসতে লাগল আমার দিকে, আমি পরীদের দিকে ছুটে যেতে লাগলাম।

রুমি আমার সঙ্গে কথা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিল। আমি কথা বললেও কোনো জবাব দিত না। রিনা—ঘর যেহেতু বেশি নেই—ড্রয়িং রুমে গিয়ে শুতে লাগল। শুধু আমার মেয়ে রিমির দিকে আমি চোখ তুলে তাকাতে পারতাম না। দেখতাম, ওর মুখ কষ্টে নীল হয়ে থাকত সব সময়। বুঝতাম, ও-ই আমার জন্য সবচেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। এই সেদিনও 'আব্বু, আব্বু!' বলে গলা জড়িয়ে ধরত আমার। এখন ও যেন কেমন হয়ে গেছে। রিনা আর রুমি আমার থেকে যত দূরে সরে যেতে লাগল, আমিও ততই ওদের থেকে মনে মনে দূরে সরে যেতে লাগলাম। যদিও এটাও ঠিক যে, আমি জানতাম যে, অপরাধ আমারই। তবু মাঝে মাঝে রিনার ওপর ভেতরে ভেতরে রাগে ফেটে পড়তাম। ও যদি এতটা কঠোর না-হতো, আমি হয়তো ফিরে আসতে পারতাম। কিন্তু আমার ফেরার দরোজা বন্ধ হয়ে দিচ্ছিল। আমার সবচেয়ে বেদনার জায়গা ছিল আমার মেয়ে রিমি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়িয়ে গেল যে, বাড়ি ছাড়তে হলো আমার। সব থাকতেও ঢাকা শহরেই এক যাযাবরের জীবন বেছে নিলাম। যদিও ব্যাচেলরদের লোকে বাড়ি ভাড়া দিতে চায় না, তবু টাকা এমন জিনিশ যে, টাকা থাকলে বাঘের দুধও মেলে। আমার বয়েস যা, তাতে বিয়ে করিনি বলা যেত না। বলতেই হতো—বউ নেই। কোথাওবা বলতাম—বউ মরে গেছে। কোথাও বলতাম—ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।—কিন্তু আমাদের সেসব হয়নি। ডিভোর্স হয়নি, কিছুই না। মাঝে মাঝে লুব্ধ হয়েছি বিয়ে করার জন্যে আবার, কোনো কোনো পরী এগিয়েও এসেছে। কিন্তু শেষ-পর্যন্ত ভেবেছি বিয়ে করলে তো আর পরী পরী থাকবে না, মেয়েমানুষ হয়ে যাবে, শুরু হবে হাজারটা বায়নাক্কা, তার চেয়ে বাবা এই ভালো।

আব্বা-আম্মা সাধ করে বিয়ে দিয়েছিলেন। ভাগ্যিশ, আব্বা-আম্মা ইন্তেকাল করেছেন। কাজেই সেদিক থেকে কোনো পিছুটান নেই। রিনা নিজেও চাকরি করে। কাজেই ওদের চলে যাবে—সে ব্যাপারেও আমার কোনো বিবেক-যাতনা নেই। একমাত্র বড় ভাই-এর সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গিয়েছিল আগেই। এই বড়ভাই আমাকে মানুষ করেছে। মালিবাগে তার বাড়িতেই ছিলাম। বিয়ের পরেও। বড়ভাই আমার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়। মাঝখানে কয়েকজন বোন। রিটায়ার করার পরে বড় ভাই যখন বাড়ি করা শুরু করল, তখন কি খাটাই-না খেটেছি। ইট আনা, বালি আনা, সিমেন্ট আনা। টিনের একটা ঘরে থেকে রিনার টাকায় সংসার চালিয়ে আমার মাইনের টাকা আর অন্য কিছু টাকাও ঐ বাড়ি তৈরির পিছনে ঢেলেছিলাম। বড় ভাই-এর ছেলেপুলে নেই কোনো। কিন্তু কী হলো যে, বাড়ি হয়ে যাওয়ার পরে ভাবি ধরল সম্পূর্ণ অচেনা এক মূর্তি। ক্রমে দেখলাম ভাইও অপরিচিত হয়ে যাচ্ছে। ঐ বাড়ি ছাড়তে হলো একসময়। কয়েক বছর ধরে যে খরচ করেছিলাম। তা তো পানিতে গেলই—বলতে গেলে পথেই বসে গিয়েছিলাম।

আমার ভাগ্যটাই এমনি। একের পর এক সম্পর্কচ্ছেদ। বড় ভাইয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ হলো। তখন রিনাই ছিল আমার কেন্দ্র। পরে রিনাদের সঙ্গেও তো সব শেষ হয়ে গেল—যা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। এই বোধ হয় আমার নিয়তি। এক ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা। সে জন্য পরীরা আসে আসুক, কারো সঙ্গে আর স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলার কথা ভাবি না। দু'একবার বিয়ে করব বলে লুব্ধ হয়েও শেষ পর্যন্ত আত্মসংবরণ করেছি। সবার ভাগ্যে সব কিছু হয় না। আমার নিয়তি নিঃসঙ্গতা। কিন্তু তারই মধ্যে ভাগ্যের এক মহাদানও ঐ উড়ন্ত পরীরা।

পরী আসে, পরী যায়।

যেতে আসতে আসতে তিন পরীর সঙ্গে এক সম্পর্ক হয়ে গেল। তিন বান্ধবী ওরা। ডলি, মলি আর রেখা।

ডলি। মলি। রেখা।

নাম শুনে মনে করবেন না, ডলি আর মলি দুই বোন। বোন না ওরা, বান্ধবী। ওদেরই আর এক বান্ধবী রেখা। গেরবাজ পায়রা দেখেছি ছেলেবেলা আমাদের দেশের বাড়িতে। গ্রামে। এক গেরবাজ পায়রা অন্য পায়রা ধরে আনতো। জানতামই না আমি, মেয়েরাও ঠিক গেরবাজ পায়রার মতো। একটা আর-একটাকে ধরে আনে। ডলিই প্রথম এসেছিল। ডলি আনল মলিকে। মলি আনল রেখাকে। ওরা নিজেরাও পরস্পরের বন্ধু। যে-সে বন্ধু না, পরানের বন্ধু।

এসেছিল ডলিই প্রথম। কী সূত্রে কার উপলক্ষে যেন এসেছিল। সে-সব মনে নেই। পরীরা যে উড়ে যায়নি—এই বেশি। বরং ভালো করেই কেন যেন জড়িয়ে বসেছে। পুঁচকে এতটুকু মেয়ে। প্রথম যখন এসেছিল তখন পাত্তাই দেইনি। দ্বিতীয়বার যখন এল তখন প্রথম যে ও-ই এসেছিল তা মনে হয়নি। প্রথমবার এসেছিল কলেজের সাধারণ পড়ুয়া পোশাকে। দ্বিতীয়বার টকটকে লাল সালোয়ার-কামিজে। প্রথমবারের ডলি আর পরবর্তী ডলি যে একই মেয়ে কে বলবে? এতও বদলে যেতে পারে মেয়েরা! ডলি দেখতে মোটেই সুন্দরী নয়, এমনকি বয়স-হয়ে-

যাওয়া রিনার চেয়ে খারাপ। কিন্তু মুখ খুলতেই পরী। কথার যে কী জাদু জানে ডলি।

চলে এসেছিল অফিসেই। একা। ঐ বেশে আমি ওকে দেখে চমকে উঠলাম, আঁৎকে উঠলাম। আমার ডিরেক্টর শাহেব এক নম্বর মাগিবাজ। অফিস আওয়ারের পরে আমাদের অফিসে বসেই কি করেন না-করেন, শোনা যায় নানা কথা। আমারই টেবিলে একবার নাকি এক পিয়ন লম্বা চুল আবিষ্কার করেছিল। এক ঘর মে দো পীর—কে সহ্য করে? আমি আঁৎকে উঠে বললাম—চলো, কোথাও খেতে যাই। খেয়ে উঠে, তোমাকে আমার বাসা চিনিয়ে দেব। এরপর যখনই তোমার মর্জি হবে চলে আসবে যে-কোনো বিকেলে বা সন্ধ্যায়। কিন্তু অফিসে যে-কোনো অবস্থায় আসবে না। চাও যদি আমাকে টেলিফোনে করে বাসায় আসতে পারো। কিন্তু ফোনেরও দরকার নেই—আমি বাসায় থাকি—আর আমার বাসায় কোনো অসুবিধে নেই—আমি একা, একদম একা।'

ডলি যে আমার একাকিত্বের সব খবরই রাখত, তা আমি জানতাম না তখন। কী করে যে জেনে যায় মেয়েরা! পরী তো। পরীদের তৃতীয় চোখ আছে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। ঐ তৃতীয় চোখ আর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের বলেই কোত্থেকে চলে এসেছিল ডলি।

কত দিন আমার ঘরে কোনো মেয়ের পা পড়েনি। প্রথম যেদিন এল ডলি, আবেগে আমার গা-হাত-পা কাঁপতে লাগল। একটা পরী যেন দরোজার বাইরে তার ডানা দুটো খুলে রেখে ভেতরে এসে ঢুকেছে। যে-কোনো মুহূর্তে বেরিয়ে, দরোজা খুলে উড়ে যাবে।

এই এতটুকু একটা মেয়ে। রিমিরই বয়েসি হবে। কিন্তু কী তার কথা বলা, কী তার ঘাড় বাঁকানো। আমি যে কি করব, ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমি নিজেই বাসায় থাকি না সারাদিন, আমার নিজের কাজের একটা ছেলেও নেই। ডলিকে বসিয়ে নিজেই পাড়ার পেস্ট্রি শপে চলে গেলাম।

—উহ! এত কি এনেছেন? আপনি যে একদম আনাড়ি, সে আপনাকে দেখেই বুঝতেই পারছি। আপনি বসুন। প্লেট-টেলেট কোথায় আছে বলুন—আমি নিজেই ধুয়ে-টুয়ে নিয়ে আসি।

ডলি একেবারে ঘরের লোকের মতো কাজে লেগে গেল।

—কী মশাই, অবাক হয়ে গেছেন তো? যার কর্ম তার সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে। এসব কী ছেলেদের কাজ? এখন আসুন, একসঙ্গে খাই।—যেন ডলিরই বাড়িতে আমি বেড়াতে এসেছি।

সেদিন সন্ধে উতরে গেল। ডলি তখনও ছিল। সন্ধে উতরে যাওয়ারও অনেকক্ষণ পরে উঠল।

ডলির চোখ দিয়ে নিজেকে আমি আরেকরকমভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। ডলি। ডলি। সেই প্রথম ডলি আমার চোখ খুলে দিল।

অফিসে গিয়েই ডলির টেলিফোন—বিকেলে আসছি।

বাড়িতে ফিরেই ডলি।

কিংবা ঘুমের মধ্যে, অফিস থেকে ফেরা আধো ঘুমের মধ্যে আমার দরোজার ঘণ্টা বেজে ওঠে।

একটা অসাধারণ গুণ ডলির, কোনোদিন আমার পারিবারিক বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে না। আমিই বরং তাকে একটু-আধটু বলেছি নিজ থেকে।

—জানো, তোমার বয়েসি মেয়ে আছে আমার?

—মেয়ে? থাক না। মেয়ে এক, বন্ধু আরেক। মেয়ে আছে বলে বন্ধু থাকতে পারে না?

একদিন সারাদিন মেঘ করে ছিল। কী জানি কেন আমার মন খুব খারাপ। অফিস থেকে ফিরে শুয়েছিলাম একা। ঘুম-মতো এসেছিল একটু। বিছানাতেই শুয়েছিলাম। আব্বা-আম্মার কথা মনে পড়েছিল। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছিল। আব্বা-আম্মাই সাধ করে রিনাকে নিয়ে এসেছিলেন ঘরে। বিরাট ঝলমলে আলোকসজ্জিত বৌ-ভাতের ব্যবস্থা আব্বাই করেছিলেন। ঝকঝকে নতুন স্যুট পরেছিলাম সেদিন। রিনা তখন কী সুন্দরী, কী অপাপবিদ্ধা! তারপর নাতি হলো যখন, আব্বার খুশি দ্যাখে কে, রীতিমতো সমারোহ করে আকিকার আয়োজন করেছিলেন। তারপর কোথায় কী হলো, এলোমেলো হয়ে গেল সব। আব্বাও মারা গেলেন। বড় ভাই-এর সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল। রিনাদের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল। নিজের ছেলে-মেয়েও হয়ে উঠল পর। খোলামকুচির মতো টাকা ওড়াই এখন। টাকা যখন অভিশাপ হয়ে ওঠে আমি তার চিহ্ন রেখে কি করব। আমার কোনো সহকর্মী বাড়ির পর বাড়ি করে যাচ্ছে। কারো কারো ব্যাংকে ছেলে-মেয়ে বৌয়ের-ভাই-এর নামে লক্ষ টাকা জমে গেছে। আর আমার? বাড়ি তো নেই-ই, ব্যাংকে যে কোনো সাধারণ চাকরিজীবীর চেয়ে কম টাকা আছে কখনো কখনো একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়। আর তা নিয়ে আমার কোনো আফসোস নেই। বাতাসে শিশুর বেলুন উড়িয়ে দেবার মতো করে শূন্যে আমি উড়িয়ে দিয়েছি টাকা। কোনো এক রাতে দম বন্ধ হয়ে মরে পড়ে থাকলে, তদ্দিন লাশ পড়ে থাকবে যদ্দিন না লাশের সঙ্গে লোকে আমাকে আবিষ্কার করবে। আমার মৃত্যুর খবর শুনে হয়তো আমার ছেলে-মেয়ে-বৌ খুশিই হবে।

সেদিন, মেঘলা বিকেলে মনটা ভারি হয়ে ছিল। মনে হচ্ছিল, অর্থহীন ঘানি টেনে চলেছি, লোকে চাকরি করে ছেলে-মেয়ে বউয়ের সুখ-শান্তির জন্যে। আমার চাকরি করে কী লাভ? কেন ঘানি টেনে চলছি? আমার তো কেউ নেই। আমি মরলে একটা লোকও নেই কাঁদবার জন্যে। টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল, আর রাতেই আমি যদি মরে যাই পৃথিবীর কাক-পক্ষী জানতে পারবে না। অফিসে দুদিন পরে সহকর্মীরা বড় জেরা একটা কনডোলেন্স মিটিং করবে। ব্যাস। তারপরই সব শেষ।

মনে হচ্ছিল, বাহ! তার চেয়ে মরে যাই না কেন আজ রাতে। পাড়ার ওষুধের দোকান থেকে একঝাঁক ঘুমের ওষুধ খেয়ে নিই না কেন—তাহলে সব শূন্যতা সব নিঃসঙ্গতা সব একাকিত্বের অবসান হয়।

টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল হঠাৎ দরোজার ঘণ্টা বেজে উঠল বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে। উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না আমার। মনে হচ্ছিল শুয়ে থাকি—এই শোয়া থেকে উঠব না আর—এই শোয়া যদি চিরদিনের শোয়া হতো। ওঠবার সামান্যতম শক্তি ছিল না আমার শরীরে। তবু যখন ঘণ্টা বেজেই চলল, তখন মনে হলো—ভাড়ার টাকা নিতে আসেনি তো? না, এখন তো মাসের মাঝামাঝি। মহিলা এরকম বৃষ্টির দিনে পিঠে-টিঠে বানিয়ে পাঠাল নাকি? বিরক্ত করে মারবে? ভাবতে ভাবতে উঠে দরোজা খুলে অবাক। ডলি।

হাসছে। মাথার চুলে বৃষ্টির দুএকটি বিন্দু বেলফুলের মতো লেগে আছে। সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। আলসেমি করে আলো জ্বালাইনি আমি। সন্ধ্যার অন্ধকারে ডলি জ্বলে উঠল একটা দীপশিখার মতো। বলল—কী, ঘর অন্ধকার কেন?

আমি আলো জ্বেলে দিলাম।

টিভিও চালিয়ে দিলাম।

মুখ-হাত ধুয়ে একটা হাফ-শার্ট পরে নিলাম।

ডলি বলছিল—আমি কিন্তু হঠাৎ এলাম। কেন যেন তোমার জন্যে খুব মন খারাপ লাগছিল। মনে হচ্ছিল, অন্ধকার ঘরে তুমি একা একা থাকবে কি করে? তাই দ্যাখো—বৃষ্টির মধ্যেও চলে এলাম—

অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম আমি। আমার মনের কথা কি করে জানল ডলি? আজ ডলি না-এলে আমি হয়তো আত্মহত্যা করে বসতাম।

বলেও ফেললাম সে কথা—জানো ডলি, আজ তুমি না-এলে হয়তো আমি সুইসাইড করেই বসতাম। খুব খারাপ লাগছিল, ডলি। এত একা একা লাগছিল। মনে হচ্ছিল সামনে অথই সমুদ্র, তীরে আমি দাঁড়িয়ে।

—খবদ্দার। সোফা থেকে উঠে খাটের কাছে এসে মুখ চেপে ধরল আমার ডলি।—আত্মহত্যার কথা ভাববে না কখনো। যখনই একা মনে হয় তোমার, খারাপ লাগে, তখন আমি তোমাকে সঙ্গ দেব। আমি তোমার কাছে এসে থাকব।

—থাকবে ডলি? থাকবে? আমি অধীর হয়ে উঠলাম—কী যে একা লাগে, ডলি। যতক্ষণ অফিসে থাকি, বাইরে থাকি, ভালোই লাগে—বাড়িতে আসতেই আমার ইচ্ছে হয় না, মনে হয় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই—

ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি এল এই সময়।

ডলির চোখে কৌতুককণা। বলল—ধরো, আমি যদি তোমার নিঃসঙ্গতা ঘোচানোর জন্যে থেকে যাই আজ?

—থাকবে ডলি, থাকবে তুমি আজ? আমি পাগলের মতো হয়ে ওকে জড়িয়ে ধরতে যাই। বিছানা থেকে উঠে বসি। মেঝেতে পায়চারি করি।—তুমি থাকো ডলি, থাকো। এরকম বৃষ্টির রাতে তুমি চলে গেলে কী যে একা একা লাগবে আমার। তুমি থাকো। বিশ্বাস করো, আমি কিছুই করব না। তুমি শুধু থাকো আমার সঙ্গে?

—তুমি কিছু করবে না? ডলি হাসতে লাগল—কী করবে না?—উল্টো আমিই লজ্জা পেলাম।

ডলি বলল কথা ঘুরিয়ে—ছেলেদের সিগারেট খেতে দেখলে কী যে ভালো লাগে আমার। দেখি তোমার সিগারেট খাই একটা—।

প্যাকেট খুলে আমিই ওকে সিগারেট এগিয়ে দিলাম। ঠোঁটে লাগালে লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিলাম। আনাড়ি ভঙ্গিতে ডলি সিগারেট খাবার চেষ্টা করতে লাগল। আর আমার মনে হলো, আমার ঘরে স্বর্গ নেমে এসেছে। টিভিতে চমৎকার নজরুল-সংগীত গাইছিল সুদর্শনা এক গায়িকা—'মেঘবিজড়িত রাঙা গোধুলি/নামিয়া এল বুঝি পথ ভুলি।' মনে হচ্ছিল আমার, সেই মেঘ-মেশানো রঙিন সন্ধ্যা আমার ঘরে নেমে এসেছে।

ডলি সে রাতে আমার ঘরেই থেকে যায়। আমারই শোবার খাটে। আমারই পাশে। এলোমেলো কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে আমি চুপ করে যাচ্ছিলাম। এরকম কোনো নৈঃশব্দ্যের সময় বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল ডলি। বলল—দ্যাখো, আমি কিন্তু কাঠও না পাথরও না, আমি একটা মেয়ে।

—মেয়ে না। তুমি একটা ফুল, তুমি একটা পাখি, তুমি একটা পরী। আমি বলতে গেলাম।

—পরী?—খিলখিল করে হেসে উঠল আবার ডলি। আমি পরী না। দ্যাখো, আমি রক্তমাংসের মানুষ। দেখি তোমার হাত—

আমি আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম।

পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না, সারারাত আমি একটা পরীর পাশে শুয়ে ঘুমিয়েছি।

স্নানাদি করে ডলি যখন বলল—আমার কিছু টাকার খুব জরুরি দরকার—আমি ওকে স্টিলের আলমারি খুলে নিজেই নিতে বললাম। ব্যাগে টাকা ভরে, উঠল ডলি।

—আবার কবে আসবে, ডলি?—আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি। আমার অফিসে যেতে দেরি হবে আজ। ভেতরে একটা অস্থিরতা আছে। তবু জিজ্ঞেস করলাম।

—যখনই তুমি চাইবে—

—তোমার তো কোনো ঠিকানা দাও না। তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব কি করে? তোমার কলেজে যাওয়া কি ঠিক হবে? নাকি কোন হোস্টেলে থাক বলছিলে—সেখানে?

—আমিই যোগাযোগ করব।'

কেন যেন ডলির সংস্পর্শে নিজেকে বোকার মতো মনে হয়। বোকা হয়ে যাই। নির্বোধে পরিণত হই।

ডলি চলে গেল।

* * *

ডলিই একদিন নিয়ে আসে ওর দুই বন্ধুকে। মলি আর রেখা। ওদের তিন বান্ধবীর মধ্যে মলিরই বিয়ে হয়েছে। ছেলেও আছে একটা। স্বামী কি-একটা চাকরি করে।

মলি মেয়েটা সত্যিই সুন্দরী। গৃহিণী। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগ আছে তবু। কিন্তু দেখে বিয়ে হয়েছে মনেই হয় না। দীর্ঘাঙ্গিনী। ওকে দেখলে মনে পড়ে রজনীগন্ধা ফুল আর ডাঁটের কথা। কী সুন্দর! রেখা চাকরি করে একটা গার্মেন্টস কোম্পানিতে।

আমার স্টিলের আলমারিতে এটা ওটা কত কিই-যে জমা পড়েছিল। ওদের প্রত্যেককে একটা করে চমৎকার পারফিউম উপহার দিই। এটা-সেটা। ঝলমলিয়ে ওঠে ওদের মুখ। আমার বাড়িওয়ালি মালিকানির চাকরানিটাকে দিয়ে আমি ওদের জন্য প্রচুর খাবার আনিয়ে দিই। তিনটে মেয়ে তো না, তিনটে প্রজাপতি। তিনটে পরী। আমার ঘরে উড়ে বেড়ায় ওরা। ভেসে বেড়ায়। ডলি ওদের মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো। কিন্তু ওদের কাউকেই নতুন মনে হয় না। আলমারি খুলে একটা হুইস্কির বড় বোতল বের করি।

বলি—দ্যাখো, তিন পরী, তোমরা আজ আমার ঘরে। আমার আজ মহা আনন্দের দিন। উৎসবের দিন। আমি একটুখানি গলা ভেজাব। তোমাদের কারো যদি আপত্তি না-থাকে। কিংবা বিয়ার আছে। বিয়ার নিষ্পাপ। যার বিয়ার খাওয়ার ইচ্ছা, খাও।

ওরা হুটোহুটি করত লাগল।

ইশ, কী তেতো!

ইশ কী গন্ধ! কেন যে এসব মানুষ খায়।

মলি বলল—আমি একটু হুইস্কি খাব।

—আচ্ছা প্রথমবার তো, একটু বেশি করে পানি মিশিয়ে দিই তোমাকে।

মলি বলল—আচ্ছা জামাল ভাই, আপনি এত ভালোমানুষ, কী হয়েছিল আপনার বউয়ের সঙ্গে—

বোঝা গেল, ডলির কাছে ও সব শুনেছে।

ডলি বলল—এসব কথা কি বলছিস, মলি? এসব কথা কেন?

মলি বলল—তাহলে আব্বু বলে ডাকো।

ডলি মলি আমি আমরা সবাই হাসতে লাগলাম।

সেদিন কী যে হৈ-চৈ হলো অনেক রাত অবধি।

কল্পনা করতে পারিনি, পরদিন সক্কালবেলা অফিসে যাবার জন্য যখন রেডি হচ্ছি, মলি এসে উপস্থিত হলো।

দরোজা খুলে অবাক হয়ে গেলাম—তুমি!

—হ্যাঁ, জামাল ভাই, আমি। মলি। একটা দরকারে এসেছি আপনার কাছে।

—আচ্ছা, বোসো আগে। কিছু খাও। তারপর কথা।' অবাক হলেও আমার বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে। এইসব উড়ন্ত পরীদের মতো চাঞ্চল্য থাকলে আমার চলে না। আমি জানি জীবন কত জটিল আর কত বিচিত্র। আমি আর রিনা একবার কিছুদিনের জন্যে একটা টিনের বাড়িতে ছিলাম। প্রচণ্ড এক ঝড়ে একবার সেই ঘরের একটা টিনের চাল উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আমাদের তখন যৌবন। যে আমি গান গাইতে পারি না, সেই আমিও সেদিন চীৎকার করে গান গেয়েছিলাম।

আর ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ভাঙা রান্নাঘরে খিচুড়ি চাপিয়ে দিয়েছিল রিনা। আজ সেই রিনা একই শহরের আরেক প্রান্তে। শুধু কি আমি পতিত হয়েছি? শুনেছি, ওর অফিসেরই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে রিনার বেশ ভাবসাব। কিন্তু তার জন্যেও তাকে আমি দায়ী করি না। সবাই এক অদ্ভুত চাকার মধ্যে ঘুরে চলেছে। চা খেয়ে মলি বলল—জামাল ভাই, কি বলব আপনাকে। আমার হাজব্যান্ড একটা সামান্য চাকরি করে। আড়াই হাজার টাকা মাইনে।

টাকার অঙ্কটা শুনে আমি চমকে উঠলাম।

মলি বলছিল—এই টাকায় এ বাজারে কি করে চলে, জামাল ভাই? আমি কলেজ আই-এ পর্যন্ত পড়েছি। আপনি আমাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দেন। হাজার দুয়েক টাকা হলে চলবে। আমি আর চালাতে পারছি না, জামাল ভাই।

আমি এক মুহূর্ত ভাবলাম। বললাম—দ্যাখো, দুহাজার টাকা তোমার অফিসে যাতায়াতেই লাগব। দেখি আমি, কি করা যায়। আপাতত তুমি এই টাকাটা রাখো। যদ্দিন তোমার একটা ব্যবস্থা করতে না-পারছি, তুমি মাস মাস আমার কাছ থেকে এ টাকা নেবে।

আলমারি খুলে মলির হাতে দুহাজার টাকা ধরিয়ে দিলাম।

কৃতজ্ঞতায় ওর চোখে পানি এসে গেল।

মলি বলল—জামাল ভাই, সকালের দিকে আমার স্বামী অফিসে চলে গেলে আমি ফ্রি থাকি। বাড়িতে একা একা ভালো লাগে না। আপনার এখানে এলে কি আপনি বিরক্ত হবেন?

—একটুও না মলি, আমি খুব একা, খুব নিঃসঙ্গ। সকালের দিকে তুমি আমার অফিসে যাবার আগে এসে গেলে তো এলেই। আমি অফিসে চলে গেলেও তুমি ভেতরে ঢুকে বিশ্রাম নিতে পার। রেডিও শোনো, টিভি দ্যাখো, ক্যাসেট প্লেয়ার বাজাও। তোমাকে আমি আমার ঘরের আলাদা একটা চাবি দিচ্ছি।

—কিন্তু জামাল ভাই, ডলি যেন না জানে। ডলি রেখা ওরা জানলে আমার লজ্জার সীমা থাকবে না।

মলি আর কতক্ষণ বসেছিল? ওকে রিকশা ভাড়ার ভাংতি কিছু টাকাও দিয়ে দিলাম। বাইরে বেরিয়ে মলিকে রিকশা করে তুলে দিচ্ছি, এ পাড়ার বেকার বাউণ্ডেলে কামরুল এগিয়ে এল।

তখনো মলির রিকশা চলতে শুরু করেনি। অর্থাৎ, মলিও শুনতে পেয়েছিল কামরুলের কথা। মলিকে শুনিয়েই কামরুল বলেছিল—জামাল ভাই, রাতে বোধ হয় ছিলেন উনি?

মুহূর্তে আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। কিছু বোঝার আগেই আমার হাতের তীব্র ঘুষি গিয়ে পড়ল কামরুলের ঠোঁটে। ওর কি দাঁত ভেঙে গেল? নাকি ঠোঁট ফেটে গেল? ফিনকি দিয়ে কামরুলের মুখে রক্ত ছুটতেই আমি রিকশাঅলাকে চলতে ইঙ্গিত করলাম।

কামরুলের চিৎকারে ততক্ষণে পাড়ার লোক জমা হতে শুরু করেছে।

সন্ধেবেলা দরোজার ঘণ্টা বেজে উঠল।

মলি কোনো সময় সন্ধেবেলা আসে না। নিশ্চিতভাবে ডলি। ডলি মাঝে মাঝে রাতে এসে থাকে। মলিকে টাকা দিয়ে যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। সকালবেলা কিছু খাবারদাবার, টাকা, হুইস্কি পর্যন্ত বের করে রেখে যাই। মলিতে আলাদা একটা চাবি দিয়েছি। মাঝে মাঝে অফিস-ফেরৎ এসে দেখি, সেগুলো নেই। তার মানে মলি এসেছিল। একটা হাত-চিঠি রেখে গেছে। মাঝে মাঝে অফিসে যাওয়ার আগেই চলে আসে মলি। সঙ্গে তার বাড়িতে বানানো নাশতা। টাকা যখন আবার দিতে গেলাম, মলি বলে—টাকা নিতে আমার লজ্জা লাগে।—লজ্জা ভেঙে যায় অবশ্য একদিন।

দরোজা খুলে দেখি রেখা। আমি নিশ্চিত ছিলাম ডলি। রেখাকে বললাম, এসো।

—অবাক হয়েছেন, না?

—হ্যাঁ। খানিকটা তা অবাক হয়েছি।

—ভেবেছিলাম বোধ হয় ডলি, না হয় মলি।

—তা না।—আমি স্পষ্টত একটু বিচলিত বোধ করলাম।

রেখা আসেনি কখনো। ঐ একদিনই এসেছিল দলবলের সঙ্গে।

রেখা বলল—আমি একটা দরকারে এসেছি, জামাল ভাই।

—বলো।

—আমি যেখানে ছিলাম সেখানে থাকা যাবে না। বোঝেন তো, আমি একজন কুমারী যে-কোনো জায়গায় আমি থাকতে পারি না—মানে সেফ নয়। বুঝতেই পারছেন। আপনার ঐ যে পাশের ঘরটা—ওখানে আমি থাকব। মাসখানেকের মধ্যে ব্যবস্থা করে ফেলব অন্য কোথাও—

হো হো করে হেসে উঠলাম। বললাম—আমাকে তুমি নিরাপদ লোক ভাবলে কি করে?

রেখাও হাসল। বলল—আমার জন্য আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ—আমি জানি। আমি আপনাকে বাবার মতো শ্রদ্ধা করি। আপনি আমার কোনো ক্ষতি করতে পারেন না—আমি জানি।

—বেশ থাকো। পাশের ঘরে থাকো। আমার এই ঘরে কেউ এলে তুমি উঁকি দেবে না কিন্তু।

রেখা সেই থেকে আমার বাসায় থেকে গেল।

মলি একদিন সারা দুপুর থেকে গেল আমার বাসায়। বিকেলবেলা ওকে স্কুটারে তুলে দিয়ে বিশ্রামের জন্যে ঘরে ফিরছি, দেখি মাটি ফুঁড়ে ওঠার মতো তিন-চারজন ঘিরে ধরল আমাকে। কামরুল, মোটর সাইকেল নিয়ে দুর্দান্ত স্বাস্থ্যের ছ'ফিট লম্বা এক লোক, আরো দু'একটা ছোকরা।

মোটরসাইকেলওয়ালাই এগিয়ে এল—জামাল ভাই, আপনার সঙ্গে আমাদের কিছু কথা আছে।

জামাল ভাই, মানে আমার নাম জানে।

বললাম—কি দরকার?

—সেটা কি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলব?

—ঠিক আছে। ঘরে আসুন। দেখি ছিঁচকে চোরের মতো উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে কামরুল। আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম—আসুন, ঘরে আসুন। কিন্তু ওই গাধাটাকে ঘরে আনবেন না।

মোটরসাইকেলওয়ালা বাসায় এল। তার সঙ্গে আরো দুজন। কামরুলকেও ঠেকানো গেল না।

ঘরে ঢুকে ওরা আমার সোফায় বসল। পাশের ঘরে তখনো রেখা। আমি মোটরসাইকেলওয়ালাকে বললাম—আপনাকে তো এদিকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। আপনি কে?

মোটরসাইকেলওয়ালা বলল—আমি মেজর রহিমের ভাই। থাকি রামপুরা।

—রামপুরার লোক এখানে কেন?

—গোলাপবাগ লেন তো আর ঢাকা শহরের বাইরের না। কামরুল আমার ছোট ভাই-এর মতো। আপনি সেদিন ঘুষি মেরে কামরুলের ঠোঁট ফাটিয়ে ফেলেছিলেন। আপনার ঘরে নিয়মিত মেয়েরা আসে। এসব কি অস্বীকার করতে পারবেন?

—মোটেই না। আমার কাছে আত্মীয়-স্বজন আসবেই। দ্বিতীয়ত, আমার মেয়ে-—বন্ধু থাকতে পারে তো? তাই না?

—তা পারে। কিন্তু এটা একটা ভদ্র পাড়াও। এখানে দিন-রাত মেয়েরা আসা-যাওয়া করছে, এটা অশোভন।

আমি ড্রয়িংরুমের দরোজা খোলা রেখেছিলাম। দেখি, পাড়ার একটা ছেলে ঢুকে পড়েছে। আমার চেনা অবশ্য।

—জামাল ভাই, আপনাকে তো পাই না। কখন যান, কখন আসেন। আমাদের পাড়ার ক্লাবে আপনার চাঁদা দিয়ে তারপর আপনি একদিনও গেলেন না। আপনাকে, জামাল ভাই, আমরা সভাপতি বা সহ-সভাপতি হিশেবে চাই।

আমি দেখলাম এই ছেলেও সুযোগ বুঝে ঢুকে পড়েছে।

বললাম—দ্যাখো, ঐসব সভাপতি সহ-সভাপতি আমার পোষাবে না। তুমি একসময় এসে চাঁদার টাকা নিয়ে যেয়ো।

—ঠিক আছে। জামাল ভাই। সালামআলেকুম।

বোঝাই যায়, ছেলেটা এসেছিল পরিস্থিতি যাচাই করতে, সেই সূত্রে কিছু মাল-পানিরও ব্যবস্থা করতে।

ছেলেটা চলে যেতেই মোটরসাইকেলওয়ালা ধমকানি দিল কামরুলকে—যা তুই।

কামরুল তাও গেল না অবশ্য। আরো গুটিশুটি মেরে ঠিকই থেকে গেল।

মোটরসাইকেলওয়ালা বলল, সুর সম্পূর্ণ পাল্টিয়ে—জামাল ভাই, আমাদেরও কিছু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এই যে কামরুল—ও শালার উপাস দিতে দিতে কি অবস্থা হয়েছে, দ্যাখেন।

দ্যাখেন—আমি গম্ভীর মুখে বললাম—আমি একা মানুষ। আমার কিছু ব্যক্তিগত বন্ধু থাকতে পারে না?

—না—না, সে তো থাকতেই পারে। কামরুল তো কিছুই করে না, জামাল ভাই। ওকে হাজার দশেক টাকা দেন—একটা ব্যবসা-ট্যাবসা ধরুক—

কামরুল বলল—সকালের দিকে যে মেয়েটা আসে মিজান ভাই, একেবারে হুরপরী। আলমারি খুলে এক হাজার টাকা বের করলাম। টাকাটা মোটরসাইকেলওয়ালার হাতে দিয়ে বললাম, 'তুমি' করে—তোমরা আমার মাথা ধরিয়ে দিয়েছ। যাও এখন।

* * *

এরকম অপমান জীবনে হইনি, মনে হলো। পাশের ঘরে রেখা—ওরা যদি একবার উঠে ভেতরে যেত, কী হতো বলা মুশকিল। কিন্তু আমি কেন-যে উত্তেজিত হয়ে গেলাম, অন্যভাবে উত্তেজিত, কে জানত। আমি গিয়ে সরাসরি রেখার কাঁধে হাত রাখলাম। আমি ভেবেছিলাম, রেখা হয়তো ভীতকম্পিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপর। কিন্তু তা হলো না। রেখা সরে গেল।

বলল—জামাল ভাই, ডলি আর মলি দুজনের সঙ্গেই আপনার সম্পর্ক আমি জানি। আমি ডলিও না, মলিও না।—আমি রেখা। আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি, বারবার বলেছি, বাবার মতো।

রেখা! রেখা!

আমি রেখাকে ঠিক তেমনিভাবে জাপটে ধরতে গেলাম, যেমন গিয়েছিলাম ডলিকে—যেমন মলিকে। কিন্তু রেখা, ছিপছিপে শ্যামলা পাতলা মেয়েটা একটুও বিচলিত হলো না। যেন ও অনেক নেকড়ে দেখেছে, অনেক হায়েনা। আমার তখন ভেতরে ভেতরে অবাক হওয়ার পালা।

কামরুল বা মিজান যে ওর নখাগ্র স্পর্শ করতে পারত না—এই বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছিল আমার। যতবার রেখার গায়ে হাত রাখতে যাই, ততবার সে সরিয়ে দেয়।

শরীরিণী ডলি নয়, সুদর্শনা মলি নয়, পরীর মতো অধরা থেকে গেল আমার কাছে রেখা-ই। কেউ কেউ শেষ-পর্যন্ত পরীই থেকে যায় ॥

[১৯৯৫]

একদিন

—হাসান মাহমুদ না?

হ্যাঁ, আমারই নাম তো হাসান মাহমুদ। কিন্তু এ কে?

আমার অবাক দৃষ্টি দেখে ভদ্রলোক বললেন—আরে, আমাকে চিনলি না? আমি তারেক। তারেক মনজুর। মনে আছে সেই ১৯৬০ সাল? ঢাকা ইউনিভার্সিটি? আমি পলিটিকাল সায়ান্সে পড়ি, তুমি ইকনমিকসে। হলের ইস্ট হাউজে তুমি, ওয়েস্ট হাউজে আমি। চিনলে না এখনো? খুব অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে হাসিমুখে বলে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক—কোন ফাঁকে আমার হাত তার হাতে নিয়েছেন।

চিনি আবার চিনি না—এরকম মনে হচ্ছিল আমার। নাম বলতেই, পরিচয় দিতেই ছবির মতো সব উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আমার সামনে।

চিনেছি। চিনেছি। চেহারা যতই ভেঙেচুরে যাক, তারেক মনজুরকে চিনব না? ইউনিভার্সিটির চার-পাঁচ বছর এক সঙ্গে কাটিয়েছি যার সঙ্গে? পলিটিকাল সায়ান্সের সেই দুর্ধর্ষ ছাত্র, সেই তুখোড় বক্তা, দুর্দান্ত আবৃত্তিকার, হল-এর বক্তৃতা আর আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় একচেটিয়াভাবে যে সবসময় প্রথম পুরস্কারগুলো দখল করত। কিন্তু এ কী অবস্থা হয়েছে তার?

তারেক মনজুরের চেহারায় জেল্লার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। গাল ভাঙা, চোখ কোটরাগত, রঙ বিবর্ণ। শুধু যখন ঐ তোবড়ানো গালে হাসল, তখন যেন পুরোনো দিনের তারেক মনজুর ঝিলকিয়ে উঠল একবার। হেসে জিজ্ঞেস করল—ইনি বোধহয় ভাবি?

—হ্যাঁ।—বলে আমি পরিচয় করিয়ে দিলাম।—এ তারেক মনজুর, আমার ইউনিভার্সিটি লাইফের বন্ধু।

—সালামআলেকুম, ভাবি। অধমের নাম তারেক মনজুর। এইসব সফল মানুষের পাশে নিতান্তই একজন ব্যর্থ মানুষ। ইতিহাস যাদের নাম লেখে না। তারপর আমার উদ্দেশে বলল—চেহারা যতই চকচকে হোক, ভুঁড়ি যতই হোক, বয়েস তো হয়েছে আমারই সমান। খুব ভালো করেছ পার্কে এসে। এই বয়সে পার্কে এসে একটু জোর কদমে হাঁটাহাঁটি করা উচিত। ভালো করেছ। তোমরা তো ঘেমে গেছ দেখছি, যদি আপত্তি না-থাকে, চলো একটু বসি বিশুদ্ধ ঘাসের ওপর।

রিনা আর আমি সত্যিই অনেকক্ষণ জোরে জোরে হেঁটেছি। তাই ক্লান্ত। আমি রিনার দিকে তাকালাম। ও ঘাড় কাৎ করল। অর্থাৎ বসা যায়।

আমরা একটুখানি হেঁটে ঘাসের ওপরে গিয়ে বসলাম।

তারেক মনজুর বলছিল—সরওয়ার্দি উদ্যানের এদিকটা তো বন্ধ করে দিয়েছে—ওদিকটা বন্ধ কিনা জানি না। তাই দেখছ এই পার্কে কী ভিড়! রমনা পার্কে কোনো দিন এত ভিড় দেখিনি—

—বললাম—তা ঠিক। তবে একটু নজরও দিয়েছে। কিছুদিন আগেও তো কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে এখানে ঢোকা সম্ভব ছিল না। আজেবাজে লোকজন—

আমরা আজই রমনা পার্কে হাঁটতে এসেছি অনেক দিন পরে। সাধারণত আমরা বিকেলে সংসদ ভবনের দিকেই চলে যাই। রোজ তো আর হয় না। সময় পাই যেদিন। ডাক্তার বলেছে প্রতিদিন ৪৫ মিনিট একটানা জোরে হাঁটবার জন্যে। হয় না তাও। রিনারও হাঁটা দরকার। ওরও তো বয়স হচ্ছে।

একটু আগে আমরা দুজন প্যাডেল-চালানো নৌকোয় লেকে চড়েছি। আলাদা একটা নৌকো রিজার্ভ করে। দুটো বাচ্চা ছেলে-মেয়েকে তাদের মা নৌকোয় উঠিয়ে দিয়েছিল। আমরা রিজার্ভ করব বলে নৌকো থেকে ছেলে-মেয়ে দুটোকে নৌকোয় তুলে নিলাম। ওদের মা টাকা দিতে চাচ্ছিল। বলেছিলাম—আমরা তো রিজার্ভ করেছি, আলাদা পয়সা আর দিতে হবে না আপনাকে।

দিনরাত ফাইল আর মিটিং—এসবের পরে এই একটুখানি বৈকালিক নৌকাবিহার খুব ভালো লেগেছিল। গত বছর সরকারি সফরে জাপানে গিয়েছি। এ বছর তো এখন পর্যন্ত বিদেশে যাওয়া হলো না। একঘেয়ে লাগে জীবন।

তবু এই একটুখানি মুক্তি দ্যায়। বিকেলের হাওয়া, পার্কের সবুজ গাছপালা, পার্কের লোকজন—সবই লাগে একটু অন্যরকম।

তারেক মনজুর বলে—তা তোমাদের ছেলেমেয়ে ক-জন?

রিনা কিছু বলার আগে আমি বলি—দুই ছেলে-মেয়ে। দুজনই দেশের বাইরে।

হাসে তারেক মনজুর—ভালো। আদর্শ পরিবার।

—আপনার? রিনা হঠাৎ মেয়েলি কৌতূহলে জিজ্ঞেস করে।

আমার? হাসে তারেক মনজুর। বলে—আমার একটিও না, ভাবি। অনেক বছর প্রেম করে বিয়ে করেছিলাম যাকে, তিনি বছর না-পুরতেই আর-একজনের হাত ধরে চলে গিয়েছিলেন। তারপর আর বিয়ে করার ইচ্ছেও হয়নি।

আমি রিনাকে বললাম—কী যে জিগেস করো। থাক না এসব কথা।

রিনা বলল—বাহ—আমি কী—

—আহা, হাসান। রিনাকে বলছ কী? আমার তো ষাট বছর বয়েস হয়ে এল। এসব বলতে এখন আর খারাপ লাগে না আমার।—বলে তারেক মনজুর।

তারপর বলে—তা হাসান, তোমরা থাকো কোথায়?

—ধানমণ্ডিতে। বলল রিনা।

ধানমণ্ডিতে আমরা পাঁচতলার ফ্ল্যাটে থাকি, সেটা নিশ্চয় তারেক মনজুর এখন আর ভাবতে পারে না। উত্তরায় আমার একটা ছোট দোতলা বাড়িও আছে। গাড়ি তো কবেই হয়েছে।

রিনা জুতো পরে খানিকটা হঠাৎই উঠে দাঁড়াল। বলল—তোমরা এখানে বসছো তো? আমি এক চক্কর হেঁটে আসি।

ভাবি আবার চিনতে পারবেন তো? খানিকটা উদ্বেগ নিয়েই জিজ্ঞেস করল তারেক মনজুর।

রিনা ওর দিকে তাকিয়ে শুধু একটু হাসল। বলল না কিছু।

রিনাকে বললাম—এই যে পামগাছের মতো গাছগুলো—এর পাশেই মাঠে আমরা বসে আছি—বেশি দেরি কোনো না—

ঠিক আছে বাবা, আমি হারিয়ে যাব না। হারিয়ে গেলেও ঢাকায় এখান থেকে এখানে—রমনা পার্ক থেকে ধানমন্ডিতে বাসা চিনে যেতে পারব ঠিকই। আমিও ঢাকা ইউনিভার্সিটির মেয়ে—বলে দ্রুত পা বাড়িয়ে দিল রিনা।

রিনা আড়ালে চলে যেতেই জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা, তোর ব্যাপারটা কি বল্ তো তারেক? তোর এ অবস্থা কেন?

তারেক মনজুর বলল—বললামই তো। আমি তো ভাবির সামনেও কিছু লুকোলাম না। ঊষা আমার সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ করে বিয়ের এক বছর যেতে-না-যেতে চলে গেল যখন, তখন মন ভেঙে গেল আমার। তারপর আর চাকরিবাকরি কিছুতেই মন বসল না রে। জীবনটাই বরবাদ হয়ে গেল। অথচ কী না করেছি আমি ঊষার জন্যে—তোকে দেখলাম বৌয়ের সঙ্গে ধমকে কথা বলতে—আমি ঊষার সঙ্গে জীবনে উঁচু গলায় কথা বলিনি রে—

—এটাই তো ভুল করেছিস। জানিস, আমার কথা না-শুনলে রিনাকে ধরে আমি পেটাই—

—বলিস কী?

—ওটাই তো ভুল করেছিস রে। মেয়েলোককে মাথায় চড়াতে নেই। তুই তো প্রথম থেকেই ঊষার কথায় উঠ-বস করছিস—অত বউ-ন্যাওটা হলে কোনো বউ স্বামীর ঘর করে না—

—তা-ই হবে।—খুব আস্তে আস্তে সূর্যাস্তের শেষ রশ্মির বিস্তারের দিকে তাকিয়ে বলল তারেক মনজুর।

আমি মুখ লুকিয়ে হাসলাম আড়াল করে। বললাম—বাদামআলা-টালা গেল কোথায়?—বলে কথা ঘোরানোর জন্যে এদিক-ওদিক যেন খুঁজতে লাগলাম। হাসব না কেন? তারেক মনজুর শুধু আমার বাইরের দিকটা দেখছে। ভেতরের খবর তো রাখে না। রিনা আমার দ্বিতীয় বউ। আমার দুই ছেলে-মেয়ে, মানে রিনার প্রথম স্বামীর ঔরসজাত একটি ছেলে, আর আমার ঔরসজাত একটি মেয়ে। রিনাকে ধমকাব আমি? রিনার জন্যে আমি উঁচু গলায় কথা বলতে পারি না বাড়িতে। আমার ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন সব আমাকে ছেড়েছে—কেউ আমার বাড়িতে আসে না।

পার্কে আস্তে আস্তে ছায়া নামছিল।

দূর থেকে দেখা গেল, রিনা আসছে ॥

[১৯৯৮]

কে বিদেশি বন-উদাসী

বিকেল হলেই মনটা কিরকম বিষণ্নতায় ভরে যায়। রিনা এসে দাঁড়ায় দোতলার ব্যালকনিতে। তার গানের ওস্তাদ গুল মুহাম্মদ খাঁ আজ আসবেন না। যেদিন তিনি আসেন না, একলা দোতলার ঝুলবারান্দায় এসে দাঁড়ায় রিনা, বাবা অফিস থেকে ফিরে জলখাবার খেয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন, মা সংসারের কাজকর্ম করছেন কিংবা বসে আছেন বাবার কাছেই, একটু পরেই মন্দির থেকে কাঁসরঘণ্টার শব্দ বেজে উঠবে, কোন বাড়িতে কে গান গাইছে হারমোনিয়ামে তার আওয়াজ কিরকম করুণ হয়ে ভেসে আসছে। এরকম বিকেলে পৃথিবীর সমস্ত বিষণ্নতা এসে জমে। নিচের রাস্তা দিয়ে দু'চারজন যাতায়াত করছে। সেদিকে চোখ যায় রিনার। চোখ চলে যায় আকাশে, যেখানে রোদ পড়ে আসছে। হালকা শাদা মেঘ, শাদা মেঘ না—যেন নীল আকাশই ভেসে চলেছে। যখনই বিকেলবেলা একা একা এরকম বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে রিনা, ওস্তাদ আসেন না কিংবা রেওয়াজ করতে ইচ্ছে হয় না, মনটা কেমন যেন বিষণ্ন রঙে ভরে যেতে থাকে।

সেদিনও বিকেলে ব্যালকনিতে একা একা দাঁড়িয়ে থেকে মনটা খামাখাই খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ দ্যাখে কি, ঠিক তাদের বাড়ির দরোজার সামনে এসে দাঁড়াল একটা ফিটন।

কে এলো আবার এখন? সচকিত হয়ে উঠল রিনা। ভুলে গেল বিষণ্নতার কথা। একদৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে দরোজা খুলে দিল।

স্বাস্থ্যবান সুদর্শন একজন, একমাথা বাবরি চুল কমলা রঙের পাঞ্জাবির ওপর গেরুয়া রঙের চাদর সামলাতে সামলাতে বলতে গেলে রিনাকে এরকম ঠেলেই ঘরে ঢুকে পড়ল। কে রে বাবা এই লোক? লোকটির দিকে তাকাচ্ছে আর ভাবছে রিনা।

তার আগে লোকটা বলে উঠেছেন—এই তুমি রিনা না? নিশ্চয় তুমি রিনা। তুমিই তো মন্টুর ছাত্রী। তাই না?

মন্টু মানে দিলীপদা, দিলীপকুমার রায়। ভদ্রলোক দেখি আমার নাম জানেন, দিলীপকুমার রায়কেও চেনেন।

ধড়াস করে উঠল রিনার বুক। তবে কি ইনিই তিনি? হ্যাঁ তা-ই হবে। কে যেন বলছিল, উনি ঢাকায় এসেছেন। রিনা বলতে গেল 'আপনি কি, আপনি কি'। হাসল ভদ্রলোক খোলা হাসি। বলল—আমি নজরুল। নজরুল ইসলাম। কবিতা লিখি আর গান গাই। চেনো তুমি আমাকে?

চিনব না? কী বলে। ভাবল রিনা। চিনব না? সারা বাংলাদেশ মাতিয়ে রেখেছে তিনজন—সুভাষ বোস, দিলীপ রায় আর এই নজরুল। একে চিনব না? বলে দ্যায়নি কেউ। তবু তো কিভাবে যেন চিনে ফেলল একে। এ নজরুল ইসলাম না-হয়ে যায় না। রিনা লাজুক কিন্তু অবাক চোখে লোকটিকে লক্ষ্য করল দারুণ কৌতূহলে। সুভাষকে চোখে দ্যাখেনি। এই সেদিন দিলীপদা নিজে এসেছিলেন, টিকাটুলির রেণুকাকেই শুধু গান শেখাননি, ওয়ারির রিনাকেও গান শিখিয়ে গেছেন—আর তার মধ্যে ছিল নজরুলের লেখা কয়েকটি গানও। আর এখন কী আশ্চর্য—স্বয়ং নজরুল তাদের ঘরে তাদের বাড়িতে। এ বিস্ময় কি সওয়া যায়?

লাজুক অবাক চোখে তাকিয়ে রিনা দেখে নিল মানুষটাকে। সত্যিই রূপবান। দিলীপদা এক ধরনের সুন্দর, ইনি আরেকরকম। বড় বড় কালো টানা চোখ, তার মধ্যে একটুবা লাল ছিটে, এলোমেলো ঘন বাবরি চুল, তীক্ষ্ণ নাক, ঘষা তামার মতো রঙ। আর কমলা পাঞ্জাবি আর ধুলোয় লুটিয়ে-পড়া গেরুয়া চাদরে মানিয়েছেও বটে মানুষটাকে। কিন্তু দেখার কি উপায় আছে? হৈ হৈ করে উঠল নজরুল—এই যে তোমার বাবা-মাও এসে গেছেন। আসুন, আসুন।—রিনার মনে হলো যে এটা নজরুলেরই বাড়ি, বাবা-মা বেড়াতে এসেছেন—এম্নিভাবে আপ্যায়ন করছে নজরুল।

কথা বলতে বলতে নজরুল বসবার ঘরে রাখা তক্তপোশের ওপরে বসে পড়ল।

রিনার বাবা বললেন—কবে এলেন ঢাকায়?

—এই তো দু'দিনও হয়নি। হঠাৎই এলাম। আমরা সব দল বেঁধে খেলা দেখতে গিয়েছিলাম গড়ের মাঠে। ভালো লাগল না, মানে খুবই ভালো লাগল। তাই শিয়ালদা স্টেশনে টিকিট কেটে হঠাৎই চলে এসেছি। আমি, নেপেন আর দীনেশ। নেপেনকে চিনেছেন তো?—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। আর দীনেশ কল্লোল-এর সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ—নজরুল বলে।

রিনার মা বললেন—খুব ভালো হয়েছে। আপনি মুসলিম সাহিত্য সমাজের অনুষ্ঠানে ফেব্রুয়ারিতে এসেছিলেন, আমরা তখন যেতে পারিনি। এবার দিলীপ খুব বলছিল আপনার কথা।

নজরুল বলল—হ্যাঁ, আপনাদের সব কথা আমি শুনেছি মন্টুর কাছে। আমার এক বন্ধু আছে, কাজী মোতাহার হোসেন, সেও তো চেনে আপনাদের খুব ভালো করে। আমি ওর ওখানে উঠেছি। বর্ধমান হাউসে। তা আমি আসার পর থেকেই মোতাহারকে বলছি, চলো রিনার গান শুনে আসি, তা ওর সময়ই হয় না। প্রফেসর মানুষ তো, সারাক্ষণ ব্যস্ত। এই ক্লাস, এই কোন্ ছাত্র আসার কথা, কখনো বইয়ের ভেতরে খুব গুঁজে আছে তো আছেই। শেষে দেরি না করে নিজেই চলে এলাম।

দিলীপের মা বললেন—খুব ভালো করেছেন। চলুন ওপরে দোতলায়। রিনার গান শুনবেন। আর রাত্তিরে না খেয়ে যেতে পারবেন না কিন্তু।

—হ্যাঁ, চলো রিনা, চলো। তোমার গান শোনার জন্যে ভেতরটা চাতক পাখির মতো হয়ে আছে।—কোনো কিছুতেই যেন নজরুলের তর সয় না।

সবাই মিলে দোতলায় এসে জাজিমের ওপর বসা গেল। বেরুল হার্মোনিয়ম। দিলীপদার কাছে শোনা নজরুলের গান একটার পর একটা গাইতে লাগল রিনা। যার গান, যার সুর তাকেই শোনানো, তাকেই নিবেদন করা—রিনার মনে হচ্ছিল সে যেন ঠাকুরের সামনে পুজোয় বসেছে। এখানে সমস্ত সমর্পণ করতে হবে, কিছুই হাতে রাখা চলবে না। শুদ্ধ পবিত্র পূজারিণীর মতো নিজেকে একথালা বহুবর্ণময় সুগন্ধি ফুলের মতো, গানে গানে চলল রিনার আত্মনিবেদন। প্রথমেই গাইল কে বিদেশি বন-উদাসী গানটা। এই গজলগানের রণনকণ্বনে সন্ধ্যায় ওয়ারি অঞ্চলটা ভরে উঠল যেন। রিনা যখন গাইল 'ভোরগগনের দর-দালানে/দর-দালানের ভোর গগনে।' নজরুল বলে উঠছে, 'অভোলোন! অভোলোন!' আবার যখন গাইল, 'মালিকাসম বঁধুরে জড়ায়/বালিকা-বধূ সুখ-স্বপনে'। নজরুল চেঁচিয়ে উঠল, 'অভোলোন! অভোলোন!'

রিনা অবাক। রিনার বাবা-মা অবাক। এ আবার কিরকম ছেলে, সারাক্ষণ হাসছে, আনন্দ করছে, গাইছে। অপরূপ অদ্ভুত। কোনোরকম সংকোচের বালাই নেই। রিনার বাবা-মা নিজেরাও সংগীতপিপাসু। ঢাকার গানের আসর কোন্‌টাই বা তাঁরা বাদ দেন? রিনার বাবার যখন অফিসিয়াল ট্যুর থাকে ঢাকার বাইরে, তখন তো বাদ দিতেই হয়। পারতপক্ষে গানের আসর তাঁরা বাদ দেন না। ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল, হেমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বাড়িতে, জমিদার রূপবাবুর বাড়িতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে কি যেখানেই হোক—তরুণী গায়িকা মেয়েকে নিয়ে ওঁরা ঠিকই উপস্থিত হয়ে যান।

রিনার মা সরযুবালা দেবী একবার নজরুলকে গান গাওয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন। রিনাও একটু যোগ করল—হ্যাঁ কাজীদা, আপনার কণ্ঠে আপনার গান—

নজরুল আর দেরি করলেন না। হাসিমুখে হার্মোনিয়ামটা টেনে নিয়ে গেয়ে উঠলেন, 'এ আঁখিজল মোছো পিয়া ভোলো ভোলো আমারে।' তারপর একটার পর একটা 'কি হবে জানিয়া বলো কেন জল নয়নে,' 'বসন্ত মুখর আজি', 'এল বরষা শ্যাম সরসা।'

সরযূবালা দেবী একবার উঠে গেলেন জলখাবারের ব্যবস্থা করবার জন্যে। গান চলতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর সরযূবালা দেবী এলেন। পেছনে জলখাবারের থালা হাতে রিনাদের যুবতী পরিচারিকা ক্ষান্ত। একটুখানির জন্যে রিনার বাবাও উঠে গেছেন। নজরুল গল্প করছে। গল্প কি। রিনাকে বলছে, কলকাতা যাবার জন্যে। কলকাতায় না-গেলে তার এরকম কণ্ঠের আদর ও সম্মান কে করবে।

ক্ষান্ত ঘরের মধ্যে ঢুকে কমলা পাঞ্জাবি, গেরুয়া চাদর আর ধুতিপরা বাবরি চুল নজরুলকে দেখে বলে উঠেছে—ওমা, এ যে দেখি এক্কেবারে কালো কেষ্টঠাকুর।

হা-হা করে হেসে উঠল নজরুল। ক্ষান্তর দিকে তাকিয়েই বলল—দাঁড়াও, আমার কালো রূপের জন্যে খোঁটা দিচ্ছ—কালই এর জবাব দেবো—

রিনা, সরযূবালা দেবী ওরাও হাসছিলেন। হাসি থামলে রিনা বলল—ভালোই তো হলো কাজীদা। আপনার কাছ থেকে এবার আরেকটা দারুণ গান পাওয়া যাবে।

লোকটার নিঃসঙ্কোচ ভাবের ছোঁয়াচ লেগেছে কি রিনার মনেও? রিনার মনে হচ্ছে, নজরুল যেন কত দিনের চেনা। নজরুলের কবিতা, গানের সঙ্গে চেনা ছিল তো আগেই, দিলীপদা আরো একটু চিনিয়ে দিয়ে গেছে, এখন মানুষটা নিজেই উপস্থিত। এত খোলামেলা, এমন প্রাণবন্ত উচ্ছল একটা মানুষ হতে পারে।

বাড়িসুদ্ধ সবাই যেন একটা জোয়ারে ভেসে যাচ্ছিল।

প্রথম দিনই রিনাদের বাড়ি থেকে বেরুতে নজরুলের রাত দশটা বেজে গেল।

আশ্চর্য, পরদিন সকালবেলাই নজরুল রিনাদের বাড়িতে চলে এসেছে আবার।

কী ব্যাপার? না, ক্ষান্তর একটা জবাব না দিলেই নয়।

কাল রাতেই একটা কীর্তন ধাঁচের গান লিখেছে নজরুল। সে গানটাই শোনাতে আর শেখাতে এসেছে। 'কেন প্রাণ ওঠে কাঁদিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া গো।' গাইতে গাইতে নিজেই বিভোর হয়ে যাচ্ছে নজরুল : 'আমি বধূর রূপের ছায়া বুকে ধরি/ আকাশ আরশি নীল গো/বহে ভুবন প্লাবিয়া কালোরে ভাবিয়া/কালো সাগর সলিল গো।'

নজরুল বারবার গেয়ে গেয়ে রিনাকে শিখিয়ে দ্যায়। রিনা ভাবে, এমন সদ্য-সদ্য লেখা গান কবির কাছ থেকে সে নিজেই শিখে নিতে পারবে এ কি কখনো ভেবেছে সে, এসব বহু পূর্বজন্মের তপস্যার ফল।

কিন্তু একটু একটু হিংসাও কি হয় না?

জিগেস করে—আচ্ছা, কাজীদা, আপনি কাকে কাকে আর গান শোনাচ্ছেন বলুন তো?

নজরুলও কি একেবারে হিংসার অতীত? বলে—টিকাটুলির রেণুকাকে তো মন্টুই দখল করে ফেলেছে। রেণুকা কিন্তু দারুণ গেয়েছে—পাগলা মনটারে তুই বাঁধ। তা আমি বলেছি পরিষ্কার—আমি একবার ঢাকায় যাই না, রেণুকার চেয়ে ভালো গাওয়াব।

রিনা হাসে—দিলীপদাকে আপনার হিংসা হয়?

নজরুল শিশুর মতো সরল। সোজা বলে—হয় তো। গানে ওর কী অসাধারণ দখল। ভাষাই জানে কতগুলো। গলা কী! মন্টুকে হিংসা হবে না? কিন্তু তোমাকে বলি বলি রিনা মন্টু যে এত বড় সংগীতজ্ঞ সে, কিন্তু আমার গান প্রচার করে চলেছে, আমার গান সম্বন্ধে এর খুব উঁচু ধারণা—

রিনা বলে—মন্টুদা তো শুধু নজরুল নজরুল করে। বলে, নজরুলের মতো গান কেউ লিখতে পারে না, ওর মতো সুর কেউ দিতে পারে না, বলে ও একটা জিনিয়াস।

নজরুল বলে—তাই নাকি? দে গোরুর গা ধুইয়ে।

রিনা বলে—কাজীদা, আপনি আর কাকে গান শেখান, বলবেন না কিন্তু কাকে আর।

নজরুল হাসে—তোমাকে শেখাই। শেখাই মিস বদরুননেসার বোন কামরুননেসাকে। বদরুননেসাকে চেনো তো? অঙ্কো মুসলমান মেয়েদের মধ্যে

প্রথম এমএসসি। আর তোমার ঝর্না চক্রবর্তীকে, ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল হেমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর একমাত্র মেয়ে।

—ঝর্নাদি? রিনা বলে—ঝর্নাদিকে চিনব না কেন? ঐরকম রূপ আর গুণ ঢাকা শহরে আছে আর কার?

—আছে। আছে। শোনো, শোনো, একটা গান তোলো তো। আমার কোন কুলে আজ ভিড়লো তরী এ কোন সোনার গাঁয়—

একটা কাগজে নিজেই বড় বড় মুক্তোর মতো হরফে নজরুল লিখতে লাগল। লিখছে আর বলছে নজরুল—এই রিনা, এসো এসো, শিগ্‌গির তুলে নাও। তা নাহলে পালিয়ে যাবে। জানো, আমার গানের কথা আর সুর—ওরা সব বনের হরিণ। একটুতেই ওরা ছুটে পালায়। আমি চাই ওদের শব্দে সুরে বন্দী করে রাখতে। পালাল, পালাল। শিগগির হার্মোনিয়ম নিয়ে এসো—

এই সময় ঢুকলেন সরযূবালা দেবী। হাতে একটা বড় চায়ের কেতলি। পেছন পেছন জলখাবার নিয়ে ক্ষান্ত নামের সেই যুবতী পরিচারিকা।

সরযূবালা বললেন—কালই বুঝেছি, আপনি খুব চা খান। তাই কেতলি ভরে চা নিয়ে এসেছি।

নজরুল বলে উঠল হাততালি দিয়ে—এত চা—ঐটুকু কেতলিতে—আপনিই তার গলায় লাগল একটা সুরের ঝংকার।

২

ক'দিন পর সকালবেলা বেশ ভোরবেলাই রিনাদের ওখানে এসে পড়ল নজরুল। বলল—হেঁটেই চলে এসেছি, সকালবেলা মর্নিং ওয়াক হয়ে গেল আপনিই।

—খুব ভালো করেছেন। রিনা তো রোজ সকালবেলা মানুষটার অপেক্ষাতেই থাকে। ইতোমধ্যেই এই ক'টি দিনেই ঢাকা শহরে মানুষটাকে নিয়ে কতরকম গুজব। বদরুননেসাকে নিয়ে। ঝর্নাদিকে নিয়ে। তার কিছু কিছু কানে এসেছে রিনারও। ঢাকা শহর আর কতটুকু। এরকম একটা মানুষকে নিয়ে গুজব রটলে কানে না এসে পারে।

কিন্তু যে মানুষটাকে নিয়ে গুজব সে মানুষটা তো আদ্যোপান্ত ভালো। কাজী মোতাহার হোসেনের দুই মেয়ে জোবায়দা ওবায়দাকে নিয়ে একদিন হাজির। ঐটুকু বাচ্চা মেয়েদের নিয়ে কী হুল্লোড়। তারাও নজরুলের অন্ধ ভক্তে পরিণত হয়েছে। নজরুল কোলে কাঁখে নিয়ে ছুটছে ওদের। গান লিখেছে ঢাকাইয়া ভাষায়। সেই গান শুনতে শুনতে বাড়িসুদ্ধু সব হাসতে হাসতে অস্থির : 'আজকে হইব মোর বিয়া... তাইরে নাইরে নাইরে না...। রইমু ঘরে বাইরে না।... কাইল আইমু বউ লইয়া/ থাকবি তরা ফ্যালফ্যালায়া। 'আর যে গান গাইছে সেই নজরুল তো নিজেই হেসে কুটিপাটি। বাচ্চাদের নিয়ে এসেছে বলে সেদিন আর নজরুল দেরি করে না। শুধু রিনাকে বলে যায়—জানো, সেই যে সেদিন মাসীমা কেতলিতে চা ভরে এনে

দিলেন, আর আমি বলে উঠেছিলাম, এত চা! ওরই সুর ধরে একটা গান লিখে লিখেছি : এত জল ও কাজল চোখে...।'

শুনে রিনা তো থ। এ কি আশ্চর্য মানুষ! কী অসাধারণ সৃষ্টিক্ষমতা! আর গানটাও কী অসাধারণ সুরে ও কথায়। নজরুলের কাছ থেকে কথা আদায় করে নিল পরদিনই এসে তাকে গানটা শিখিয়ে যেতে হবে। সেদিন নজরুল হাসতে হাসতে সেই যে বিদায় নিল, পনেরো দিনের মধ্যে আর দেখা নেই। রিনা একবার শোনে নজরুল মুসলিম-সাহিত্য-সমাজের ছেলেদের সঙ্গে হুল্লোড় করে বেড়াচ্ছে। কখনো শোনে নজরুলকে *প্রগতি* পত্রিকার বুদ্ধদেব, অজিত দত্ত, অমলেন্দু বসু, অচিন্ত্যকুমাররা ধরে নিয়ে গেছে তাদের আড্ডায়—বুদ্ধদেব বসুর পুরানা পল্টনের বাড়িতে। কখনো শোনে, হাকিম হাবীবুর রহমানের বাড়িতে এক জলশায় গেছেন। জমিদার রূপবাবুর বাড়ি মাতিয়ে দিয়েছেন গানে গানে। প্রেমের গুঞ্জনও কি একটু-আধটু শোনে না? বদরুননেসার প্রেমে নাকি ডুবে আছে নজরুল। এই মেয়েটার নামই শুনতে পারে না রিনা। খুব মেধাবী মেয়ে বুঝলাম। কিন্তু ওর ডিপার্টমেন্টের হেড-এর সঙ্গে অত মাখামাখি কেন? শোনা যায় ঝর্নাদির কথাও। ঝর্নাদিকে গান শেখাচ্ছেন নজরুল। ঝর্নাদির বাবা প্রিন্সিপাল হেমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী খুব রুচিশীল মানুষ। নজরুলকে তিনি খুব স্নেহ করেন। ওদিকে ইউনিভার্সিটিতে ছেলেরা বেরিয়ে যাচ্ছে মোহিতলালের ক্লাস থেকে—নজরুলের গানের আসরে কিংবা বক্তৃতা বা আবৃত্তির জায়গায় ছুটছে দল বেঁধে। শহর তোলপাড়।

কিন্তু পনেরো দিন পরে মানুষটা যখন এল রিনাদের বাড়িতে, তখন কে বলবে নজরুল এতো হৈ-চৈ বাধিয়েছে এ ক'দিন।

খুব অভিমান হয়েছিল রিনার। ভেবেছিল ভালো করে কথাই বলবে না। কিন্তু ঐ মানুষের ওপর কি অভিমান করা যায়! কুৎসাও কি কম শুনেছে—অনুচ্চার্য সব কুৎসা! মানুষটাকে দেখে সেসব কল্পনা করা যায় না। বোঝা যায়, সবই বানানো।

নজরুলকে সেদিন কেমন-যেন অন্যমনস্ক মনে হলো রিনার।

সে কথা বলেই ফেলল—কাজীদা, আজ আপনার মুড নেই।

—না। মুড নেই, তা না রিনা। এরকম হয় আমার মাঝে মাঝে। কেন হয় জানি না। হঠাৎ মনে হয় এত সব হৈ-চৈ, এতসব আড্ডা, এতসব লেখালেখি—সবই খামোখা। কোথাও একটা শূন্যতা যেন আমার সামনে অজ্ঞাতসারে ওৎ পেতে আছে। তোমরা সবই মনে করো আমি খুব আমুদে মানুষ, খুব হুল্লোড়ে। বাইরে থেকে আমি তা-ই। কিন্তু আমি পরিষ্কার দেখতে পাই আমার সামনে পথে এক নিঃশব্দ গহ্বর। আর জানো, আমার কি ভয় হয়? মনে হয়, আমি সেই আমার গহ্বরের ভেতরে পড়ে যাব। আমি তখন চুপ করে যাই।—নজরুল বলে যাচ্ছিল।

রিনা এই আরেক নজরুলের কথা অবাক হয়ে শুনে যায়।

নজরুল বলছিল—জানো, সত্যেন বোসের সঙ্গে কথা হচ্ছিল সেদিন মহাবিশ্ব সম্পর্কে। বৈজ্ঞানিক মানুষ। ও অবাক হয়ে গেছে আমার কৌতূহল দেখে। জানো,

কাল সারাদিন কি করেছি? রমনা লেকের ধারে গিয়ে বসেছিলাম। কী যে অপরূপ লাগছিল। জানো, আমি মাঝে মাঝে একা একা চুপ করে বসে থাকি রমনা লেকের ধারে গিয়ে।

রিনা আঁৎকে উঠে বলল—ওখানে কিন্তু সাপ-টাপ আছে খুব।

—ও কিছু না। হাসল নজরুল—তোমাদের ঢাকা, তোমাদের পূর্ব বাংলা যে কী মায়াময়, কী অদ্ভুত সুন্দর তা তোমরা খেয়ালই করো না, রিনা। তোমাদের এই ওয়ারি থেকে বুড়িগঙ্গা কদ্দুর? মাঝে মাঝে যাও তো নিশ্চয়। গিয়ে দ্যাখো তো বুড়িগঙ্গা এখনো কত তরুণ, কত প্রাণবন্ত। এইসব নদী উদ্ভিদ পাখি সবই থাকবে—শুধু থাকব না আমি।

তারপরই আচমকা নজরুল আবার যেন প্রাণ ফিরে পেল। বলল—এসো গান করো। হার্মোনিয়ম বের করো। চলো আমিও গাইব। মাসীমাকে বলো চা দিতে, বাটাভরা পান দিতে।

আবার শুরু হয়ে গেল গান হাসি হুল্লোড়। বিকেলবেলা রিনার বাবা ফিরে আসার পরে তাঁকে চা জলখাবার দিয়ে সরযূবালা দেবী বললেন—দ্যাখো। আমার কেমন যেন ভয় হচ্ছে, পাশের বাড়িতে ফিসফিস করে কি যেন ষড়যন্ত্র করছিল মনে হচ্ছিল। যেন নজরুলকে নিয়ে আলোচনা করছে মনে হলো।

রিনার বাবা কথাটা গায়েই মাখলেন না। বললেন—দুর, তোমার যত—ওসব কিছু না—

রাত দশটার দিকে নজরুল যখন উঠল, সরযুবালা দেবী বললেন—তুমি বাবা একটু সাবধানে যেয়ো।

নজরুল কেবল একটু বসল। তারপর বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরই মোড়ের দিকে কোলাহলের শব্দ শোনা গেল। রিনার বাবা যা পরেছিলেন, সেভাবেই বেরিয়ে গেছেন।

একটু পরেই রক্তাক্ত নজরুলকে ধরে নিয়ে আসছেন তিনি, দেখা গেল। পাথর হয়ে গেল রিনা।

নজরুল তখনো হাসছিল। ওর হাতে একটা লাঠি দিয়ে ওরা নজরুলকে মেরেছিল। নজরুল বলল—কী যে অশ্রাব্য কথা বলছিল ওরা। বলছিল, দিলীপ রায়ের টাক-মাথাটা ভাঙতে পারিনি, এ শালার মোসলাকে শেষ করব।

সে-রাতে একফোঁটা ঘুমোতে পারল না রিনা।

তিন

মাকে নিয়ে কলকাতায় এসেছে রিনা। এসেছে গ্রামোফোন কোম্পানিতে গান রেকর্ড করতে। নজরুলের সঙ্গে দেখা না হয়ে পারে? ভারি একটা বহুদিনের গোপন ইচ্ছে নজরুলের স্ত্রীকে দেখবার। শুনেছে, নজরুলের স্ত্রী অসুস্থ। তাতে কী। শুধু একবার দেখবে। কেন-যে এই দেখবার দুর্বার গোপন ইচ্ছা তার, তা সে নিজেও জানে না।

বলেই ফেলল নজরুলকে। নজরুলের সংস্পর্শে এলেই যেন তারও নজরুলের মতোই সাহস বেড়ে যায়। বলল—কলকাতা এসে বৌদি আর আপনার ছেলেদের দেখব না একবার?

নজরুলের মুখ কিরকম হয়ে গেল—যা কখনো হয় না। তারপর যেন জোর করেই বলল—ঠিক আছে—চলো।

একটা বাড়ির দোতলায় সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল এরা। নজরুল, রিনা সোম আর সরযূবালা সোম।

সামনের ঘরে বাচ্চা একটা ফুটফুটে ছেলে নজরুলকে দেখে বলে উঠল—এই যে কাজীদা, ছিলে কোথায়?

খিলখিল করে হেসে উঠল রিনা। সরযূবালা দেবীও। নজরুলও হাসছে। রিনার দিকে ফিরে বলল—দ্যাখো অবস্থা। তারপর ছেলের দিকে চেয়ে বলল—এই দুষ্টু, বাবাকে কাজীদা বলে নাকি? বলবে, বাবা, বাবা।

ছেলে বলল—ঠিক আছে, কাজীদা।

আবার হেসে উঠল সবাই।

প্রমীলার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে নজরুল। কোত্থেকে ছুটে এলেন তার শাশুড়ি। বললেন—খবর্দার নুরু। দুলির অসুখ। ও ঘরে তুমি ঢুকবে না। ওদের দিকে ফিরেও তাকালেন না।

নজরুলের মুখ কালো হয়ে গেল।

রিনাকে আস্তে বলল—চলো, যাই।

রিনার মেয়েলি চোখ ততক্ষণে একঝলক দেখে নিয়েছে ঘরের ভিতরটা। মেজেতে শুয়ে এক শ্যামলা নারী, যার চোখ দেখে বোঝা যায় কেন নজরুল তার প্রেমে পড়েছিল।

ঢাকার কথা একবার না জিজ্ঞেস করল নজরুল, না তুলতে পারল রিনা। একবার জানোয়ারদের পক্ষ নিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করাও হলো না।

চার

তারপর কত কত বছর চলে গেছে। রিনার গান রেকর্ডের পর রেকর্ড হয়েছে। আকাশবাণীতে গেয়েছে কতবার। মুম্বাই-এর গানের অফার ছেড়ে দিয়েছে। গায়িকা রিনা সোম এখন আর কোথাও নেই। এখন আছেন বিখ্যাত লেখিকা বিভা চট্টোপাধ্যায়। সব বিখ্যাত পত্রিকায় বিভার লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সব বিখ্যাত প্রকাশনাসংস্থা থেকে বিভা চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। লেখিকা বিভা চট্টোপাধ্যায় এখন বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল তারকা।

এখন তিনি কলকাতার অধিবাসিনী। একাধিক বাড়ি, একাধিক গাড়ির মালিক, তাঁর স্বামী শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় পশ্চিম বাংলার এক বিখ্যাত শিল্পপতি। স্ত্রীর গৌরবে গর্বিত।

ঢাকা রেডিওর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চলেছেন। স্টেশনে এসে বিভা চট্টোপাধ্যায় দ্যাখেন, নজরুল ইসলাম যাচ্ছেন। আগেই তিনি জানতেন। কিন্তু দেখা বহু বছর পরে। নজরুলের সঙ্গে আরো কয়েকজন গায়ক-গায়িকা। কিন্তু একি চেহারা হয়েছে নজরুলের! মাথার বাবরি চুল অন্তর্হিত, শরীরটা থলথলে হয়ে গেছে, চাউনিও কিরকম যেন।

কাছে এগিয়ে গেলেন বিভা চট্টোপাধ্যায়। বললেন—কাজীদা, আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমি রিনা, ঢাকার রিনা। সেই ১৯২৮ সালে দেখা হয়েছিল প্রথমবার—ঢাকার ওয়ারিতে ছিল আমাদের বাড়ি।

নজরুল বললেন—ও। ভালো আছেন?

স্তব্ধ হয়ে গেল বিভা চট্টোপাধ্যায়। কী পছন্দই না করতেন নজরুল রিনার কণ্ঠে তাঁর গান! ঢাকায়, কলকাতায় কত গানই শিখিয়েছেন তাঁকে নজরুল। চুচুঁড়ায় রিনার পিসেমশাই-এর বাড়িতেও কতবার চলে গিয়েছেন নজরুল, থেকেছেন, সেখানেও গান লিখেছেন, গান শিখিয়েছেন তাঁকে।

আজ নজরুল তাকে ভালো করে চিনতেই পারলেন না?—গভীরভাবে আহত হলেন রিনা অর্থাৎ বিভা চট্টোপাধ্যায়।

ট্রেন যখন ঢাকার উদ্দেশে চলতে শুরু করল, তখন নজরুলের উল্টো দিকে বসে থেকে রিনা অর্থাৎ বিভা চট্টোপাধ্যায়ের মনে হলো—নজরুল ইসলামকেও কি তিনি চিনতে পেরেছিলেন কোনোদিন?

[১৯৯৬]

প্রবেশ

১

স্টেশনে যখন এসে পৌঁছোল কাসেম, তখনো রাত্রি ন-টা বাজেনি। কমলাপুর স্টেশন মার্কারির শাদা আলোয় দিনের মতো উজ্জ্বল, একখণ্ড বহুকৌণিক বিশাল শাদা কাচের মতো ঝলমল করছে। এত বিরাট! বিশাল! ছাদ গম্বুজের মতো উঁচু। তার নিচে নিজেকে খুব ছোট মনে হয়। আর মনে হয় সমস্তটাই অচেনা। আশ্চর্য! ঢাকা শহরে আছে কোন্ ছোটবেলা থেকে, এর কোনো কোনো রাস্তা একদম চেনা; আর এই স্টেশনকে এক বিদেশি দূতের মতো মনে হয়, যে এখানে থেকেও এখানে নেই। আশ্চর্য! এই চিরচেনা শহরের জন্যে কী মায়া লাগছে ওর। কিন্তু, এখন মনে হচ্ছে, এর কত গলি এখনো অনাবিষ্কৃত, এর শরীরের কত রহস্য এখনো উন্মোচন করা হয়নি। মনে হয়, এই শহরটা এখনো কুমারীই রয়ে গেছে—আবাল্য তার সঙ্গে ঘর করার পরেও।

বেবি-ট্যাক্সি থেকে নেমে স্টেশনের এই বিশাল হাঁ-য়ের মধ্যে ঢোকে কাসেম। সঙ্গে তার ভাইয়া। তুলে দিতে এসেছে ছোট ভাইকে। টিকিট আগেই কাটা আছে। রিজার্ভ করা। ভাইয়াই টিকিট কেটে দিয়েছে। বাড়ি ছেড়ে এই প্রথম বাইরে যাচ্ছে। বড় ভাই এসেছে তো সেই দায়িত্বেই।

ভাইয়ার কাছে কৃতজ্ঞ কাসেম। জীবনের একটা কি দরোজা খুলে যাচ্ছে না আজ তার জন্যে? এম. এ. পাশ করার পরেও ঘরেই শুয়ে-বসে থাকত কাসেম। প্রায় কিছুই করার নেই ভঙ্গিতে। আশ্চর্য, সে না এ যুগের ছেলে? তবু জীবন তো বইএর পৃষ্ঠা নয়, জীবনের মতো মানুষের বৈচিত্র্যেরও তো শেষ নেই কোনো। তা নাহলে সে যে কোনোদিন স্পষ্ট করে ভাবেইনি এম. এ. পাশ. করার পর তাকে চাকরি করতে হবে। হ্যাঁ, এ যুগের ছেলে হলেও সে তা একবারও ভাবেনি। এম. এ. পরীক্ষা দিয়েই যখন কাসেমের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা এদিক-ওদিক চাকরির মায়াবী পাশে ঝপাঝপ আবদ্ধ হতে লাগল—কাসেমকে তখন হঠাৎ মনে হতো যূথভ্রষ্ট হরিণের মতো। এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথাটাই যেন বন্ধুদের সঙ্গে কোনোদিন আলোচনা করা হয়নি।

সংসার তাদের খুব একটা সচ্ছল, মসৃণ বা তৈলধারার মতো নয়। কিন্তু তারই মধ্যে সমস্ত ঝড় আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছিলেন বোধহয় আব্বা তার। সেজন্যে ছেলেমেয়েদের গায়ে বাতাসের দমকাও লাগেনি বুঝি। আর, যে-টুকু-বা লাগতে পারত, তা-ও হয়নি ভাইয়ার কল্যাণে—বড় হয়ে গিয়েও ভাইয়া তাকে এমন ভাবে

সুনজরে রেখেছিল যাতে এম. এ. পাশ করার পরে বাড়ি বসে থেকে থেকে কাসেম সমস্ত ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করতে থাকে। হ্যাঁ, দায়িত্ব থেকে বাবা আর ভাই তাকে মুক্ত করে রেখেছিল বলেই আজ সে এমন দিশেহারা, বিশাল জীবনের মোকাবিলা করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, হঠাৎ নিজেকে তার মনে হয় বন্ধু ও স্বজনপরিত্যক্ত। এখন, টাকার জন্যে, আব্বা বা ভাইয়ের কাছে—ভাইয়া কিছুকাল মাত্র চাকরি ধরেছে—টাকা চাইতে লজ্জা লাগে।

অবশ্য, ভাইয়াই শেষ-পর্যন্ত উদ্ধার করে তাকে।—শুয়ে-বসে থাকিস কেন, বেড়া, চাকরির জন্যে বল্ একে-ওকে, আর কিছু না-হোক এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়া, শুয়ে-বসে থাকলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে—ভাইয়া প্রায়ই বলত। তখনই এখানে-ওখানে দরখাস্ত করতে করতে ঢাকা থেকে দুশো মাইল দূরে এই চাকরিটা কি করে যেন হয়ে যায়। ঢাকাতেই ইন্টারভিউ হয়েছিল। ইন্টারভিউ দেবার অভ্যেসও তার নেই। তবু তার নম্রতা ও পাঠপরিধির ব্যাপকতা হয়তো পছন্দ হয়ে গিয়েছিল প্রবীণ অধ্যক্ষ শাহেবের। নিয়োগপত্র পেয়ে সে অবাক হয়ে যায়।

ঢাকার বাইরেও যাবার ইচ্ছে কি তার আদৌ ছিল? কখনো না। ভাইয়াই বলে বলে তাকে রাজি করিয়েছে।—কিচ্ছু না, প্রথম জীবনে যা, না-ভালো না লাগলে চলে আসবি— ভাইয়া তাকে পাখি-পড়ার মতো করে বুঝিয়েছে। আব্বা মনে মনে যাই থাক, এসব নিয়ে প্রকাশ্যে মাথা ঘামাতেন না। কাসেমের নিজেরও কি একটু-আধটু খারাপ লাগত না? পাশ করার পরে চাকরি বাকরি নিয়ে বন্ধুবান্ধবও প্রায় সবাই এদিক-ওদিক ছিটকে পড়েছে। ঢাকায় যারা আছে তাদের সঙ্গেও আগের মতো নিয়মিত দেখা বা আড্ডা হয় না। নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয়, পরিত্যক্ত মনে হয়। অথচ আবার একটা নিঃসঙ্গতা ও বিজনতার অভ্যেস তার চিরকালীন। কিন্তু দ্যাখে যেন বহিঃপৃথিবীর সঙ্গে তার সেতুখানি ভেঙে যায়, জোড়া লাগে না আর। বন্ধু, আত্মীয়, মেয়েরা—ব্যবধান ক্রমশ বেড়ে যায়।

মাহবুবের অফিসে মাঝে মাঝে যেত কাসেম। হলে শেষ যে বছর ছিল কাসেম তখন মাহবুবের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়। সেই মাহবুব মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়ায় একটা বিরাট ফার্মের অফিসার। কার্পেট, আশবাবপত্রে সুসজ্জিত তার অফিসে গেলে শত ব্যস্ততার মধ্যেও যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা দেখাত মাহবুব। কিন্তু কাসেমের কণ্ঠে কোথায় যেন একটা গ্লানির মতো লাগত, নিজেকে মনে হতো কেমন যেন বেমানান। মাহবুবের অন্তরঙ্গতা মনে হতো কৃত্রিম, তার চোখের কোণে যেন সরু হয়ে করুণা ফুটে বেরোত—এরকমই মনে হতো কাসেমের।

তার প্রিয় শহরটা আস্তে আস্তে বিস্বাদ হয়ে যাচ্ছিল। শুক্রবার বা রোববার মর্নিং শো-র ইংরেজি ছবিতে আর আগের মতো স্বাদ ছিল না, স্বাদ ছিল না ফ্লাস্কে চা ভরে সারাদিন ধরে ক্রিকেট ম্যাচ দেখা, একা একা পুরোনো শহরে অচেনা রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর মধ্যেও বিদেশ ভ্রমণের মজা ছিল না আর—কেননা নিঃসঙ্গতা ছিল এতকাল তার নিজস্ব অর্জন, এখন নিঃসঙ্গতা তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। খবরের কাগজে দু-একটা চাকরির চেষ্টা করে দু-একটি লোভ অনেকানেক প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও, হয়নি সে বিরক্তির শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল।

ভাইয়া বলেছিল, কাজ না থাকলে ঘুরে বেড়াতে। কিন্তু ঘুরে বেড়ানোর জায়গাও অসম্ভব কমে গিয়েছিল।

এইরকম সময়ে অধ্যাপনার এই চাকরিটা স্বর্গের ফলের মতো এসে পড়ে ছিল তার মুঠোর ভিতরে।

আর তারপর আস্তে আস্তে আবার কাসেমের কাছে পৃথিবীর রঙ কিছুটা পাল্টে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে পরিবেশ আবার খানিকটা মধুর হয়ে এসেছিল। অনেকদিন পর আবার দু-একটা হালকা সিনেমা দেখল কাসেম। কিন্তু কেন যেন আগের মতো ঠিক স্বাদ পেল না যেন। একা একা ঘুরে বেড়াতে খুব ভালো লাগল অবশ্য একদিন দুপুরবেলা। আগের চেয়েও ভালো লাগল। যেন পৃথিবীকে অনেকটা চিনে নিয়ে এখন সে আবার একাকিত্বের কাছে ফিরে এসেছে। মাহবুবকে সুখবরটা শুনিয়ে দিয়ে এল একদিন।

পাপিয়াদের বাড়িতেও একদিন গিয়ে খবরটা দিয়ে এল। না, প্রেম নয়। আত্মীয়ের এই মেয়েটির প্রতি তার একটা গোপন লোভ ছিল। দৈবাৎ আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে গেলেও তার এই ছেলেবেলার সঙ্গিনীর প্রতি তার একটা মুগ্ধতা রয়ে গিয়েছিল। পাপিয়া খুশি হলো। কিন্তু কোথায় একটি নৈর্ব্যক্তিকতাও রয়েছে তার। তাকে চা-টা নিজেই এনে দিল পাপিয়া।

অন্তরঙ্গতাও দেখাল, কিন্তু কোথায় একটা দূরত্ব বা নির্মোহতাও যেন দেখা দিল তার আচরণে। তার এই সমবয়সি খালাতো বোনটিকে প্রথম কৈশোর-পার হওয়া, তখন-ইউনিভার্সিটিতে সদ্য উঠেছে, খুব ভীরু হলেও একদিন ঝট করে চুমো খেয়ে ফেলে ছিল কাসেম নির্জন বাড়িতে। পাপিয়া তখন কিশোরী। ফাজিল কিশোরী ছুঁড়ির মতো একটু বেশি-বেশিই যেন নাড়াচ্ছিল কাসেমকে, এমন করছিল যেন কাসেমেরই লজ্জা লাগছিল, কিন্তু পাপিয়ার ঐ দুষ্টমি লজ্জা ভেঙেও দিয়েছিল। চকিতে, দেয়ালের গায়ে ঠেশে ধরে, পাপিয়াকে চুমো খেয়ে ছিল মুখে। থরথর করে কেঁপে, সারা মুখে লাল হয়ে, চোখ বুজে ফেলেছিল পাপিয়া—হাসি মুখেই, কিন্তু আবার লজ্জায়ও। সে এক অদ্ভুত মুখমণ্ডলের অবস্থা হয়েছিল। আর তারপরই ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। আজ আর কাসেমের সন্দেহ নেই, পাপিয়াই তাকে বাধ্য করেছিল চুমো খেতে। কিন্তু মেয়েরা যে কী দুর্বোধ্য!

পাপিয়া তারপর আর এগোয়নি। এবং দিনে দিনে সরে গেছে। অথচ কাসেমের রক্তে আগুন ধরে গিয়েছিল। রাতে ঘুমোতে পারেনি কয়েকদিন। পাপিয়াকে নিয়ে পালিয়ে যাবার পরিকল্পনাও করেছিল মনে মনে—কিন্তু পাপিয়া তারপর যেন স্পর্শকাতর নিষ্ঠুর একটা শ্বেত পাথরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। অনেকদিন লেগেছে কাসেমের এই তথ্যটা বুঝতে যে পাপিয়া তার জন্যে নয়। আর সে নয় এত সাহসী যে একটা-কিছু করে বসবে। পাপিয়া সাহস না দিলে তাকে লোভ না-দিলে, চুমো খেতেও কি সাহস হতো। তার নিজের ভীরুতার জন্যে নিজেকে কতবার ধিক্কার দিয়েছে কাসেম। কিন্তু স্বভাব জীবনের ও চরিত্রের যে কত গভীরে প্রোথিত, সমস্ত জেনেও নিজেকে বদলানো যায় না।

তবু মনের কত সুক্ষ্ম স্তর-স্তরান্তর কারুকাজ ভিতরে আমাদের। কাসেমকে বলা যেতে পারে একটু বেঁটেই। বেঁটে, রোগা, অনাকর্ষণীয় চেহারা তার। আবার সে একটু ফর্শাও। ফর্শা না-হয়ে কালো হলে হয়তো চোখে পড়ত। বেঁটে, রোগা, ফর্শা—চেহারার ছাঁচ একটুও বিশিষ্ট না। ভালো তো না মোটেই খারাপও না। খুব খারাপ হলেও কাজ হতো। হয় খুব খারাপ কিংবা খুব ভালো—যা হোক, একটা-কিছু হতে চায় সে। কিন্তু তার কপাল এম্নি, সে হয়ে আছে মাঝারি। সে কী জানে না, পৃথিবীর সুন্দরীতমারা মনে মনে কুৎসিততম পুরুষদের কামনা করে?

কিন্তু আমাদের মনও বুঝি আমাদের নয়, তাতে কত আলো-ছায়া, কত চাঁদ-সূর্য, কত পরিবেশের হাওয়া আর জ্যোৎস্না খেলা করে।

চাকরি পেয়ে যাবার পর দুনিয়া কেন তার আবার অন্যরকম লাগছে। এখন দেখা যায়, মাহবুব খুব খুশি। অফিস ছুটির পর কাসেমকে নিয়ে একদিন সারা বিকেল ঘুরে বেড়াল, সিনেমা দেখাল, চাইনিজ খাওয়াল। এখন এই বিশাল রেল স্টেশন নিজেকে আর অবাঞ্ছিত মনে হচ্ছে না। ঢাকা রেলোয় স্টেশনে, এই সেদিন, যখন নবাবপুরের কাছে ছিল, আব্বাকে তুলে দিতে গিয়ে এম্নি রাত্রিবেলাই তো মনে হচ্ছিল কাসেমের—স্টেশনের যাত্রীরা সবাই কত লম্বা, কী চমৎকার দৈর্ঘ তাদের, কী বলিষ্ঠ, কী সুদর্শন! তুলনায় নিজেকে এত ছোট মনে হচ্ছিল, এত দীন মনে হচ্ছিল। কই, এখন তো মনে হচ্ছে না এরকম।

এই স্টেশনে ভালোই লাগছে তার, সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রী সে, সীট আগে থেকেই রিজার্ভ করা, রাতে দিব্যি ঘুমিয়ে যাবে, ব্যর্থতার জন্য নির্দিষ্ট, আর জানুয়ারির এই শীতে—খুব একটা শীত পড়েনি অবশ্য—তবু টাইয়ে কোটে নিজেকে খারাপ লাগছে না তার। অঢেল বই-এর স্টলের দিকে চোখ চলে যায়। কুলি আর ভাইয়াকে এক মিনিট দাঁড়াতে বলে একটা হালকা ইংরেজি সিনেমা-মাসিক কিনে নিয়ে হাত-ব্যাগে রেখে দিল সে। হাত-ব্যাগে আরো বই আছে—পড়া যাবে দরকার হলে।

গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। নিজের নাম খুঁজে নিয়ে কামরায় উঠেছে কাসেম। ভাইয়াও আছে। মাথার কাছে ছোট মৃদু আলো জ্বালিয়ে দেখিয়ে দিল ভাইয়া, এটা জ্বেলে পড়া যায়। সেটা দেখে কী খুশি কাসেমের। ঢাকা ছেড়ে যাবার বিষাদের সঙ্গে আনন্দও মিশছিল তার। এই প্রথম জীবনে সে পরিবারবিচ্যুত, একা, স্বাধীন। স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করছে পঁচিশ বছর বয়েসে। হয়তো একটু বেশি বয়েসে বলেই অন্যরকম লাগছে। তাছাড়া জীবনকে বিশ্লেষণ করতে করতে সে ক্লান্ত—সে এখন চায় ঢেউয়ে ঢেউয়ে লুটোপুটি খেতে। জীবনের স্রোতে চায় বিশ্লেষণহীন ভেসে যেতে। একটা আঙুলের মতো ছোট পড়ার আলোও তার মনের ভিতরে অন্তহীন নক্ষত্রের আলো জ্বেলে দ্যায়।

ভাইয়া উল্টোদিকের সীটে বসে থাকতে থাকতেই এবং তাকে বারবার জীবন যাপনের নির্দেশ ও চিঠি দেবার কথা মনে করিয়ে দিতে দিতে অন্য দুজন যাত্রী এলেন। একজন বিশালকায় পুরুষ, তাকে দেখেই মনে হয় জীবনের পাত্র পূর্ণ হয়ে আছে তাঁর। অন্যজন যুবক, কিন্তু নমিত, যেন তার অস্তিত্ব মিশিয়ে দিতে পারলে

খুশি। কাসেম অপরিচিতের সঙ্গে সহসা আলাপ করতে পারে না, চেনা লোক পেলে সে লাগাম-ছাড়া; ভাইয়াই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে নিল। তিনি একজন পীরশাহেব, এক জায়গায় ওয়াজ করবার জন্যে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ভোর-রাতে তিনি নেমে যাবেন ছোট একটা স্টেশনে। সঙ্গের যুবকটি তাঁর খাদেম। ভাইয়া তাদের বারবার বলে ছিল। কাসেমের কথা, এই প্রথম চাকরি নিয়ে যাচ্ছে বাইরে, পীরশাহেবকে দোয়া করতে বলল, বলল বাইরে কোনো দিন যায়নি, একটু নজর রাখতে। ভাইয়াটা যে কী! কাসেমের একটু লজ্জা লাগছিল। আবার এক ধরনের ভরসাও বোধ করছিল। সত্যি, তার একটু একটু ভয়-ভয়ই লাগছিল। নিচু ক্লাশে গেলেই হতো লোকজনের সঙ্গে মিশে! তা না, ভাইয়াটা যে কী, কী দরকার খামোখা এত খরচ করবার। এখন রাত্রিটা নিঃশঙ্ক, ভয় কেটে যাচ্ছিল।

ট্রেন ছাড়তে সেই রাত দশটা। খুব-যে একটা দেরি আছে, তা না। ঢাকায় এ বছর শীত বেশ কম। তবু এদিকটায় ফাঁকা বলেই হয়তো, বেশ শীত পড়েছে মনে হচ্ছে। সুটকেস থেকে পাতলা কম্বলটা বের করে শুয়ে পড়ল কাসেম। তার আগে। ভাইয়া তাকে আবার নিশ্চিতির আশ্বাস দিয়ে নেমে যায়। ট্রেনের কামরায় দাঁড়িয়ে ভাইয়াকে বিদায় দিতে গিয়ে মনে হয় কাসেমের,—স্টেশনের তীব্র আলো এখানে নেই, তবু সেই অল্প আলোতেই—ভাইয়ার মুখে এক ধরনের প্রশান্তি এবং গাম্ভীর্য একই সঙ্গে, ভাইয়ার চোখের কোণ একটু বুঝি চিকচিক করে উঠল। কাসেমের চোখে কিন্তু পানির লেশমাত্র নেই। খুবই স্পর্শকাতর সে অন্তত নিজেকে বিশ্লেষণ করে তার তাই-ই মনে হয়, কিন্তু তার চোখে একবিন্দু পানির আভাসও নেই কেন?

জ্যোৎস্না, কুয়াশা, শীত, স্টেশনের আলো, রহস্যময় ট্রেন-গাড়ি, রহস্যময় লোকজন মিশে আছে বাইরে। ট্রেনের দরোজায় দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত সেই রহস্যকে অবলোকন করল কাসেম। তারপর নিজের জায়গায় এসে শুয়ে পড়ল।

পীরশাহেব তাকে একটি-দুটি কথা জিজ্ঞেস করলেন। দরোজায় দাঁড়িয়ে দুটি কথা জিজ্ঞেস করলেন। দরোজায় দাঁড়িয়ে ভাইয়ার তৃপ্ত কণ্ঠ মনে পড়ল কাসেমের। ভাইয়া বলছিল—ভালো হলো। একজন পীরশাহেবের সঙ্গে যাচ্ছিস প্রথম চাকরিতে জয়েন করার করার সময়। খুব ভালো হলো। খোদা হাফেজ।

কম্বল গায়ের ওপর বিছিয়ে শুয়ে পড়ে কাসেম। খুটখাট শব্দে আড়চোখে তাকিয়ে দেখে, পীরশাহেবের যুবক সঙ্গী একটা বদনা বের করে বাইরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে পীরশাহেবকে কি বলতে তিনি ওঠেন। যুবকও তার পিছন-পিছন যায়। আরো কিছুক্ষণ পর খুট করে পড়ার আলো জ্বেলে পত্রিকা পড়ার ফাঁকে-ফাঁকেই লক্ষ্য করে কাসেম পীরশাহেব এসে শুয়ে পড়েন, যুবক মেজেতে বসেই পা টিপে দিতে থাকে পীরশাহেবের। কী বিনতি! কী কোমলতা! ছেলেটা হয়তো তারই বয়েসি। তার তুলনায় কাসেম কত উদ্ধত। এই ছেলেটির মতো সে যদি নিজেকে প্রশ্নহীনভাবে সমর্পণ করতে পারত কোনো কিছুর পায়ে, তাহলে সে হয়তো একটু শান্তি পেত।

পত্রিকাটা মেলে ধরা কাসেমের চোখের সামনে। এখন এক ধরনের শান্তি লাগছে। চোখ ঠিক অক্ষরে বসছে না অবশ্য, বারবার চলে যাচ্ছে অন্যদিকে—

মনের ভিতরে। তার ঢাকার জীবনকে যে অনেকদূর থেকে একটা চলচ্চিত্রের মতো দেখতে পাচ্ছে কাসেম। আব্বা, আম্মা, ভাইয়া, বোনেরা। বন্ধু, বান্ধব। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি। পাপিয়া। ভার্সিটির চন্দন। কালকে নতুন এক শহর। নতুন মানুষেরা। নতুন জীবন। এক ধরনের শান্তি, এক ধরনের উদ্বেগ একই সঙ্গে কাজ করছিল।

তবে সবটাই শান্তির নয়। মনে পড়ছে সেইসব বন্ধুর কথা, যাদের সঙ্গে ভার্সিটির দিনগুলো দিবারাত্রি প্রায় একসঙ্গে কাটানো গেছে, এখন যাদের দু-একজন খোঁজও নেয় না। ছী! ছী! একটা চাকরিতে তো তারই এক বন্ধুর সঙ্গে প্রতিযোগিতাও করতে হয়েছিল তাকে। কিন্তু উপায় নেই। আস্তে আস্তে কী কঠিন হয়ে যাচ্ছে সে? কিন্তু সবার জন্যে এক ধরনের মায়াও তো লাগছে তার। পাপিয়া এত দুর্বোধ্য হয়ে উঠল কেন, কে জানে! তার কি কোনো গোপন বেদনা আছে! আচ্ছা, এই কথাটা সে ভাবতে চায় না, তবু মনে হচ্ছিল ফিরে ফিরে ভাইয়া যে তাকে এত আগ্রহ করে বাইরে পাঠাল, তার অন্য কোনো কারণ নেই তো? জমিলার জন্যে নয় তো? জমিলা তাদের গ্রামের মেয়ে। ওর মাও কাসেমের বাড়িতে কাজ করত। জমিলা আছে অনেকদিন। কাসেমের আলাদা ঘর হবার পর, ইউনিভার্সিটিতে তখন উঠেছে, সদ্য বসে যাচ্ছে, এক রাতে জমিলা তার ঘরে কি কাজে ঢুকলে সে জমিলাকে জাপটে ধরেছিল। মেয়েটা ফুলের মতো কোমল, বুকে ফুটে আছে দুটো গোলাপ, পাছা মানপাতার মতো চওড়া আর ছড়ানো। কিছু না, এক মুহূর্তে জাপটে ধরে সর্বাঙ্গের স্বাদ নিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল জমিলাকে। জমিলা হয়তো নারাজ ছিল না। কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল, ভাইয়া তার অধিকার বিস্তার করছে। যেন শুধু জ্যেষ্ঠের অধিকারেই ভাইয়া জমিলাকে দখল করে, এবং যেন পরোক্ষে জানিয়ে দ্যায় কাসেম—তুই এদিকে ভিড়িস না!—কিন্তু তারপর তো প্রবল আকর্ষণ সত্ত্বেও ওদিকে আর মুখ ফেরায়নি কাসেম। মাঝেমাঝে তীব্র বিদ্রোহ করে উঠতে চেয়েছে, মাঝেমাঝে তীব্র ঘৃণায় জ্বলে উঠেছে, মনেমনে বলেছে, 'বাহ! এটা একটা কথা হলো! তুমি অগ্রজের অধিকারেই শুধু ওকে করতলগত করবে? যেন ওটা তোমার প্রথম পাওনা। ছী! তোমার লজ্জা লাগে না?' কিন্তু মনে মনে বলা ছাড়া আর কিছু না, আর কিছু পারেনি কাসেম। যেমন প্রেমের ব্যাপারে তেমনি কামের ব্যাপারেও সে হয়ে উঠত পারেনি সর্বশক্তিমান, গোগ্রাসী, গোঁয়ার। নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে কাসেম, গ্লানিতে ভীরুতার গ্লানিতে ভরে গেছে মন, মাঝে মাঝে মনে হয়েছে প্রেমের জন্যে কামের জন্যে সমাজ-সংসার সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দ্যায়। কিন্তু মনেই হয়েছে, তার বেশি এগোতে পারেনি।

কিন্তু এর সবটাই কি ভীরুতা? সে তো পাপিয়ার রহস্যের তল-কূল পায় না। মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেও পাপিয়ার জন্যে তার গভীর সহানুভূতি আছে। পাপিয়া যদি খুলে তাকে না বলত, কেন সে এত গভীর হয়ে আছে ভাইয়ার ব্যাপারেও তাই। ভাইয়াই না তাকে হাত ধরে জীবনের পথে ঠেলে দিচ্ছে? তার চোখই তো শুকনো থেকেছে, ভাইয়ার চোখে তো অশ্রুকণা চিকচিক করে উঠেছে।

ট্রেন চলতে শুরু করলে তার পরিচিত সবার জন্যে কাসেমের মনে একটা মায়া বিস্তৃত হয়ে যেতে থাকে।

সারাদিন আজ অনেক ধকল গেছে। ঘুমে চোখ জুড়িয়ে আসতে কাসেম দ্যাখে, পীরশাহেবের সঙ্গী যুবক আস্তে আস্তে তার বাঙ্কে উঠে যাচ্ছে। পীরশাহেব বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন।

দুই

ভোরবেলাই পৌঁছে যাওয়ার কথা। কিন্তু ট্রেন যখন স্টেশনে পৌঁছোলো তখন ভোর পেরিয়ে সকাল হয়ে গেছে, সকালও পেরিয়ে যায়-যায়। কিন্তু কটা বেলা হয়েছে তা বোঝার উপায় নেই, আকাশের রঙ সীসার মতো ধূসর, গাছপালা নিঝুম, কুয়াশা যেন বাষ্পের মতো ময়লা একটা জাল বিছিয়ে রেখেছে সবার উপরে, সেই বাষ্প উঠছে কাঁকরওঠা স্টেশনের রাস্তা থেকে, মৃত সাপের মতো রেললাইন থেকে, স্লিপার যেন সাপের নির্মোক, মৃত লাল মালগাড়ি থেকে—আর এইসবের উপর মলিন আকাশ থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টি পড়ছে। কুয়াশার মতো বৃষ্টি পড়ে পড়ে স্টেশনের বাইরের পিচ-পথ পালিশ-করা চকচক কালো জুতোর মতো হয়ে গেছে, স্টেশনের বাইরের একমাত্র বিশাল গাছটির পাতাগুলো গাঢ়-সবুজ রঙ ধরেছে।

সারারাত্রি চলে ট্রেন এই স্টেশনে এসে পৌঁছোলো,—কিন্তু কাসেমের মনে শান্তি ফুটে উঠল না কোথাও। যেন একটা মৃত শহরে প্রবেশ করেছে, কাসেমের মনে হলো চারদিক এরকম আশাহীন উৎসাহহীন। অথচ আজ তার কত আনন্দের দিনই-না, আজ সে জীবনের প্রথম চাকরিতে জয়েন করবে, জীবনের একটা বন্ধ দরোজা আজ প্রথম খুলে যাবে তার সামনে, আজ তার একটা নতুন জীবনে প্রথম প্রবেশ। আর আজ কী দেখল সে? রাতে পত্রিকা পড়তেপড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভোররাতে পীরশাহেব আর তাঁর সঙ্গী গাড়ি থেকে নেমে যাবার সময় কী বলেও গেলেন যেন। তারপর আবার সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপর ভোরবেলার একটু ঠাণ্ডা হাওয়ায় আর শীতের শিউরোনিতে ঘুম ভেঙে যায় তার। এখন, স্টেশনে নেমেও শীত করছে বেশ।

স্টেশনের উল্টো দিকের গ্রাম-প্রকৃতিতে কিরকম ঊষরতা-ধূসরতা ছড়িয়ে আছে, গাড়ি থামামাত্র লাফিয়ে নামল না লোকজন—নামল যেন নিয়তিকে মেনে নিচ্ছে এমনভাবে। ফেরিঅলাদের চীৎকার নেই, যাত্রীদের মধ্যে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি নেই, তাড়া নেই, টিকিট পরীক্ষকের মুঠোর ভিতরে টিকিট গুঁজে দিয়ে স্টেশনের বাইরে নীরবে বেরিয়ে আসছে সবাই, স্টেশনের ভিতরের বইএর ও অন্যান্য স্টলগুলো শব্দহীন খোলা। পৃথিবীতে এত নিঃশব্দ এত নিরুৎসাহ স্টেশন কাসেম কি আর দেখেছে, না কল্পনা করেছে?

কাসেমের মনটা খারাপ হয়ে গেল। কালই তো ঢাকা আলোয় রোদে ঝলঝল করছিল, আর এখানে একটা বিমর্ষ ধূসর শহর অপেক্ষা করছিল তার জন্যে।

ছিপছিপে বৃষ্টির মধ্যেই একগুচ্ছ রিকশা দাঁড়িয়েছিল, দুচারটে বেবিট্যাক্সিও দেখা গেল, দূরে যাত্রীবাহী কয়েকটি ট্যাক্সিও অপেক্ষমান। কাসেমের গন্তব্য খুব দূরে না, একটা রিকশায় উঠল সঙ্গের হোল্ডঅল আর সুটকেসটা নিয়ে।

একটা অচেনা নতুন শহরের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে কাসেমের ভালো লাগছিল আবার। এখন কুয়াশা ছিঁড়ে ফুটে উঠছে কোমল সোনালি আলো—কুয়াশার নীলের ভেতরে। গাছপালা, টিলা, মৃদু বৃষ্টিতে ভিজে কালো-হয়ে-ওঠা পিচ-পথ সমস্ত দেখতে দেখতে কাসেমের ভেতরেও একটা নীল-সোনালি আবহ তৈরি হয়ে যায় যেন । মনে হচ্ছিল কাসেম আবার তার সেই ঢাকার জীবনে একটা নতুন রাস্তায় হেঁটে বেড়ানোর আনন্দ পাচ্ছে যেন।

যে-বাড়িতে উঠল কাসেম (আগে থেকেই এ বাড়ির ঠিকানা কাসেমকে জানানো হয়েছিল), সেটি একটি আশ্চর্য ধরনের বাড়ি। তার একতলাও মাটির সমান্তরালে। দোতলাও আসলে বাড়িটা একটা টিলার ওপরে (ও ভেতরে) অবস্থিত। টিলা কেটে একতলা তৈরি করা হয়েছে, দোতলায় ওঠার সিঁড়িটিও খোলা জায়গায়, দোতলাটি টিলার উপরিভাগ। দোতলার সমান্তরালে বিশাল গভীর জঙ্গল, এমন জঙ্গল যেখানে সূর্যের আলো পর্যন্ত ঢুকতে পারে না। বাড়ির সামনে একটা পুকুর। তারপরে পাকা রাস্তা একটা টিলার ঠিক পায়ের তলা থেকে বেরিয়ে গেছে। একটু বেঁকে। চারদিক অসম্ভব নীরব। রাস্তার ধারের টিলার ওপর গাছগাছালি বেশি নেই—তার ওপর দেখা গেল দুতিনটি কাঠকুড়ুনি মেয়েকে ঘুরে ফিরে শুকনো কাঠ জোগাড় করছে।

দু-একজনের সঙ্গে একটু কি অন্তরঙ্গতাও হলো না এর মধ্যে? কুয়াশা বৃষ্টি কমে গিয়ে ততক্ষণে রোদ উঠে গিয়েছিল। মতিউর শাহেবের সঙ্গে, সংক্ষেপে মতি, এক ঘণ্টার মধ্যেই বেশ একটা অন্তরঙ্গতা জমে উঠল কাসেমের। কলেজে জয়েন করা দরকার।

প্রথম দিন। প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করা, অফিসে প্রধান কেরানিবাবুর সঙ্গে বসে বানানো-ও-প্রকৃত হাসিমুখে জয়েনিং রিপোর্টের কাগজপত্র ঠিক করা, ডিপার্টমেন্টের হেড-এর সঙ্গে বসে এক কাপ চা খাওয়া, করিডোরে কলেজের ছেলেমেয়ে দেখে বুকের ভেতর উত্তেজনার শিউরানি—কাজ এমন কিছু না, দুপুরেই বাড়িতে স-সঙ্গী ফিরে এল কাসেম।

সঙ্গীরা কিছুক্ষণ বাদেই তাসে মগ্ন হলো। কাসেমকে বিরাট আহ্বানে জানানো হয়েছিল। কিন্তু কাসেম ইউনিভার্সিটিতে পড়েও হলে-হোস্টেলে-মেসে কখনো থাকেনি, ও রসে বঞ্চিত। একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি তাস খেলতে জানে না—অন্যদের চোখে, মুখে এবং বাক্যেও এর জন্যে বিরাট বিস্ময় প্রকাশ পেলেও কাসেম লজ্জা পাওয়া ছাড়া আর কী করতে পারে? কাসেম, ক্লান্ত, নিজের ছোট্ট রুমে এসে ঢোকে। হ্যাঁ, তার জন্যে ছোট্ট হলেও একান্ত নিজস্ব একটি ঘর বরাদ্দ করা হচ্ছে। এই একটা মহাভয় ছিল তার। আর কারো সঙ্গে সে থাকতে পারে না। তার একটি একক ও একাকী সত্তা গড়ে উঠেছে—যেখানে সে অন্যদের থেকে একেবারে আলাদা। আর সবার সঙ্গে থাকতে হলেও, একেবারে নিজত্ব বিকিয়ে থাকতে

হবে—এরকম পারে না কাসেম। তার আর অন্যদের মাঝখানে তার জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে কোথায় একটা দেয়াল উঠেছে। অনেকদিন থেকে তৈরি হয়ে ওঠা এই দেয়ালটা ইচ্ছে করলেও আজ আর কাসেম ভেঙে দিতে পারে না।

নিজের ঘরে এসে শুয়ে আছে কাসেম সরু ছোট তার নিজস্ব তক্তপোষের ওপর। ভেতর থেকে দরোজাটা বন্ধ। জানালা খোলা। কাসেমের জানালার বাইরে ঢালু হয়ে নেমে গেছে টিলা, পায়ে-চলা সরু পথ একটি। ওপাশে নিকষ জঙ্গল—যার ভেতরে বোধ হয় সূর্যের আলোও ঢুকতে পারে না। এইসব দেখতে দেখতে নানা কথা ভাবছে কাসেম—নতুন চাকরি, নতুন মানুষ, নতুন পরিবেশের কথা। ক্লান্ত হলেও কিংবা হয়তোবা বেশি। ক্লান্ত বলেই ঘুম আসছে না তার। একটা পত্রিকা উল্টেপাল্টে দেখছে। ঘুম আসছে না। বইএর যা নিসর্গদৃশ্যের মন ঠিক বসে নেই—সে এক অমর ঘুণপোকার মতো কাজ করে চলেছে। ভাবছে—নাকি ভাবছেও না কাসেম। জনবিরল জায়গা। হঠাৎ চোখ আটকে গেল। নিচে টিলার বাইরে ও কি? উঠে বসল বিছানার ওপর।

চারপাশের লাল কাপড়ের কবরের মতো একটা জায়গা ঘিরে দিচ্ছে কয়েকজন লোক। তাড়াতাড়ি বাইরে এল কাসেম। দ্যাখে সহযোগী সবাই এসে দাঁড়িয়েছে। নিচের দিকে দেখছে। বসন্তে একজন মারা গেছে। লোকটা হিন্দু। তাহলে কবর দিচ্ছে কেন? তার কারণ লোকটা নাথ সম্প্রদায়ের এবং এরা কবর দ্যায়। নাকি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এরকম করছে, তা বুঝল না কাসেম ঠিক। সে জানত বসন্ত এত ভয়ানক রোগ যে মাটি দিয়ে কবর দিলেও তার সংক্রামকতা নষ্ট হয় না, এবং জীবাণু ছড়াতে দ্যায় না। এ অঞ্চল এমনিতেই বেলেমাটি এলাকা।

শহরে বসন্ত লেগেছে : এই তথ্য কাসেমকে এখানে আসা মাত্রই জানানো হয়েছিল, সঙ্গে নবাগতের প্রতি অভয়বাণীও ছিল। কাসেমের ভেতরটা কেঁপে গেল। নিজের ঘরে গিয়ে শোয়া হলো না আর। সহযোগীরা তাস খেলায় ফিরে গেলেন। কাসেম তাদের পাশে বিছানার ওপর বসে পড়ে না-বুঝেও খেলা দেখতে লাগল।

দেখতে দেখতে বেলা পড়ে এসেছিল। টিলার ওপরের জঙ্গলের ছায়া বিস্তীর্ণ হয়ে গিয়ে পাকা রাস্তার ওপর পড়েছিল। পাশে সোনার মতো রোদ। দূরের সেই রাস্তা বেয়ে ডেয়ারি ফার্মের টমটম যাচ্ছিল, তার সুন্দর শব্দ এই নির্জন জায়গায় এত জোরে বাজছিল যেন মনে হয় ঠিক ঘরের পাশ দিয়েই যাচ্ছে।

আরো পরে ছায়া আরো ঘন হয়ে এসেছে, তখন পিঠে বিরাট বিরাট কুড়োনো শুকনো কাঠের বোঝা মাথায় প্রায় বেঁকে গিয়ে একটি-দুটি করে খাশিয়া মেয়ে রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে—গিয়েছিল কোন্ দূরের টিলায় কাঠ কুড়োতে।

কাসেমের মনে হচ্ছিল এই ফাঁকা ও নির্জন জায়গায় অনেকক্ষণ ধরে সন্ধে হয়। টিলার জঙ্গলে বিচিত্র সব পতঙ্গের ডাকে সন্ধে ঘনিয়ে আসছিল আরো। অনেক দূর থেকে বিচিত্র একটা শব্দ শোন গেল—কোনো বুনো জানোয়ারের ডাকের মতো। এ জায়গায় ভীষণ সাপ। মতিয়ুরের সঙ্গে বেরিয়ে বিকেলে কাসেম একটু এদিক-ওদিক ঘুরে এসেছে। একটা নির্জন মুদি দোকান শুধু খোলা আছে

দেখল বেশ খানিক দূর হেঁটে গিয়ে—তার আশেপাশে কয়েক ঘর গরিব বাসিন্দা। সন্ধেবেলা সিঁড়ির সব উঁচু ধাপের ওপর বসে বসে গল্প করছিল কাসেম, মতিয়ুর, অন্যেরা। দূরে টিলার ওপর প্যাগোডার মতো একটা মন্দির দেখা গেল—সেখানে ঘণ্টা বাজছে।

সন্ধে হয়ে গেছে। অতল নীরবতা ভাঙছে কেবল বিচিত্র সব পাখি-পতঙ্গের ডাক। সামনের দুশো ফুট উঁচু টিলা যেন এক অত্যুচ্চ পর্বতের মতো হয়ে উঠেছে। পাশের টিলার ওপরের জঙ্গলে যেন আফ্রিকার গহন অরণ্যছায়া—যেন এই জঙ্গল থেকে যে-কোনো মুহূর্তে বেরিয়ে আসতে পারে কোনো অদ্ভুত অচেনা ভয়াল জন্তু। কাসেমের ছেলেবেলা থেকে চেনা শহরটি এখান থেকে মাইল মাইল দূরে, যানচলাচলে উন্মুখর এখন। সারাদিন ভুলে গিয়েছিল কাসেম, কিন্তু এখন এই আসন্ন সন্ধ্যার ছায়ায় সেই রাজধানীর স্মৃতি, চেনা-পরিজনের স্মৃতি মনের ভেতরে এক বিশাল বিষাদ ব্যাপ্ত করে দিল।

সহসা চোখ-কান একই সঙ্গে জাগ্রত হয়ে উঠল। অন্ধকারে দূরের রাস্তার ওপর দিয়ে ছোট আর বিচিত্র এক মিছিল দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কয়েকটা হারিকেন জ্বলছে, তার আলোয় আবছা একটা মূর্তির মতো দেখা গেল। মিছিলের আগে আগে হাঁটছে না তো যেন তাড়া-খাওয়া জন্তুর মতো পালিয়ে যাচ্ছে, আর সেই ছোট্ট দ্রুতগামী মিছিল কী-এক দুর্বোধ মন্ত্রের শব্দ উচ্চারণ করে চলেছে। এই ফাঁকা ও নির্জন জায়গায়, অন্ধকারে, সেই শব্দ যেন ঠিক কানের ভেতরে এসে পড়ছে। অলৌকিক শব্দ। হিম হতে হতে জানল কাসেম, বসন্ত রোগের শমশান্তির জন্যে এই আয়োজন।

বেশি রাত করেনি কাসেম। খেয়েদেয়ে তাড়াতাড়ি বিছানায় চলে গিয়েছিল। ক্লান্তি লাগছিল অসম্ভব। বাড়ির স্মৃতি ঘটনায়-ভরা আজকের দিনটি, গত রাত্রির ট্রেনের স্মৃতি তার ওপর দিয়ে সিনেমার দৃশ্যের মতো ক্রমাগত চলে যেতে থাকে। সহসা আজানের আর্ত আবেদনময় আকাশভেদী শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তার। বালিশের তলা থেকে ঘড়ি টেনে বের করল—রেডিয়াম-দেয়া কাঁটা জ্বলছে : রাত বারোটা বাজল। আজানের পর আজান। টিলার ওপর কাসেমের ছোট ঘরখানি যেন কোন স্রোতের আনন্ত্যে স্থির ভাসমান। পর পর সাতবার আজানের আওয়াজ ধ্বনিত হলো।

কাসেম জেগে বিছানার ওপর অন্ধকারে চোখ দুটি জ্বেলে বসে থাকল ॥

জীবনানন্দের একটি অপ্রকাশিত গল্প

[১৯৮১ সালে কলকাতায় মঞ্জুশ্রী দাশের একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। লিখিত সাক্ষাৎকার। ছোট কিন্তু আন্তরিক। মঞ্জুশ্রী কবিতা লিখতেন, তাঁর কবিতায় তাঁর বিখ্যাত পিতার ছায়া ছিল, গদ্যেও। ঐ ছোট সাক্ষাৎকারটিতেও। তার সঙ্গে ছিল তাঁর পিতার প্রতি অপরিমেয় শ্রদ্ধা। সাক্ষাৎকারটির সঙ্গে তাঁর জীবনীতথ্যও দিতে বলেছিলাম। তাও লিখে দিয়েছিলেন তিনি। সেটা পড়ে দেখি, জীবনানন্দের সঙ্গে তাঁর একটা পার্থক্যও আছে। পর্বতারোহণের মতো দুরূহ অ-জীবনানন্দীয় অভিজ্ঞতাও হয়েছিল তাঁর।

মঞ্জুশ্রী দাশের সাক্ষাৎকারটি আমি প্রকাশ করি বেশ কিছুকাল পরে, ঢাকায় ফিরে এসে, আমারই সম্পাদিত একটি লিটল ম্যাগাজিনে। পত্রিকাটি নিয়ে গিয়েছি কলকাতায়, আমারই ব্যাগের মধ্যে আছে, এরকম একদিন ট্রামে বসে আছি, দুপুরবেলার ফাঁকা ট্রাম। একসময় সামনে তাকিয়ে মনে হলো, ঐ না মঞ্জুশ্রী দাশ বসে আছেন? দু-এক বার দেখেছি, চেহারা ভুল করছি না তো? ভাবতে ভাবতে উঠে গিয়ে জিগেস করেই ফেললাম—আচ্ছা, কিছু মনে করবেন না। আপনি মঞ্জুশ্রী দাশ না?

—হাঁ, বললেন মহিলা।

আমি আমার নাম বললাম। তারপর বললাম—আপনার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম কয়েক বছর আগে। সেটা ছাপা হয়েছে। আপনাকে কপি দেওয়া হয়নি। কলকাতার জীবন আর রাস্তাঘাট জটিল লাগে, তাই-ই।

উনি শুধু বললেন—কিছু হবে না। বসুন।

তার পাশে ফাঁকা সীটে বসে, ব্যাগ খুলে, আমার সম্পাদিত ক্ষীণকায় 'জীবনানন্দ' পত্রিকার দুটি সংখ্যা দিলাম।

মঞ্জুশ্রী দাশ পত্রিকা উল্টে একবার দেখে রেখে দিলেন সঙ্গের ব্যাগে। পত্রিকার মলাটটি দু-তিনবার উল্টেপাল্টে দেখলেন।

তারপর বললেন—বাবার নামে পত্রিকার নাম রেখেছেন?

বললাম—হ্যাঁ। আমার সংগতি নেই। তবু ইচ্ছে আছে, চালিয়ে যাব।

উনি কিছু কথা না-বলে হাসলেন।

তারপর স্বগতোক্তির মতো বললেন—আপনার 'শুদ্ধতম কবি' বইটা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকত সব সময়। একবার ট্রেন থেকে বইটা হারিয়ে যায়।

আমি বললাম—ঠিক আছে, পরের বার যখন কলকাতায় আসব, নিয়ে আসব বইটা আপনার জন্যে।

উনি কিছু না-বলে হাসলেন।

তারপরই উনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—আমি সামনে নামব।

আমি উঠে সরে দাঁড়ালাম। বললাম—ঠিক আছে। সামনেবার এসে দেখা করব আপনার সঙ্গে। দু-একদিনের মধ্যে আমি ঢাকায় ফিরছি।—বলে হাত তুললাম।

উনি আবার কথা না-বলে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। তারপর দ্রুত নেমে গেলেন।

তৎক্ষণাৎ আমার চোখে পড়ল উনি যেখানে বসেছিলেন, সেখানে একটি লম্বা খাম। উনিই তো ফেলে গেছেন। নিশ্চয়। ততক্ষণে ট্রাম অনেক দূর এগিয়ে গেছে। একটু ইতস্তত করে মুখ-বোঁজা খামটি তুলে নিলাম।

'জীবনানন্দ' পত্রিকাটি চটি আকারে ধারাবাহিক চালিয়ে যেতে পারতাম হয়তো। অনিয়মিতভাবে। দুজন ব্যাংকার-সাহিত্যিক আমাকে ভালোবাসতেন। তাঁদের সহায়তার আশ্বাস ছিল। কিন্তু আমার প্রধান নির্ভর ছিল আমার স্নেহভাজন ছাত্র হেলালউদ্দিন। ফকিরাপুলে ছিল তার প্রেস। ঐ প্রেসেই 'জীবনানন্দ' ছাপা হত। 'জীবনানন্দ' পত্রিকার একটি সংখ্যা ছাপার সময়েই কে যেন আমাকে খবর দিল হেলাল আত্মহত্যা করেছে! তখন আমি একটা অফিসে কাজ করি। সেদিনই বিকেলে অফিসের পরে গেলাম ফকিরাপুলের সেই প্রেসে। খবর মিথ্যে নয়। মন শুধু বিষণ্ন হয়ে গেল না, 'জীবনানন্দ' পত্রিকাটিও বন্ধ হয়ে গেল। ঐ সংখ্যায় হেলালউদ্দিনের উদ্দেশে একটি কবিতা লিখে পত্রিকা বন্ধ করে দিলাম। 'জীবনানন্দ' পত্রিকার এভাবেই ইতি হয়ে গেল।

তারও পরে জীবনানন্দের 'সমালোচনা-সমগ্র' আমার সম্পাদনায় যখন বেরুল, বন্ধু 'রূপম'-সম্পাদক আনওয়ার আহমদের প্রকাশনসংস্থা থেকে, তখনও ভেবেছিলাম পরিশিষ্টে সেই মুখ-বোঁজা খামের ভিতরের লেখাটি দিয়ে দেব। কিন্তু নানা কারণে তা করিনি। মঞ্জুশ্রী দাশকে ফেরৎ দেওয়াও হয়নি।

কৌতূহলবশত খাম খুলে দেখছিলাম। ইংরেজিতে জীবনানন্দের স্বাক্ষর। একটি গল্প। কোনো নাম নেই গল্পের। সন-তারিখও লেখা নেই। তখন পর্যন্ত জীবনানন্দের মাত্র তিনটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে গ্রন্থাকারে। প্রতিক্ষণ-প্রকাশিত জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাসের খণ্ডগুলি বোধ হয় তখনও প্রকাশিত হতে শুরু করেনি। মঞ্জুশ্রী দাশ কেন শুধুমাত্র এই গল্পটি খামে ভরে নিয়ে ঘুরছিলেন, জানি না। কোনো পত্রিকা দফতরে নিয়ে যাচ্ছিলেন কিনা, তাও বলতে পারি না।

এখন জীবনানন্দের অনেক অপ্রকাশিত রচনা বেরুচ্ছে। তাই মনে হয়, জীবনানন্দের এই গল্পটিও প্রকাশিত হওয়া উচিত। দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকার সাহিত্য-সাময়িকীর তরুণ সম্পাদকের অনুরোধে গল্পটি এতদিন পরে প্রকাশ করতে দিলাম।

প্রসঙ্গত একটি কথা বলা দরকার। জীবনানন্দ দাশের হাতে লেখা সর্বত্র খুব স্পষ্ট নয়। তাছাড়া গল্পটা পড়ে মনে হয়েছে, একটা খসড়া লিখন। কাটাকুটি আছে। বিকল্প শব্দ ব্যবহার—জীবনানন্দের স্বভাবসুলভ—আছে ঢের। এমনকি গল্পের উপসংহার নিয়ে দু-তিনবার কাটাকুটি আছে। এখানে যে-পাঠ দেওয়া হলো, সেটাই যে শুদ্ধ সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। পাণ্ডুলিপি শ্রদ্ধেয় ভূমেন্দ্র গুহ দেখে দিলে অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যেত। তবু জীবনানন্দের একটি অপ্রকাশিত গল্প অন্তত সামগ্রিক ধ্বংসের বা লুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাক—এই চিন্তা করে গল্পটি আপাপত এভাবেই প্রকাশ করা হলো।]

লেকে চক্কর দিল কয়েকটা, তারপর রাস্তায় বেরিয়ে এল সোমনাথ। রাস্তায় বেরিয়ে এসে সোমনাথ দেখল, কার্তিকের রহস্যকুয়াশাময় সন্ধ্যা নেমে আসছে, শিশির ঝরছে, ঘনলালসার বিচিত্র একপাল ছাগলের মতো কলকাতার পথে পথে নেমে আসছে অন্ধকার। গড়িয়াহাটার সুন্দরী শাঁকচুন্নীরা বেরিয়েছে কেনাকাটা দরদাম অনর্থক এদিক-ওদিক করতে, একটা ব্লাউজ কিনতে চিমসে ঢোসকা শরীরের মাপে মাপে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না যেন। কিন্তু এই করা চাই রোজ। এ তো পাড়াগাঁর বাঁশঝাড় সোনার সন্ধ্যা জোনাকি নক্ষত্র নীরবতার কাকলিমুখর গোধূলিসন্ধ্যা নয়। এখানে সব নগদ মিহি টাকার দামে বিকোয়। ভাও কত, একমাত্র এটাই নিরিখ। নক্ষত্রচারণা কলকাতার নারীপুরুষের জন্যে নয়।

ভাবতে ভাবতে বিলোল ভিড়ের ভিতরে এর কনুইয়ের গুঁতো ওর জুতোর ঠোক্কর তার গায়ের ঘষটানি খেতে খেতে সেখানেও এক পাক দিল সোমনাথ। নরকে ঢোকার আগে একটু তো জেরাবার হওয়া চাই।

এখানেই না গড়িয়াহাটায় একটা ঘর নিয়েছিল সোমনাথ? ছোট্ট একটা ঘর। এক চিলতে। কিন্তু কেবল নিজের জন্যে। নিজের কল্পনা আর বেদনাকে সম্বল করে যেখানে দু-দণ্ড বসা যায়, হয়তো ইচ্ছে হলো লিখল খানিকটা, হয়তো ভেবে ভেবে পৃথিবীর বেদনার ভার ছাড়িয়ে কোন মায়াবীর দেশ-দেশান্তরে ঘুরে এল খানিকটা, যেখানে সে কারো সন্তান নয়, পিতা নয় কারো, স্বামী নয় কারো, যেখানে সে একা। একা সে, আর কেউ নেই, নেই আর কেউ, আছে কেবল উঁচু উঁচু বিল্ডিঙের ওপাশে এক অদেখা দিগন্ত, আকাশের ওপারে আকাশ, হেমন্তের শিশিরের মধ্য দিয়ে সাঁতরে গেল চিল আর নক্ষত্র আর বেদনা। আর এইসবই সোমনাথ দেখছে, দেড়শো টাকার মাস্টার, তাও কিস্তিতে পেতে পেতে প্রতি মাসে বাকি থেকে যায় যার কিছুটা।

তবু দণ্ডিত হয়ে জীবনের ঘুরনচাকি দেখে যেতেই হয়।

ঘরে ঢুকে রোজকার মতোই মাথা নিচু করে শেবার ঘরে ঢুকে যাচ্ছিল সোমনাথ। বসবার ঘরে ছাল-চামড়া-ওঠা ঘেয়ো কুকুরের মতো কয়েকটা বেতের চেয়ার। তারই একটিতে সুমিতা বসে আছে। রোজ যেমন স্কুল থেকে ফিরে, গা ধুয়ে, প্রসাধিত শাঁকচুন্নির মতো একটি পুরুষমানুষকে সামনে বসিয়ে। সে পুরুষমানুষ যে-ই হোক হাড়হাবাতে বুড়ো থেকে সদ্য গোঁফ-গজানো ছোকরা কানে না ঐ ঘেয়ো কুকুরের মতো বেতের চেয়ারে বসে থাকতে দেখেছে সোমনাথ? কিন্তু

কোনো দিন ফিরে তাকিয়েছে কি? ভালো করে দেখেছে কি? প্রবৃত্তিই হয়নি তার, রুচিই হয়নি তার। দেড়শো টাকার স্বামী হিশেবে হয়তো সাহসেও কুলোয়নি। কী গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর রাত দশটা এগোরোটা বারোটা একটা পর্যন্ত, নিজে ঘুমিয়ে পড়ার পরে, ঘুম থেকে জেগে উঠে জানালা দিয়ে কলকাতার নক্ষত্রহীন কালশিটে-পড়া আকাশ দেখতে দেখতে সেও একেবারে না-ভেবেছে তাও নয়। কিন্তু ঐ শাঁকচুন্নির সুন্দরবনের ভিতরে এখনও কি এমন মৌচাক আছে, সেখানে খোঁচা দিলে মধু ঝরে পড়ে এখনো? সোমনাথ তো তার তিলতম রসের ক্ষরণ টের পায় না। টের পায় যত সব লোল বুড়ো আর নতুন-গোঁফ-ওঠা ছেলে-ছোকরার দল? এসব নিয়ে ভাবেও না অবশ্য সোমনাথ, তবে এসব নিয়েই ভাবে সোমনাথ।

কিন্তু সোমনাথের মুখ দেখে কে এসব বলবে? শেষপর্যন্ত সবই তো তার নক্ষত্রচারিতায় পর্যবসিত হয়। আজ অবশ্য ব্যাপারটা সহজ হলো না, চিনেম্যানের মতো ভাবলেশহীন মুখোশে একটা হ্যাঁচকা টান পড়ল। ভিতরে চলে যাচ্ছে সোমনাথ, সুমিতা ডেকে বললে—এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই তোমার, আমার বন্ধু, অমলেশ মুখার্জি।

সোমনাথ দাঁড়িয়ে গেল। তাকাল না, নমস্কার পর্যন্ত করল না। না-তাকিয়েও বুঝল একটা বুড়োহাবড়া, ঢের টাকার মালিক, ঢোসকা শরীর, এমন সুসজ্জিত যে ঘর বোঁটকা গন্ধে ভুরভুর করছে, সেই সুগন্ধে বোধ হয় চিটগুড়ে মাছির মতো আটকে পড়েছে সুমিতা।

সোমনাথ-কে নিথর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুমিতা বলল—মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে গেলে যে? অবশ্য মরে গেলে বাংলাদেশের সেরা দার্শনিক হিশেবে তোমার একটা স্ট্যাচু চৌরঙ্গিতে তৈরি হবেই, কিন্তু জীবন্ত অবস্থায় আমার সামনে তার রিহার্সাল দেওয়া দরকার নেই। কেন না আমি তা বানাতে যাব না।

লেকে রাস্তায় অনেকক্ষণ হেঁটেছে সোমনাথ আজ। ক্লান্ত লাগছে। ক্লান্ত ক্লান্তি হীন। তার ভিতরে কার্তিকের রাত্রির রহস্যকুয়াশার ভিতরে অবিশ্রাম নক্ষত্রের বুড়বুড়ি চলছেই। সোমনাথ জানে, ওর হাত থেকে এ জীবনে নিস্তার নেই তার। কল্পনা বেদনা ভাবনা সম্বল করে দূর দূরতর সমুদ্রের ভিতরে এক দিশাহারা নাবিকের মতো চলে যেতে হবেই তাকে। কিন্তু নক্ষত্রের আলোয় কোনো নারকেলপল্লব-স্পন্দিত সবুজ দ্বীপে পৌঁছতে পারবে কি সোমনাথ? দেড়শো টাকার ক্লান্ত-ক্লান্তিহীন মাস্টারমশাই?

সুমিতা বলল—আমার কোনো বন্ধুর সঙ্গেই তো তুমি আলাপ করতে চাও না?

এর পরে অন্য কেউ হলে তো চলেই যেত ওখান থেকে, হয়তো আগেই যেত, কিন্তু সোমনাথ তো অন্য কোনো নক্ষত্রের জীব, সে বসে পড়ল কাঁঠাল কাঠের ন্যাড়া চেয়ারটায়।

যেন কেনো মায়াবীর মতো জাদুবলে হঠাৎ স্বভাবঅশোভন সপ্রতিভতায় জিগেস করল—কই, আলাপ করিয়ে দিলে না?

তখনি তার চোখে পড়ল, ভদ্রলোকের বাঁ হাতের পাঁচ আঙুলে পাঁচটি আংটি (হিরের নাকি?) ঝলমল করছে। সিল্কের মেরুন রঙ্গে আলো ঝিলিকে উঠছে, রাজহংসীর মতো শাদা ধুতির কোঁচানো উদ্বৃত্ত লুটোচ্ছে মেঝের উপরে।

সুমিতা বলল—এঁদের আর খোঁজ রাখবে কী তুমি? ডাইনি মা, ঘোড়ামুখী বোন আর গার্লস কলেজের শাঁকচুন্নিদের বাইরে সভ্য জগতের কোন খোঁজটাই বা রাখো তুমি? ওঁর নাম অমলেশ মুখার্জি, বোম্বাই-এর ছায়াছবি জগতের বাঙালি প্রডিউসারদের সম্রাট। তোমার ইয়ে—তুমি তো আবার তাদের নামও শোনোনি বাপের জন্মে—শর্মিলা ঠাকুর, মৌসুমী, রাখীর মতো নায়িকাদের উনিই তো চিনিয়েছেন। অবশ্য তোমার মতো পনেরোটা দশ টাকার গোয়ালঘরের রাখালদের চেনাতেও পারেননি। কিন্তু ওঁকে চেনে না কে? উনি কলকাতায় এলে কোন নায়িকা ধন্না দ্যায় না ওঁর হোটেলে—তোমার ঐ টালিগঞ্জের সুয়োরানি-দুয়োরানি-চাকরানিরা?

সোমনাথ শুনেই যেতে লাগল।

প্রথম প্রথম তার মনে পড়ছিল, সিনেমার-নাটকের-যাত্রার পরিচালক-প্রযোজক কতজনকেই না সে দেখেছে তাদের বাড়ির এই হতচ্ছাড়া বসবার ঘরের ঘেয়ো কুকুরের মতো ময়লা শাদা বেড়ালের মতো বেতের চেয়ারগুলোতে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকতে। কারো কারো হাতে শাড়ির প্যাকেট, মিষ্টির প্যাকেট। তারপর তারা যে কোনো দূর নক্ষত্রের আকাশে লীন হয়ে যায়। কিংবা কোনো সদ্য-গোঁফ-গজানো প্রডিউসারের চামচা ছোকরা সামনে এক কাপ চা নিয়ে কার্নিশের বেড়ালের মতো বসে থাকছে তো থাকছেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর চলছেই। সিনেমার বা নাটকের বা যাত্রার ডায়ালগ হয়তো মুখস্থ করাচ্ছে সুমিতাকে দিয়ে।

তাই বলে দু-একবার শিকে ছেঁড়েনি, তা নয়।

তাতেই কত ধামসানি হুমকানি। হয়তো অবহেলায় একটা বিনি পয়সার টিকিট ছুড়ে দিয়েছে পড়ার টেবিলের উপরে, তারপর রাত দুপুরবেলা বাড়ি ফিরে নরক গুলজার।

রাত দুপুরবেলা ঘুম থেকে তুলে সুমিতা চিলের চিৎকার জুড়েছে—তোমাকে যে আমার নাটকের টিকিট দিয়ে গিয়েছিলুম, গেলে না যে? মানে লেগেছিল নাকি পনেরোটা দশ টাকার নোটের ভিখিরির? তার তিন গুণ তো নিয়ে এলুম এক রাত্তিরেই। একটা কুকুরছানার জন্ম দিতে পারে না যে, তার এত হাঁচড়পাঁচড়।—এই চলল যতক্ষণ-না নিজেই একসময় ক্লান্ত-বিধ্বস্ত হয়ে রঙ-মাখা মুখ নিয়ে অঘোরে ঘুমের নদীতে ডুবে গেল।

ততক্ষণে সে-রাতের মতো সোমনাথের ঘুম বিদায় নিয়েছে। ধূসর মশারির দিকে লণ্ঠনে কাগ সেঁটে দিয়ে টমাস মানের 'বাডেনব্রুকস'-এর পাতা উল্টে যায়—পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা—যতক্ষণ না দূর আকাশের কিনার জাফরান রঙের আলোয় ক্রমাগত উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে থাকে, তারপর এক সময় এসে পড়ে ভোর, দিগন্তে লাফিয়ে ওঠে রাজহংসীর ডিম।

কিন্তু এরকম আর ক-বার?

এরকম বারবার হলে অত্যাচারিত হয়েও সুখী হতো সোমনাথ। এক-এক সময় ভাবে, এসব তারই নক্ষত্রের দোষ। তখন একটা গভীর মমতা জন্মায় তার সুমিতার জন্যে। জীবনের খড়ের ভিতরে সোনার ডিম পেড়ে রেখে নক্ষত্র থেকে

নক্ষত্রে চলে যায় একটা রাজহাঁস। সোনার ডিমটা অবশ্য একটু পরেই মিলিয়ে যায় কোথায়।

ক্লান্ত হয়ে কাঁঠালকাঠের শক্ত চেয়ায়ের কি ঘুমিয়ে পড়েছিল সোমনাথ?

হঠাৎ জেগে উঠে শুনল সুমিতা বলছে—তোমার রাজভোগ রাখা আছে খাবার ঘরে। খেতে ইচ্ছা হয়, খেয়ে নিও। পুরো স্ক্রিপ্ট শুনতে হবে আমার। বলে হিরের আংটি-পরা বুড়োহাবড়াকে আহ্বান করে শোবার ঘরে ঢুকে গেল। সোমনাথ পরিষ্কার দেখল : একটি বৃহৎ চিতাবাঘ একটি ঘাই হরিণীকে টুঁটি টিপে নিয়ে গেল বাদাবনের গভীর জঙ্গলে।

যেন পৃথিবীর কোথাও কোনো খিঁচ নেই এরকম গভীর গভীরতর সান্ত্বনায় কাঠের চেয়ার ছেড়ে ঘেয়ো কুকুরের মতো বেতের চেয়ারে এসে বসল সোমনাথ। তীব্রতম যন্ত্রণার মতো পরিতৃপ্তি আর কিসে মেলে?

ঘুমিয়েও পড়ল এক সময় বসবার ঘরে সেই অনাদিকালের বেতের চেয়ারে। বসবার ঘরের জানালা বাইরে কার্তিকের রাত্রির আকাশে কত নক্ষত্রের চলাফেরা শুরু হলো, কত কুয়াশা এল গেল, কয়েক প্রহর পেরিয়ে বোধ হয় নিতান্তই পেটের খিদেয় অমেয় মোচড়ানিতে ঘুম ভেঙে গেল তার। সোমনাথের হাতে ঘড়ি নেই। ঘড়ি পড়ে না সে। জীবনে এই একটি ব্যসন রয়ে গেছে তার। সময়কে ঘড়ির কাঁটায় বেঁধে রাখে না। একটি নিঃসময় আনন্তিকতায় নিজেকে সঁপে দিয়ে সোমনাথের মনে হয়, সে যেন সব দেশ-কালের বাইরে বেশ একটি নিশ্চিন্ততায় সময়ের সমুদ্রগর্জনের বাইরে একটি হরিৎ-নীল দ্বীপের মতো শান্তির ভিতরে জেগে আছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত গহন অরণ্যে গিয়েও শান্তি আছে কি? একমাত্র মৃত্যুর ঘুমের ভিতরে ছাড়া স্নিগ্ধ শান্তি আছে কোথাও?

অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে সোমনাথ বুঝতে পারল না, এখন সে কতা রাত? বুঝতে চাইলও না সে। খিদেয় ঘুম ভেঙে গেল হয়তো তার, কিন্তু জেগে উঠে খিদের কথা মনে থাকল না। কড়কড়ে ভাত, বাসি ঠাণ্ডা তরকারি, মৃত এক টুকরো মাছের কথা মনে চকিতে উদয় হয়ে নিবে গেল।

কেননা ঘুমের কুয়াশা থেকে বেরিয়ে প্রথমেই তার চোখ গিয়ে পড়েছিল শোবার ঘরের দরোজায়। দরোজা বন্ধ।

বন্ধ দরোজা থেকে তার চোখ এসে পড়ে খোলা জানালায়। কার্তিকের রাত্রির আকাশ। চারদিক থেকে শিশির আর শূন্যতা ঝরে পড়ছে।

বন্ধ দরোজা আর খোলা জানালার একটি কি সুসংগতি আছে কোনো?

বিশেষ-কোনো সংগতি?

অন্তত একটি-কোনো সংগতি?

একটি নিরুত্তরতায় শান্ত অবিচলভাবে আঁচড় কেটে চলে সোমনাথ। মাথার উপরে সিলিং ফ্যানটা নিজের নিয়মে ঘুরেই চলেছে। এরকম হৈমন্তিক রাতে যদি ঐ সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে পড়া যায়, তাহলে প্রাণরণনের সঙ্গে ঐ সিলিং ফ্যানটি কতক্ষণ ঘুরতে থাকবে? ঘুরতেই থাকবে না? থামবে না কোনোদিন? কোনোদিন থামবে না? কিংবা বাথরুমে ঢুকে কবজির একটি শিরা কেটে ফ্যালে যদি সোমনাথ,

অবিশ্রাম রক্তক্ষরণের মধ্য দিয়ে কলকাতা ছেড়ে বাঁশঝাড় জোনাকির ঝাড় আম নিম হিজলের পরিব্যপ্ত পাড়াগাঁর থেকে দূরে আরো দূরে অন্য কোনো নক্ষত্রলোকে উড়ে যেতে পারবে কি সোমনাথ?—যেখানে নেই উদ্যমের ব্যথা আর চিন্তার আঘাত?

সিলিং ফ্যান, না ব্লেড?

ব্লেড, না সিলিং ফ্যান?

রক্তমাংসের ক্ষোভের ঘুরুনি থামবে না কোনোদিন এরকম কার্তিকের রাতে?

কোনোদিন থামবে না?

কার্তিকের রাত্রির আকাশে নক্ষত্রেরা ঘুরতেই থাকবে?

কার্তিকের রাত্রির আকাশের নিচে মানুষ-মানুষী ঘুরতেই থাকবে?

ঘুরুনি থামবে না কোনো দিন?

কোনোদিন থামবে না?

এইসব অরব নিরুত্তর প্রশ্নের আঘাতে আঘাতে কখন এক সময় কুয়াশাররহস্যময় কার্তিকের আকাশের নিচে এসে দাঁড়াল সোমনাথ ॥

[২০০০]

মাছ মাংস মাৎসর্যের রূপকথা

গোলাম রহমান

লায়লা চলে গেছে। আমার স্ত্রী, আমার তিন ছেলে মেয়ের মা। বিশ বছর যে ঘর করেছে আমার সঙ্গে। চলে গেছে জ্যাকি-বনিদের গানের মাস্টারের সঙ্গে।

আমি এলাকায় মুখ দেখাতে পারছি না, অফিসে মুখ দেখাতে পারছি না। আমার নিচু মাথা আরো নিচু হয়ে গেছে। আমি মুখ তুলে তাকাতে পারি না কারো দিকে।

লায়লা কেন চলে গেল?

তাহলে আমারই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, কেন যাবে না? আমার কাছে কী পেয়েছে সে!

আমি একটা অফিসের হেডক্লার্ক। সরকারি অফিসের। আমার নাম গোলাম রহমান। কী ভেবে বাপ-মা এই নাম দিয়েছিলেন, জানি না—কিন্তু আমাকে দেখলেই যে কেউ বলবে, আমি গোলাম। বড় শাহেবের কাছে গোলাম, ছোট শাহেবের কাছে গোলাম, অফিসারদের কাছে গোলাম। এমনকি বউ-এর কাছে গোলাম, ছেলেমেয়েদের কাছেও গোলাম।

কী করে যে ওয়েস্ট এন্ড ইস্কুলের কাছে আজিমপুর কলোনির শেষতম প্রান্তের বিল্ডিং-এর একতলার এই ফ্ল্যাটটা পেয়েছি, কে জানে। কে জানে মানে, আল্লা জানেন। তা নাহলে ঢাকায় বাড়ি ভাড়া করে থাকতে হলে না-খেয়ে মরতে হতো। মানুষ তো আমরা কম না। লায়লা, আমি, আমাদের তিন ছেলেমেয়ে—জ্যাকি, লিজা, আর বনি। আমাদের সঙ্গে থাকেন আমার আব্বা—বয়েস প্রায় আশি হতে চলল। অন্তত ঠিকা কাজের মেয়েলোক একজন তো লাগেই। এই এতগুলো লোক দুটো রুমে থাকি আমরা।

আমার আরো তিনটি ভাই আছে। বোনের বিয়ে হয়েছে দেশেই—নোয়াখালিতে। লক্ষীপুরে তার শ্বশুরবাড়ি। শ্বশুরবাড়ি মানে স্বামীর বাড়ি। ভালোই আছে। বাকি তিন ভাইয়ের মধ্যে বড় ভাই ম্যাঞ্চেস্টারে সেই যে গেছে—ফেরেনি আর। ভালোই আছে, শুনেছি। বিয়ে-থা করেছে সেখানেই। অন্য দু'ভাই আছে ঢাকাতেই। তাদের একজন আব্বাকে একা দেখতে আসে ঈদে-বকরিদে। আব্বার জন্যে লুঙ্গি-পাঞ্জাবি নিয়ে আসে, কিছু টাকা দিয়ে যায়।

কিন্তু ওদের নামে গোলাম নেই। বোধহয় নেই বলেই আব্বার ভার ওরা কেউ নেয়নি। চাচারা আমাদের দেশের যেটুকু জমি ছিল, সেটুকু গ্রাস করেছেন। আমার আম্মা মারা গেছেন। আম্মার ইন্তেকালের পরে আব্বাকে নিয়ে আসি আমার কাছে। আব্বাকে দেখাশোনা করবে কে? আব্বা কি ভিখিরির মতো ঘুরে বেড়াবেন পথে পথে? তাই যত অসুবিধেই হোক, আমার কাছে নিয়ে রেখেছি। আশ্চর্য, আমি তৃতীয় পুত্র আব্বার। আব্বার শুধু ওনার নামের সঙ্গেই মিলিয়ে রেখেছেন আমার নাম। গোলাম মোস্তফা আমার আব্বার নাম।

আমার মতো অবস্থার কলোনির কেউ কেউ সাবলেট দ্যায়। দিতে পারলে আমারও খুব সুরাহা হতো। এতগুলো লোক আমরা ছোট্ট দুটো কামরায় থাকি—ভাড়া দেব কী!

এই ফ্ল্যাটের একটা ছোট্ট এক চিলতে বারান্দা ঘিরে থাকবার ব্যবস্থা করেছি আব্বার। তাই নিয়েই লায়লার কতো গঞ্জনা : 'একটু যে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াবো তার জো নেই। আরো তো ভাই আছে—নাকি তুমিই একমাত্র ছেলে—তারা তো তোমার বাপকে পোছে না। যত গরজ সব তোমার নাকি? আর তাদের তো তোমার মতো নুন আনতে পান্তা ফুরোয় না।'

লায়লার এসব গঞ্জনা শুনে আমি চুপ করে থাকতাম। শুধু লায়লার কেন, ছেলেমেয়েদের, অফিসের ছোট বড় কর্তাদের। আব্বা আমার নামের 'গোলাম' শব্দটা ঠিকই রেখেছিলেন।

লায়লা চলে গেছে। সেই লায়লা—যে একদিন বোরখা পরত, কিন্তু পরে ক্রমশ কী করে যেন বেশ আধুনিকা হয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কী, এমন কথাও অনেকবর শুনেছি আমার সঙ্গে লায়লাকে মোটেই মানায় না। আমি দাড়ি রেখেছি। টুপি পরি। আর লায়লা তো দিন-কে-দিন আরো তরুণী আরো আধুনিকা হচ্ছে।

আমার সঙ্গে বেরোতেও চাইত না লায়লা। তবু একদিন যেন কী দরকারে বেরিয়েছি, দেখি পাড়ার ছেলেরা বলছে—ঐ যে নায়িকা বেরিয়েছেন।

—সঙ্গে কে রে?

—হবে নায়িকার খালু।

পাড়ার ছেলে ওরা। খুব ভালো করেই জানে আমরা স্বামী-স্ত্রী। জ্যাকি-বনিকে চেনে না ওরা?

জ্যাকি। লিজা। বনি—এসব আমার ছেলেমেয়েদের নাম হয় কী করে?—এসব নাম লায়লাই দিয়েছে।

ওদের দেখেই বা কে বলবে বুড়ো হেড ক্লার্কের ছেলেমেয়ে ওরা। জিন্‌স এর শার্ট। গলায় চেন। লিজা পরছে ছেলেদের মতো পাঞ্জাবি। আমি যে সামান্য টাকা দিই, তাতে এসব যে কী করে হয়, তা জানি না। বুঝি না। প্রথম প্রথম রাগারাগি করতাম। লায়লা তখন বলেছিল : 'তুমি যেমনভাবে থাকো, তেমনভাবে তো কোনো ভদ্রলোক থাকে না। আমাদেরও কি সেভাবে থাকতে হবে নাকি? আমার ছেলেমেয়েরা একালের ছেলেমেয়ে।'

একটু-আধটু গান গাইত লায়লা। সেটা যে কী করে ছেলেমেয়েদের মধ্যে সঞ্চারিত হলো, কে জানে! আমার মতো নামাজ কালাম তো ধরল না কেউ। একটু

করে টাকা জমিয়ে গিটার কিনে দিল লায়লা। একই বাড়িতে আমি নামাজ পড়ছি, মসজিদে যাচ্ছি, আর ছেলেরা গিটার বাজাচ্ছে, গান গাইছে—এরকম অবস্থা কোন পরিবারে আছে, জানি না। প্রথমদিকে গান-বাজনা নিয়ে কথা বলতে গেলে লায়লা আমাকে যে সব কথা শোনাতো, তাতে আর কথা চালিয়ে যাওয়া যেত না। অফিসের কাজ বাড়িয়ে দিলাম, ছুটির পরেও থাকতে লাগলাম, কেননা অফিস থেকে বাড়ি ফিরলে মনে হতো আমি একটা খ্রিস্টান বাড়িতে ঢুকছি। ওরা যে ঘরে শুতো, ছেলেদের সে ঘরে যাওয়াই আমার কাছে ছিল লজ্জার। কী সব অসভ্য নারী-পুরুষের ছবি টাঙিয়ে রেখেছে।

ভাগ্যিশ, আব্বা চোখে ভালো দেখতে পান না। ও ঘর দিয়েই তো তাকে বাথরুমে যেতে হয়।

জ্যাকি কলেজে পড়ে, লিজা কলেজে পড়ে, বনি সামনেরবার কলেজে উঠবে। পিঠোপিঠি ওরা তিন ভাই-বোন।

জ্যাকি-বনিদের গানের মাস্টারের টাকা দেওয়ার সাধ্য আমার মতো মানুষের নেই। কোত্থেকে ওরা ব্যবস্থা করত, জানি না। সুদর্শন, কোঁকড়া চুলের ভদ্রলোক। বিবাহিত। ছেলেও আছে একটি। কেন যে তিনি আমার ঘরের দিকে নজর দিলেন, জানি না। অবশ্য লায়লা যে সুন্দরী, বয়েস হলেও সুন্দরী যথেষ্ট, সে আমি জানতাম।

লায়লা চলে যাবার পর কথা কমে গেল আমার আরো। অফিসে মাথা নিচু করে হেঁটে যাই। অফিস থেকে মাথা নিচু করে হেঁটে ফিরি।

এরকমই চলছিল।

সেদিন সকালবেলা বেরোচ্ছি অফিসে, হঠাৎ কোথাও কিছু না—বাঘের মতো সামনে লাফিয়ে পড়ল বনি।

—আব্বা, তুমি—তুমি—তোমার জন্যেই মা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।

চিৎকার করে বলে উঠল সে।

অত সকালবেলা সবাই ছিল বাড়িতে। ছুটে এল জ্যাকি, লিজা।

চিৎকার করে বলতে লাগল বনি—মা কি এমনি গেছে? গেছে তোমার নিঃশব্দ বদমায়েশিতে। তুমি ছেলেমেয়েদের জন্ম দিয়েছ। কিন্তু খেতে দিতে পার না। পরতে দিতে পার না। শুধু ডাল-ভাত খেয়ে আমরা মানুষ হচ্ছি। মাছ চোখে দেখি না। মাংস চোখে দেখি না। তার মধ্যে আবার তোমার বুড়ো বাপকে এনে রেখেছো—

জ্যাকি ছুটে এসেছিল। বনিকে গায়ে ধরে সরিয়ে দিতে লাগলো। তাও সে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে যাচ্ছিল।

লিজা ছুটে এসেছিল। সেও বনিকে ধরে সরানোর চেষ্টা করেছিল। মা—মা—বলতে বলতে সে ঘরের ভেতরে ছুটে গেল।

গোলমাল শুনে আব্বা বেরিয়ে এসেছিলেন লাঠি ভর করে কাঁপতে কাঁপতে। বারবার বলছিলেন—কী হয়েছে? কী হয়েছে? লিজা আব্বাকে ধরে না ফেললে উনি বোধহয় পড়েই যেতেন।

বারবার আব্বা কাঁপা গলায় বলছিলেন—কী হয়েছে? কী হয়েছে?

আব্বাকে কিছুই বলা হয়নি।

লিজা কাঁদতে কাঁদতে বলছিল—দাদু, আম্মু চলে গেছে। আম্মু চলে গেছে আমাদের ছেড়ে। আম্মু এ বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গেছে, দাদু।

আব্বার চেহারা দেখে মনে হলো, কিছুই শুনতে পাননি। আব্বা অনেক দিন থেকে কানে একটু কম শুনছিলেন। এখন কি সম্পূর্ণ কালা হয়ে গেছেন? আব্বার না-শুনতে-পাওয়া চেহারা দেখে তা-ই মনে হচ্ছে। খুব খারাপ লাগল আমার।

কিন্তু একই সঙ্গে একটু স্বস্তিও পেলাম। লায়লা চলে গেছে এতকালের ঘর-সংসার স্বামী-সন্তান ফেলে অন্য একজনের সঙ্গে, আব্বা হয়তো এই বয়েসে এটা সহ্য করতে পারতেন না।

বনি যে এত চ্যাঁচামেচি করেছে, আমি কোনো কথা বলিনি। বুকের রক্ত চলকে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল, মাথা ঘুরে পড়ে যাব। কিন্তু কাউকে কোনো কথা না-বলে নিঃশব্দে অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

বনি

আপাও চলে গেছে এ-বাড়ি ছেড়ে।

মা যাওয়ার কত দিন পরে? ছ-মাসও হবে না বোধ হয়। আপর বন্ধু-বান্ধব ছিল দুতিনটি পুরুষ, জানতাম। কিন্তু সোহেল নামের বন্ধুটি যে এতদূর এগিয়েছে, জানতাম না।

আব্বার চেহারা দেখে তো কিছুই বোঝা যায় না। চেহারায় ভালো-মন্দের কথা বলছি না। কিন্তু আমার মা তো রীতিমতো সুন্দরী। মা-র যে বয়েস হয়েছে, কে বলবে? আপাও মা-র মতো সুন্দরী। কোন পুরুষ না আপাকে পছন্দ করবে?

কিন্তু আপা সোহেলের সঙ্গে গিয়ে নিঃশব্দে তাকে বিয়ে করল কেন? বলতে তো পারতো বাড়িতে।

সন্দেহ হয়, আপা জানত খরচ করে বিয়ে দেবার সামর্থ নেই আব্বার। অন্তত সোহেলদের মতো সচ্ছল উচ্চ-মধ্যবিত্তের সংসারে। যতই আমরা ভেঙে পড়ি, আমাদের সারা পরিবার, এটা হয়তো আপা বুঝে-শুনেই করেছে। সোহেল কোনোএক কোম্পানির বড় চাকুরে, শুধুমাত্র রূপ দেখেই বিয়ে করেছে আপাকে। এ ধরনের লোক রূপ কিনতে চায়। ভালো অর্থেই কিনতে চায়। সুন্দরী বউ তাদের দাম বাড়িয়ে দ্যায় আরো। অফিসে। পার্টিতে। সামাজিক যে-কোনো আচার-অনুষ্ঠানে। এজন্যেই সোহেল চৌধুরী আমাদের মতো নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে। আব্বার মতো হেড ক্লার্ক বাপ তার কাছে কোনো ফ্যাক্টর না। ভাইয়া বা আমার মতো গায়ক কোনো ফ্যাক্টর না। কাজেই সামাজিক বিয়ের আয়োজন করেনি। আর আপা কেন সামাজিক বিয়েতে যায়নি তার কারণ তো পরিষ্কার। আব্বার ক্ষমতা নেই ওদের সঙ্গে সমান তালে মেলার।

আর একটা জিনিশ ভালো হয়েছে। সুন্দরী বলে আপার দুএকটা বড়লোক বান্ধবী জুটেছিল। আপার এক বড়লোক বান্ধবীর সঙ্গে আপা একাধিকবার গাড়িতে করে কোথাও গেছে। আপা কি টাকার লোভে খারাপ হয়ে যাচ্ছিল? কোথাও কি

শরীর বিক্রি করেছিল? আমাকে একবার চমৎকার গেঞ্জি আর পারফিউম উপহার দিয়েছিল আপা।

আমি জিগ্যেস করেছিলাম—আপা, টাকা কোথায় পেয়েছিস? আপা আর আমি পিঠেপিঠি। আমরা পরস্পরকে 'তুই' বলি।

আপা বলল—তোকে আমি একটা গিফট দিতে গেলাম, আর তুই উল্টো আমাকে টাকা কোত্থেকে পেলাম জিগেস করছিস।

—তুই না বললে আমি তোর উপহার নেব না।

—আমি তোকে কিছুতেই বলব না। তুই জানিস, আমি মেধাবী ছাত্রী। আমি কি টিউশনি করেও কিছু টাকা রোজগার করতে পারি না?

আমি আর কথা বাড়াইনি।

—আচ্ছা, দে, বলে জিনিশগুলো নিয়েছিলাম। কিন্তু ভেতরে একটা সন্দেহ রয়েই গিয়েছিল।

কিন্তু আপার দোষ কী—পুরো বাড়িটাই তো বিষাক্ত হয়ে গেছে। মা-র সঙ্গে মনসুর ভাইএর সম্পর্ক একটা তৈরি হচ্ছে—টের পাচ্ছিলাম। মনসুর ভাই শিক্ষক হিশেবে চমৎকার। কিন্তু মানুষ হিশেবে এমন জঘন্য, তা জানতাম না। তাঁর বউ-বাচ্চা আছে। চাকরি করে একটা নাম-কা-ওয়াস্তে। কিন্তু অনেক টাকা রোজগার করে গান শিখিয়ে। আমেরিকায় থেকে এসেছে কয়েক বছর। সেই সময়ই বোধ হয় ভালো টাকা জমিয়ে নিয়ে এসেছে। শুধু পাঞ্জাবি-পায়াজামা পরে, কিন্তু সব অসম্ভব দামি কাপড়ের পাঞ্জাবি। আগে বুঝতে পারিনি—এখন তো বুঝতে পারি, ওর চেহারাটাই লম্পটের। মিষ্টি মিষ্টি কথা, গান, বেশবাস, টাকা-পয়সা দিয়ে কত মেয়ের যে সর্বনাশ করেছে তার শেষ নেই।

আব্বার ওপর হঠাৎ একদিন খুব রাগ করেছিলাম। এখন খুব মায়া লাগে। লোকটা পাগল হয়ে যাবে না তো? বিশ বছরের ঘর-করা বউ আর একজনের হাত ধরে চলে গেছে। একমাত্র মেয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে স্বেচ্ছায় চলে গেছে। আশি বছরের অসহায় বুড়ো বাপকে আব্বার স্বচ্ছল ভাইয়েরা (ওদের 'চাচা' বলতে ঘৃণা হয় আমার) দ্যাখো না,—দ্যাখো আব্বার মতো গরিব মানুষ। মনে হয় এক-একদিন, আব্বার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদি অনেকক্ষণ ধরে।

আমরা তো অনেক সময় থাকতাম না কেউ বাড়িতে। আব্বা অফিসে, ভাইয়া আর আপা কলেজে, আমি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে বেরিয়েছি। বাড়িতে থাকার মধ্যে আমাদের বুড়ো দাদু—উনি তো চোখে দ্যাখেন না, কানে শোনেন না, হাঁটা-চলাও বন্ধ হয়ে গেছে। সেই সময় ঐ মনসুর আহমদ শয়তানটা আসত আমাদের বাড়িতে? এলে এই কলোনিতে কে টের পাবে? যে যার ফ্ল্যাটে ঢুকে আছে। হয়তো ঐ শালা আসত সেই সময়ে। ও তো এমনিতেই আসত। তখন বুঝিনি, আমাদের বিনা পয়সায় গান শেখানো (সংগীত-শিক্ষকের টাকা আমরা কোত্থেকে দেব?) ওর একটা অছিলা। মা বলত, 'টাকা দিস না, এলে একটু ভালো-মন্দ খাওয়ানো দরকার।' এই বলে রোজ (মানে যেদিন মনসুর আহমদ আসত—এখন আর 'উনি-আপনি' বলতে চাই না) ট্রে ভরতি করে খাবার এনে দিত। শুধু কি এনে দিত?

আমাদের শেখানোর সময়ে বসেও থাকত। অনেক সময় বেতের চেয়ারে। এখন মনে হয়, মনসুর আহমদ এলেই মা-র চোখে আলো জ্বলে উঠতে দেখেছি।

আর ঐ বুড়ো দাদু—ওটা একটা ভাম। আশি বছর বয়েস হয়ে গেছে—মরেও না। আব্বা বাপের জন্যে কী কষ্টই না করছে! এখন তো দাদু চোখে দেখতে পায় না, কানে শুনতে পায় না, হাঁটা-চলাও বন্ধ হয়ে গেছে। তাই একটা মেয়ে রেখে দিয়েছে, সার্বক্ষণিক দেখাশোনার জন্যে। তরুণী মেয়ে। মেয়েদের বয়েস সম্পকে আন্দাজ নেই আমার, তবু মনে হয় বিশ-পঁচিশ বছর বয়েস হবে, কালো, চেহারা সুন্দর, শরীর-স্বাস্থ্য ভালো। ওমা, হঠাৎ একদিন দেখি কি, আমার দাদুর পাশে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে, কারেন্ট চলে গেছে বলে দাদুর পাশে দাঁড়িয়ে হাত-পাখার বাতাস করছে, আর আমার ঐ আশি বছরের বুড়ো দাদু মেয়েটার পাছায় হাত বোলাচ্ছে। মেয়েটারও বোধ হয় ভালোই লাগছিল—মিষ্টি মিষ্টি হাসছিল। হঠাৎ আমাকে দেখে ফিক করে হেসে সরে দাঁড়ায়।

কী বলব, দুনিয়াটা তো এই। সেক্স, সেক্স, আর সেক্স। এই যে ফ্ল্যাটে আমরা থাকি, এর ভেতরে সিঁড়িঘরে থাকে এক কাগজ-কুড়োনো বুড়ো আর তার জোয়ান রোগা বউ। কী তাদের পেরেম! বুড়োকে দেখি একদিন বউ-এরর চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। আর একদিন অনেক রাতে ফিরেছি। পরিষ্কার দেখা গেল : একবার বুড়োটা ঐ মেয়ের ওপর উঠছে, আর একবার জোয়ান মাগীটা বুড়োর ওপরে। কারো গায়ে সুতোর চিহ্ন নেই বললে ভুল হবে—মেয়েটার গলায় একটা কালো সুতো বড়সড়ো মাদুলি আধো আলোতেও দেখা যাচ্ছিল। আমি একটু আড়াল করে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ সে দৃশ্য দেখলাম। মাথা ঝিমঝিম করছিল। শরীরের ভেতর দিয়ে, মনে হয়, বিদ্যুৎ বয়ে যাচ্ছিল। শেষে সরে এলাম। মাঠে গিয়ে বসে পর পর কয়েকটা সিগারেট খেলাম। তারপর রীতিমতো জুতোর শব্দ করে আমাদের ফ্ল্যাটে এসে দরোজার কড়া নাড়লাম। ততক্ষণে বুড়ো আর সেই জোয়ান বউটার নাক ডাকছে।

সেক্স, সেক্স সেক্স। আমার মা-ও কি... না, আমি ভাবতে চাই না। ভাবতে পারি না।

যারা গেছে, তারা তো গেছেই। মুশকিল হয়েছে আমার।

লেখাপড়া হবে না আমার। কিন্তু গায়ক হিশেবে এই অল্প বয়সেই আমি বুঝতে পারছি, আমি একদিন বিরাট কিছু হতে পারব। ভাইয়ার গলা তত ভালো না। ভাইয়াই বলেছে, 'দ্যাখ, গায়কের একটা জিনিশ থাকতে হয়। সেটা আল্লা বল, প্রকৃতি বল, তার দান। ওটা নাহলে তুই ভালো গায়ক বড় গায়ক হতে পারবি না। আমার গলা নেই। আমি, দ্যাখ, আস্তে আস্তে ওস্তাদ হয়ে যাচ্ছি, সংগীতবিশেষজ্ঞ হয়ে যাচ্ছি। এর মধ্যেই আমার দেওয়া কয়েকটা গানের সুর হিট করেছে। কিন্তু তোর আছে গলা। আল্লার দেওয়া গলা। এরকম গলা ক-টা আছে এ দেশে? তোর বিরাট ভবিষ্যৎ। এখনি তো বড় বড় সব জলাশায় ডাক পড়ছে তোর। আর যা বুঝতে পারছি, পড়ালেখা তোর হবে না। কয়েক বছর ধরেই তো এস.এস.সি. পরীক্ষা দেবার পাঁয়তারা করছিস। দিবি না, দিবি না। দরকার নেই। নামকরা

গায়ক হলে তোর টাকা কে খায়? তোর বয়েসে কাউকে অত বড় প্রতিষ্ঠান ক্যাসেট বের করার অফার দ্যায়? আমি করতে দিইনি। আরো পাকা হোক তোর গান। একবার ভালোভাবে নামলে যেন আর ফিরে তাকাতে না হয়। কিন্তু গলা ঠিক রাখবি। কোনো রকম বদভ্যাস করা যাবে না। বুঝলি তো?' ভাইয়া আমাকে পাখি পড়ার মতো করে বোঝায়। ভাইয়া ঐরকম চিরকাল। সত্যিকার বড় ভাইয়ের মতোই।

এটা ঠিকই, উঠতি গায়কদের মধ্যে আমার মতো জনপ্রিয়তা নেই কারো। আমি স্টেজে উঠলে 'ওয়ান মোর! ওয়ান মোর!' ধ্বনি হতে থাকে চারদিক থেকে। তখন মনে হয়—আর কিছু না, গানে সর্বস্ব ঢেলে দিই। রেডিওতে তো আগেই প্রোগ্রাম করছিলাম, টেলিভিশনেও সদ্য শুরু করেছি।

কিন্তু আমাদের পরিবারটা ছারখার হয়ে গেল যে! মা চলে গেল। আপা চলে গেল।

তাও হয়তো সহ্য করতে পারতাম। কিন্তু বন্ধুবান্ধব তো স্থির থাকতে দ্যায় না।

—এই, তোর মা-র সঙ্গে দেখা হয়?

—লিজা আপা কোথায় আছে রে এখন?

—তোর জন্যে খুব খারাপ লাগে রে, বনি। তুই এত বড় প্রতিভা। তোরই কপালে এত খারাবি। মা চলে গেল একজনের সঙ্গে, বোন চলে গেল একজনের সঙ্গে।

'আহা রে বনি! তোর 'বিষাদে ভরে আছে সমস্ত পৃথিবী' গানটা যে কী দুর্দান্ত! যাই বলিস, তোর ব্যক্তিগত দুঃখ পাওয়াটা কাজে লেগেছে। তা নাহলে কি আর তুই ঐ গান এত ভালো গাইতে পারতিস!'

—আচ্ছা বনি, তুই শুধু হতাশা আর দুঃখের গান গাস কেন?'

'মা চলে গেছে—বোন চলে গেছে—তোদের বাড়িতে আর কোনো মেয়ে নেই বুঝি? সত্যি, নিয়তির খেলা অদ্ভুত। এক একটা বাড়িতে মেয়ে সহ্য হয় না—মেয়েরা থাকতে পারে না।'

—এসব আলোচনা বাদ দেতো। মা-বোন চলে গিয়ে বনি ফ্রি হয়ে গিয়েছে বলেই না গানে এত সময় দিতে পারছে, গাইতে পারছে এমন অসাধারণ!

এই সবের প্রত্যেকটি কথা ধারালো ছুরির মতো এসে বেঁধে আমার গায়ে। সারা রাত ঘুমোতে পারি না। দিনের পর দিন। রাতের পর রাত।

তখন এক বন্ধুই পরামর্শ দ্যায়—এই, বনি, তোকে এত অস্থির লাগে আজকাল। চল আমার সঙ্গে। বুঁদ হয়ে থাকবি। কোনো ভাবনা-চিন্তা কষ্ট টেনশন কিছুই থাকবে না। নেশা ছাড়া কোনো কালে কেউ আর্টিস্ট হয়েছে নাকি রে?

এদিকে আমাদের দাদুর খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। বড় ডাক্তার আনলেন আব্বা। লাভ হলো না কোনো। ডাক্তার জবাবই দিয়ে গেছেন বলতে গেলে। আর আব্বা আগে যা-ও কথা বলতেন একটু-আধটু, তাও বন্ধ হয়ে গেছে। একদম চুপচাপ তিনি। একেবারে নিঃশব্দ।

লায়লা

মনসুরের সঙ্গে আমি চলে এসেছি—তিন ছেলেমেয়ের মা আমি—স্বামী ছেড়ে, বিশ বছরের সংসার ফেলে—সমস্ত আত্মীয়স্বজন ছি-ছি করছে। শুধু আত্মীয়স্বজন?—কাগজে উঠতে শুধু বাকি।

লোকে জানে না—বললেও বিশ্বাস করবে না : দিনের পর দিন লড়াই করেছি আমি নিজের সঙ্গে। মনসুরও বিবাহিত পুরুষ, তারও ছেলে আছে। কিন্তু তাকে যখন আমি দেখলাম, তৎক্ষণাৎ মনে হলো, এ-ই আমার স্বপ্নের পুরুষ। রোমান্টিক। বলিষ্ঠ। হৃদয়বান। ব্যক্তিত্বশালী। মনসুরের অপমানই কী কম হয়েছে! সে নিজে বিবাহিত, এক সন্তানের জনক। অনেকেই মন্তব্য করেছে তাকে লম্পট বলে। কিন্তু আমি তো জানি, সে-ই আমাকে দিনের পর দিন ঠেকিয়ে রেখেছে। আমার আত্মসমর্পণ সত্ত্বেও বিয়ের আগে সে আমাকে একটা চুমো পর্যন্ত খায়নি।

ছেলেরা আমার কাছে আসে না। জানি তাদের রাগ। অভিমান। আসে শুধু আমার মেয়ে লিজা। তার তরুণ স্বামীসমেত। কী ভালো ছেলেটি। জামাই আমার মনের মতো। সোহেল ছেলেটির নাম। ও তো বিয়ের আগেই শুনেছে লিজার কাছে, তার মা স্বামীকে ছেড়ে বিয়ে করেছে আরেকজন পুরুষকে। বোঝা যায়, ছেলেটি যথেষ্ট উদার। এ সব কিছুই মনে করেনি। লিজাকে সে ভালোবেসেছে—তাকে বিয়ে করেছে। ব্যস। এ-ই তো সত্যিকার প্রেমিক!

লিজা আবার ও বাড়িতেও যায়। স্বামীকে নিয়েই যায়। বাপের জন্যে ভাইবোনের জন্যে খাবারদাবার নিয়ে যায়। ছোটখাটো উপহার।

সেদিনও এসেছিল লিজা আর তার স্বামী। আমি জামাইকে একটা স্যুটের কাপড় দিলাম। লিজাকে তিনটে শাড়ি।

লিজা ও বাড়ি গিয়েছিল কদিন আগে।

—ওরা কী নেবে? বললাম—কেন নেবে না? নিজের মনেই বলতে বলতে জ্যাকি আর বনির জন্যে লিজার হাতে দিলাম প্যান্ট আর শার্টের কাপড়।

'জ্যাকি রেগুলার গান-টান প্র্যাকটিস করছে তো?' জিগেস করি।

লিজা বলে—হ্যা, মা।

—বনির তো খুব নাম হচ্ছে রে। সেদিন ওকে টিভিতে দেখলাম। কী সুন্দর লাগছিল যে! দেখে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। বলতে বলতে এখনো আমার চোখে পানি এল।

লিজা বলল—কেঁদো না, মা। আমি তো প্রায়ই যাই। ওরা ভালো আছে।

—বনির বোধ হয় আমার ওপর খুব রাগ?

—না, মা। রাগ ছিল। এখন কমে গেছে। এখন ও দিন-রাত গানের ফাংশান নিয়ে মেতে আছে। চারদিক থেকে ডাক আসছে।

—আর তোর ভাইয়া?

—ভাইয়া চিরকালের মতোই সিরিয়াস। ভাইয়ার সুরকরা নতুন ক্যাসেট বেরুচ্ছে শিগগিরই। ডলি সায়ন্তনী নাকি গাইবে। তাহলে তো খুব ভালো হয়।

—তোর দাদু কেমন আছে রে?

মুখ কালো হয়ে গেল লিজার। বলল—দাদুর কথা বোলো না, মা। দাদু আর বাঁচবে না। খাওয়া-দাওয়া তো আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এখন কথাও বন্ধ হয়ে গেছে, মা। তুমি দাদুর জন্যে একটু দোয়া কোরো, মা।

আমি কথা বলতে পারলাম না। বিয়ের পর থেকে এই মানুষটাকে দেখে আসছি। আমার শাশুড়ি হয়তো এটা-ওটা নিয়ে খোঁটা দিতেন কখনো কখনো। উনি কোনো দিন একটা কথা বলেননি। বরং উল্টো বলতেন আমাকে আড়ালে—তুমি তোমার শাশুড়ির কথা ধোরো না, মা। ওনার ব্লাডপ্রেশার আছে তো? তাই মেজাজ সবসময় খিটখিটে হয়ে আছে। কী কষ্টই পাচ্ছেন সেই উদার মানুষটা!

কিছুক্ষণ পরে বললাম—আচ্ছা, ঐ যে দু-তিনটে টবের গাছ ছিল, বেঁচে আছে রে?

—হ্যাঁ, মা। বেঁচে আছে। হাসল লিজা—বা—বা, তুমি যেভাবে খোঁজ নিচ্ছ বাড়ির! বলে লিজা আমার মুখের দিকে তাকাল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে লিজা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—মা, তুমি তো সবার খোঁজ-খবর নিলে। আব্বার কথা তো একবারও জিগেস করলে না?

শুনে আমি আর কথা বলতে পারলাম না। টপ্‌টপ্‌ করে আমার চোখের পানি পড়তে লাগল। লিজাও, দেখি কাঁদছে।

কেন আমি কাঁদলাম?

[১৯৯৭]

পরিশেষ

আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর গল্প-সংক্রান্ত তথ্যমালা

গ্রন্থ-পরিচিতি

সত্যের মতো বদমাশ (প্রথম সংস্করণ)

প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৬৮, কার্তিক ১৩৭৫
প্রচ্ছদপট, অঙ্গসজ্জা : গোলাম সারোয়ার, মুহম্মদ খসরু
দাম : চার টাকা
প্রকাশক : পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন
আলমগীর রহমান-কর্তৃক ১৯ সতীশ সরকার রোড গেণ্ডারিয়া থেকে প্রকাশিত এবং মাহবুবুর রহমান সিদ্দিকী কর্তৃক উত্তরা প্রেস বাবুবাজার ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
উৎসর্গ : নারগিস আসমা-কে
সূচিপত্র
১. সত্যাসত্য ২. মাতৃহননের নান্দীপাঠ ৩. ভয় ৪. অধঃপতন ৫. চমৎকার অবচেতন ৬. সমীচীন মানব ৭. মাংস ৮. সময়ের ঘর ৯. দণ্ডিত খেলোয়াড় ১০. বান্দা ১১. চাবি ১২. সত্যের মতো বদমাশ।

সত্যের মতো বদমাশ (তৃতীয় সংস্করণ)

প্রকাশ : জুন ১৯৮৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৫
প্রকাশক : চারিত্র, আবদুল মান্নান সৈয়দ, ৫১ গ্রীন রোড, ঢাকা ১২০৫
মুদ্রক : মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ, অভিজন মুদ্রায়ণ, ৬১/২ ডি আইটি সড়ক পশ্চিম মালিবাগ, ঢাকা-১২০৭
প্রচ্ছদশিল্পী : গোলাম সারোয়ার
দাম : ৫০ টাকা
উৎসর্গ নেই।

মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা

প্রকাশ : আগস্ট ১৯৭৭, ভাদ্র ১৩৮৪
প্রকাশক : মুক্তধারা, চিত্তরঞ্জন সাহা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা
প্রচ্ছদশিল্পী : হাশেম খান

মুদ্রাকর : প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
মূল্য : দশ টাকা
উৎসর্গ : আতাউর র. খান, বন্ধুবরেষু
সূচিপত্র
১. রুপোলি খুন ২. দর্পণে অগ্নি দেখে ৩. সর্বশক্তিমান ৪. বাঘ ৫. শুকতারা-সন্ধ্যাতারা ৬. শিকার ৭. ঋষি ও রাণী ৮. বসন্তের জ্যোৎস্না ৯. প্রতিদ্বন্দ্বী ১০. মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা।

নির্বাচিত গল্প

প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭
প্রকাশক : মুক্তধারা, চিত্তরঞ্জন সাহা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১০০০
মুদ্রাকর : প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
প্রচ্ছদ : হাশেম খান
মূল্য : সাদা কাগজ : ৪৫ টাকা
লেখক কাগজ : ৩২ টাকা
উৎসর্গ : শওকত ওসমান
সূচিপত্র
১. মাতৃহননের নান্দীপাঠ ২. চমৎকার অবচেতন ৩. চাবি ৪. রাস্তা ৫. জলপরি ৬. প্রতিদ্বন্দ্বী ৭. গল্প ১৯৬৪ ৮. যাত্রা ৯, গোধূলিসন্ধির গল্প ১০. সুন্দর অবদমন ১১. এক অমানুষের গল্প ১২. অস্তিত্ব অন্যত্র ১৩. মাছ ১৪. অমরতার জন্য মৃত্যু।

উৎসব

প্রকাশ : ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮
প্রকাশক : সানন্দ প্রকাশ, লতা হোসেন, বাড়ি নং-২৪, সড়ক নং-৬, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা ১২০৫
প্রচ্ছদ : গোলাম সারোয়ার
মুদ্রক : মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ্
অভিজান মুদ্রায়ণ, ৬২/২০ ডিআইটি সড়ক, ঢাকা ১২১৭
দাম : ৩০ টাকা
উৎসর্গ : বেলাল চৌধুরী
সূচিপত্র
১. উৎসব ২. চোখ ৩. রাজা ৪. কালো ৫. আম্রকাননে।

নেকড়ে হায়েনা আর তিন পরী

প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭
প্রকাশক : ওসমান গণি, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
বর্ণবিন্যাস : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা

মুদ্রণে : স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স, ২৭ বি-কে দাস রোড, ঢাকা
মূল্য : ১৫০ টাকা
উৎসর্গ : আহমাদ মাযহার, প্রিয়বরেষু
সূচিপত্র
১. নেকড়ে হায়েনা আর তিন পরী ২. এক দুপুরে ৩. কলকাতার আরব্যোপন্যাস ৪. কে বিদেশী বন উদাসী ৫. স্বর্গোদ্যান ৬. চৈত্রের ঘূর্ণি ৭. পয়লা ফাল্গুন ১৪০১ ৮. দরোজা ৯. সমুদ্র ও সাধারণ মানুষ ১০. আড়াই হাজার বছর আগের গল্প ১১. আট বছর পরে একদিন ১২. আবদুল হাফিজ : জীবন ও সাহিত্য।

মাছ মাংস মাৎসর্যের রূপকথা

প্রকাশ : ২০০১
প্রকাশক : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, রেড ক্রিসেন্ট বিল্ডিং, ১১৪ মতিঝিল বা. এ., ঢাকা ১০০০
প্রচ্ছদ : সৈয়দ এনায়েত হোসেন
উৎসর্গ : আবুল হাসনাত, বন্ধুবরেষু
মূল্য : ১০০ টাকা
সূচিপত্র
১. হোসেন মিয়ার সঙ্গে ২. কে তুমি? ৩ হঠাৎ এক দুপুরে ৪. বনের পাখি ৫. পাঁচ বোনের একজন ৬. গল্প ১৯৯৪ ৭. ব্ল্যাক-আউট ৮. হৃদয়পুর কলেজে কয়েকটি দিন ৯. নারীর হৃদয় প্রেম গৃহ অর্থ কীর্তি সচ্ছলতা ১০. মাঘের একটি দিন ১১. ফাল্গুনের একটি দিন ১২. চৈত্রের একটি দিন ১৩. নব্বই দশকের গল্প ১৪. গ্রীন রোড ১৫. মাছ মাংস মাৎসর্যের রূপকথা।

গল্প

প্রকাশ : ২০০১
প্রকাশক : চারিত্র, সায়রা সৈয়দ, ৫১ গ্রীন রোড, ঢাকা ১২০৫
মুদ্রক : শিল্পতরু প্রিন্টার্স এবং এডভার্টাইজার্স, ১১/৯ তাজমহল রোড, ব্লক : সি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭
মূল্য : ১০ টাকা
প্রচ্ছদের স্কেচ : পাবলো পিকাসো।

নির্বাচিত গল্প

প্রকাশ : বইমেলা ২০০২
প্রকাশক : ফরিদ আহমেদ, সময় প্রকাশন, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা
প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
মুদ্রণ : সালমানী প্রিন্টার্স, নয়াবাজার, ঢাকা
মূল্য : ১০০ টাকা
উৎসর্গ : কথাশিল্পী আবু রুশদ, শ্রদ্ধাস্পদেষু

সূচিপত্র

১. চমৎকার অবচেতন ২. মাতৃহননের নান্দীপাঠ ৩. রাস্তা ৪. শিকার ৫. ব্ল্যাক আউট ৬. কাঠঠোকরা ৭. অস্থির অশ্বক্ষুর ৮. আর-একজন আবু হোসেন ৯. আম্রকাননে ১০. অমরতার জন্য মৃত্যু ১১. চোখ ১২. রাজা ১৩. আবদুল হাফিজ : জীবন ও সাহিত্য ১৪. হোসেন মিয়ার সঙ্গে ১৫. বহুতল বাড়ি ১৬. ঢাকা ২০০০ ১৭. জীবনানন্দের একটি অপ্রকাশিত গল্প।

শ্রেষ্ঠ গল্প

প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৭
প্রকাশক : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা ১১০০
মুদ্রণ : গ্রাফোসম্যান রিপ্রডাকশন এন্ড প্রিন্টিং, ৫৫/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০
প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
মূল্য : ১৪০ টাকা

সূচিপত্র

১. মাতৃহননের নান্দীপাঠ ২. চাবি ৩. রাস্তা ৪. গল্প ১৯৬৪ ৫. জলপরি ৬. মাছ ৭. অমরতার জন্যে মৃত্যু ৮. অস্তিত্ব অন্যত্র ৯. আম্রকাননে ১০. রাজা ১১. আবদুল হাফিজ : জীবন ও সাহিত্য ১২. হোসেন মিয়ার সঙ্গে ১৩. জীবনানন্দের একটি অপ্রকাশিত গল্প ১৪. নারীর হৃদয় প্রেম গৃহ অর্থ কীর্তি সচ্ছলতা ১৫. বিদ্যা-সুন্দর কাহিনী।

বিভিন্ন গল্পসংকলনে অন্তর্ভুক্ত গল্প

১. *সাম্প্রতিক ধারার গল্প* : আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ-সম্পাদিত। ১৯৬৩, সিটি লাইব্রেরি, ঢাকা।
অন্তর্ভুক্ত গল্প : 'মাতৃহননের নান্দীপাঠ'। লেখক পরিচিতি : আবদুল মান্নান সৈয়দ। জন্ম ১৯৪৩, চব্বিশ পরগণা। ছাত্র।

২. *পূর্ব বাঙলার গল্পসংগ্রহ* : মিহির আচার্য-সম্পাদিত। প্রথম প্রকাশ ১৯৬৯। পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৭১, শুকসারী প্রকাশক, কলকাতা।
অন্তর্ভুক্ত গল্প : 'আত্মহত্যা-ব্যবসায়ী।'
ভূমিকার অংশ : 'তরুণ লেখকের মধ্যে আবদুল মান্নান সৈয়দ ও দেশে তাঁর বাজেয়াপ্ত গল্পগ্রন্থ *সত্যের মতো বদমাশ*-এর জন্যে এপার বাঙলায়ও কৌতূহলের কারণ হয়েছেন। এঁর রচনাশৈলীর সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহেই 'আত্মহত্যা-ব্যবসায়ী' গল্পটি গ্রন্থভুক্ত করা হল।'

৩. *শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প ১৯৭৯* : হোসেনউদ্দীন হোসেন ও মোস্তফা কামাল-সম্পাদিত। ১৯৮১, বুক সোসাইটি, ঢাকা।
অন্তর্ভুক্ত গল্প : 'অমরতার জন্যে মৃত্যু'।

৪. *বাংলাদেশের ছোটগল্প* (২য় খণ্ড) : সম্পাদিত। ১৯৮৪, বাংলা একাডেমী।
গ্রন্থভূক্ত গল্প : 'ভয়'। কথাসাহিত্যিক বশীর আল হেলালের ভূমিকায় অংশ : 'আবদুল মান্নান সৈয়দ স্বচ্ছন্দ কিন্তু বলিষ্ঠ ভাষায় কতকগুলি ভালো গল্প লিখেছেন। তিনি জীবনবিমুখ শিল্পী। গল্পে তাঁর যে দর্শন উপস্থাপিত হয়েছে সে হচ্ছে পরাজয়ের, অবক্ষয়ের, অচেতনার, মূল্যহীনতার ও লক্ষ্যহীনতার দর্শন। লক্ষ্যহীনতার লক্ষ্যকে তিনি উৎসাহের সঙ্গে অর্জনের চেষ্টা করেছেন। অভিনবত্বের চমক সৃষ্টির মোহে আপন ঐতিহ্যের দিকে পিঠ ফিরিয়ে তিনি পরকীয় ঐতিহ্যের দিকে মুখ করেছেন। তিনি আমাদের ছোটগল্পে নব-নিরীক্ষার উদ্‌গাতা।

৫. *প্রেম, ভালবাসা ইত্যাদি* (গল্প সংকলন) : নাজিম উদ্দীন-সম্পাদিত। ১৯৮৬।
অন্তর্ভুক্ত গল্প : 'সুন্দর অবদমন'।

৬. *বাংলাদেশের ছোটগল্প ১৯৮৬* : সম্পাদকমণ্ডলী : নুরুল ইসলাম খান (প্রধান সম্পাদক), শহীদ আখন্দ, ফজলে রাব্বি। ১৯৮৭, বাংলাদেশ কথাশিল্পী সংসদ।
অন্তর্ভুক্ত গল্প : 'রাজা'।

৭. *বাংলাদেশের নির্বাচিত ছোট গল্প* : আবুল হাসনাত, সম্পাদক। ১৯৮৮।
অন্তর্ভুক্ত গল্প : 'জলপরি'।

৮. *বাংলাদেশের ছোটগল্প* ১৯৮৮ : সম্পাদকমণ্ডলী : নূরুল ইসলাম খান (প্রধান সম্পাদক), ড. আলাউদ্দিন-আল আজাদ, শহীদ আখন্দ, মাহবুব তালুকদার। জানুয়ারি ১৯৮৯ : বাংলাদেশ কথাশিল্পী সংসদ।
অন্তর্ভুক্ত গল্প : 'আম্রকাননে'।

৯. *দুই বাংলার ভালবাসার গল্প* (দ্বিতীয় খণ্ড)। সম্পাদনা : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও হাসান আজিজুল হক। ১৯৮৯, মডেল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা।
অন্তর্ভুক্ত গল্প : 'জলপরি'।

১০. *বাংলাদেশের ছোটগল্প* ১৯৯০ : প্রধান সম্পাদক : নূরুল ইসলাম খান। ১৯৯২। বাংলাদেশ কথাশিল্পী সংসদ ও গ্লোব লাইব্রেরী (প্রা.) লি.।
অন্তর্ভুক্ত গল্প : 'চৈত্রের ঘূর্ণি'।

১১. *সেরা প্রেমের গল্প*। আহমাদ মাযহার সম্পাদিত। ১৯৯১। স্টুডেন্ট ওয়েজ।
অন্তর্ভুক্ত গল্প : 'সুন্দর অবদমন।'

১২. *দুই বাংলার নির্বাচিত গল্প*। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও শ্যামলী মহাপাত্র-সম্পাদিত। ১৯৯৪, পদ্মা-গঙ্গা পাবলিকেশন : কলকাতা।
অন্তর্ভুক্ত গল্প : 'জলপরি'।

১৩. *বাংলাদেশের ছোটগল্প*। প্রধান সম্পাদক : নূরুল ইসলাম খান। ১৯৯৫। বাংলাদেশ কথাশিল্পী সংসদ ও গ্লোব লাইব্রেরী (প্রা.) লি.।
অন্তর্ভুক্ত গল্প : 'কে তুমি?'

১৪. *দুই বাংলার প্রেমের গল্প*। এমদাদুল কবির সিদ্দিকী, আবদুল বারিক ভূঁইয়া সম্পাদিত। ১৯৯৫। বাড পাবলিকেশন্স।
অন্তর্ভুক্ত গল্প : 'আর-একজন আবুল হোসেন'।

১৫. *বাংলাদেশের ছোটগল্প*। প্রধান সম্পাদক : নূরুল ইসলাম খান। ১৯৯৫। বাংলাদেশ কথাশিল্পী সংসদ ও রুনা প্রকাশন।
অন্তর্ভুক্ত গল্প : 'কে বিদেশি বন-উদাসী'।

১৬. *বাংলাদেশের ছোটগল্প সংকলন*। শওকত আলী ও এখলাসউদ্দিন আহ্মদ সম্পাদিত। ১৯৯৭, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ (প্রা.) লি.।
অন্তর্ভুক্ত গল্প : 'সাপ'।

১৭. *মুক্তিযুদ্ধের গল্প*। আবুল হাসনাত সম্পাদিত। ১৯৯৭। অবসর প্রকাশনা সংস্থা। অন্তর্ভুক্ত গল্প : 'ব্ল্যাকআউট'।

১৮. *ইউ পি এল নির্বাচিত বাংলাদেশের ছোটগল্প*। ১৯৯৯। মহিউদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত।২০০১। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।
অন্তর্ভুক্ত গল্প : 'একটি দিন'।

১৯. *ইউ পি এল নির্বাচিত বাংলাদেশের ছোটগল্প*। ২০০১। মহিউদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত। ২০০১। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।
অন্তর্ভুক্ত গল্প : 'গল্পকারকে নিয়ে একটি গল্প'।

২০. *মুক্তিযুদ্ধের শতগল্প* (প্রথম খণ্ড)। হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত। ২০০১, গ্লোব লাইব্রেরী (প্রা.) লি.।
অন্তর্ভুক্ত গল্প : 'ব্ল্যাকআউট'।

২১. *ছোটগল্প নির্বাচিত সংকলন*। কামাল বিন মাহতাব সম্পাদিত ও জিয়া হাশান সংকলিত। ২০০৬। সাহিত্য প্রকাশ।
অন্তর্ভুক্ত গল্প : 'চমৎকার অবচেতন'।

২২. *সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী গল্প*। সোহরাব হাসান ও মোরশেদ শফিউল হাসান সম্পাদিত। ২০০৯। অনুপম প্রকাশনী।
অন্তর্ভুক্ত গল্প : 'গল্প ১৯৬৪'।

নির্বাচিত মন্তব্য

১. ['চলো যাই পরোক্ষে' সম্পর্কে] এটি নিছক গল্প উপন্যাসের বই নয়, একটি পরীক্ষামূলক রচনা, ভেবে-চিন্তে লেখা। যে-সব রচনা সাহিত্যকে বিস্তৃত করে, পাঠককে শিক্ষিত করে—এই গ্রন্থটি সেই জাতের এবং এই লেখকের সেরকম যোগ্যতা আছে নিঃসন্দেহে।

—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সাপ্তাহিক *দেশ*

২. ['চলো যাই পরোক্ষে' সম্পর্কে] বাংলাদেশের গদ্যপদ্য সম্পর্কে আমাদের প্রাথমিক কৌতূহল এখন স্তিমিত। বিশেষতঃ গদ্য সত্যিই আশানুরূপ লাগেনি। একদিকে শওকত ওসমান অন্যদিকে হাসান আজিজুল হক—দুই-ই—শওকত ওসমান প্রথমতই এবং হাসান শেষাবধি non-entertaining লাগে। এই সেই 'এন্টারটেইনমেন্ট', যার কথা ব্রেখ্‌ট বলেছেন বারবার ও কার্যত দেখিয়েছেন। আপনার লেখা শেষ অবধি এই অর্থে entertaining এবং প্রথম থেকে। এছাড়া সকল ভালো গদ্যলেখকের মত অবশ্যম্ভাবী কবি আপনি।

—সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, ব্যক্তিগত চিঠি

৩. ছোটগল্পে মান্নান সৈয়দ একজন আদি অধ্যায়ের শক্তিশালী লেখক। তাঁর 'সময়ের ঘর', 'মাতৃহননের নান্দীপাঠ' প্রভৃতি গল্প গতানুগতিকতার পথে পা বাড়ায়নি। সৈয়দের গল্প ছোটও বটে, গল্পও বটে এবং তার অধিকাংশের কিছু না কিছু বক্তব্য আছে।

—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, *বিশ্বসাহিত্যের আঙ্গিনায়*, ১৩৯০

৪. আবদুল মান্নান সৈয়দ এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রায় একসঙ্গে সাহিত্যে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁরা এখনো সাহিত্যিক সহযাত্রী, যদিও তাঁদের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। শক্তিমান দুজনেই, কেননা তা নাহলে এতদিনে একজন আরেকজনের অনুগামী হতেন। তবু ইলিয়াস মরবিড ও স্পর্শকাতর; সৈয়দ গ্রোটেস্ক ও অবিশ্বাসী। সৈয়দের প্রধান অবলম্বন তাঁর স্বতন্ত্র ভাষা।

—আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, *সাম্প্রতিক ধারার গল্প* : আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত

৫. এই সময়ের [ষাটের দশকের] গল্পশিল্পীদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য 'সমাজ বাস্তবতার' নির্মাণ। তবে আবদুল মান্নান সৈয়দ এর ধারেকাছেও যাননি। তাঁর গল্প ধ্রুপদী মাত্রা পেয়েছে মানুষের অন্তর্লোক চিত্রায়নের কুশলী সফলতায়। মানবমনের বহুবিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সূক্ষ্ম চিত্রণে তাঁর তুলনা মেলা ভার—

মানুষকে তিনি প্রধানত তুলে এনেছেন তার অন্তর্লোকের পরিপ্রেক্ষিতে, তার সমস্ত আকুলতা-আকুতি, আবেগ-আবেশ, বিস্ময়-বিপন্নতা, ভয়-ভাবনা আর এসবের অদ্ভুত-অসাধারণ ব্যাখ্যাসহ।

—আহমাদ মোস্তফা কামাল, *শ্রেষ্ঠ গল্প* : আবদুল মান্নান সৈয়দ

৬. আবদুল মান্নান সৈয়দ তরুণতমদের মধ্যে কনিষ্ঠতম হওয়া সত্ত্বেও সব্যসাচী, অবিরল এবং অজস্রভাবে লিখছেন। তাঁর শক্তি সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু গল্প লেখায় তাঁর নিষ্ঠা আরো বেগবান হওয়া হয়তো উচিত ছিল। তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু ও ভাবনাচিন্তা নগরকেন্দ্রিক এবং জীবনচেতনা আত্মিক, কবিতামণ্ডিত ও অনভূতিপূর্ণ। তাঁর ভাষা ও শব্দ ব্যবহারের—কৌশল অভূতপূর্ব নাড়ির সাক্ষাৎ বহন করে।

—প্রফেসর শফিউল আলম, 'সাম্প্রতিক ছোটগল্পের কতিপয় প্রবণতা', *স্ফুটন*, ১৯৭২

৭. অনেকের মতে মান্নান সৈয়দ দুর্বোধ্য দুর্জ্ঞেয়। কথাটি আক্ষরিক অর্থে ঠিক কিন্তু গূঢ়ার্থে সঠিক নয়। কেননা সাহিত্যে সীমানা ভাঙার যে বিদ্রোহ কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে আবদুল মান্নান সৈয়দ তখন তা করেছিলেন। ফলে আবির্ভাবের কালে তাঁকে কিছুটা জটিল ও দুর্জ্ঞেয় হতে হয়েছিল। তবে তা তৎকালীন সাহিত্যে তাঁর নতুন চিন্তার-চেতনার অভিযোজনাকে বাংলাদেশের শাশ্বত সমাজ যে অভিনন্দিত করেছিল সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

—ড. সায়েদা বানু, *বাংলাদেশের ছোটগল্পে বাস্তবতার স্বরূপ*

৮. আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর সবচেয়ে বড় চিত্ত—ভাষা উপার্জন করে নিয়ে সাহিত্যে এসেছিলেন। এমন গ্রাম্যতামুক্ত, স্বচ্ছন্দ, বেগবান, দ্যুতিময় ভাষা আয়ত্ত করা একজন লেখকের কম বড় কৃতিত্ব নয় (এবং বোধকরি সবচেয়ে জরুরিও বটে)। ফলে যা কিছুই তিনি লিখুন না কেন পাঠককে তা পড়তেই হবে। আর তাঁর পক্ষে শ্লাঘনীয় বটে যে, তিনিই বোধকরি এদেশে একমাত্র লেখক—অতি অল্প সময়ের মধ্যে যিনি তাঁর পরবর্তী তরুণ লেখকদের প্রভাবিত করতে পেরেছেন।

—কায়েস আহমেদ, *ছোটগল্প*

৯. মনের অন্ধকার, পিচ্ছিল ও বেখাপ্পা কন্দর থেকে কিছু সত্য যে টেনে বার করবার হিম্মত নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন আবদুল মান্নান সৈয়দ এবং যখন গিয়েছিলেন তাঁর সেই অভিযাত্রায় তখন তাঁর কোনো সহযাত্রী ছিল না এদেশে। 'সত্যের মতো বদমাশ'-এর গল্পসমূহের যতো ছিদ্রন্বেষণই আজ করা যাক না কেন, এটি নিঃসন্দেহে আমাদের ছোটগল্প সাহিত্যে এক মাইলস্টোন।

—সৈয়দ আবদুল মকসুদ,
একজন গল্পকার : আবদুল মান্নান সৈয়দ : আনওয়ার আহমদ সম্পাদিত, নভেম্বর ১৯৭৮

১০. প্রিয় মান্নান সৈয়দ,
একমাত্র আপনিই আমাদের সময়কার সেই গল্পকার—যাঁর গল্পে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা লক্ষ্য করা যায়। কি ভাষায় কি বক্তব্যে, কি প্রেজেনটেশনে 'মাতৃহননের নান্দীপাঠ' থেকে 'এক অমানুষের গল্পে'র দূরত্ব একজন লেখকের

পক্ষে অবশ্যই বহুকালের সাধনার ফল। আপনি খুব দ্রুত তা পেরেছেন। সাবাস।

—ইমদাদুল হক মিলন, ঐ

১১. একথা মানতে হবে, ঘটনা ছাড়া একটি মুহূর্ত নিয়েও যে গল্প হতে পারে, মান্নান সৈয়দ তা প্রমাণ করেছেন এ দেশে। জীবনের এমন সমস্ত কোণে তিনি গল্প দেখতে পান, যা পাঠক দূরের কথা, গল্পলেখকরাও অনেক সময় ভাবতে পারেন না। এ ছাড়া তাঁর আর একটি বিশেষত্ব বাংলা গদ্যকে একটি ভিন্ন স্রোতে, ভিন্ন ধরনে গড়ার চেষ্টা। তাঁর গদ্য সম্পূর্ণ নিজস্ব স্টাইলে তৈরি, যা শিল্পপদবাচ্য এবং একটি নতুন পরিণতির ইঙ্গিত নিয়ে এসেছে আমাদের কাছে।

—বারেক আবদুল্লাহ, ঐ

১২. সম্ভবত এরূপ একটি মন্তব্য অসমীচীন নয় যে শৈল্পিক বিবেচনায় আবদুল মান্নান সৈয়দ বাংলা ছোটগল্পে নিঃসন্দেহে এক ভিন্ন রাজ্যের অধিপতি।

—আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প*, ১৯৯৩

১৩. দোষই হোক বা গুণই হোক, মান্নান কখনো আহ্লাদী কণ্ঠে গল্প বলেন না। তাঁর গল্পের শরীর পেশীবহুল। গল্পের রাষ্ট্রে কবিতা হয়তো কখনো কখনো প্রবেশ করে কিন্তু শব্দের দ্যোতনায় সাঙ্গীতিক আবহ সৃষ্টিতে তিনি অনাগ্রহী। ফলত গল্পের স্রোত পাঠককে কখনোই আত্মবিস্মৃত করে ভাসিয়ে দেয় না, স্বীয় নির্ভরে পাঠককে হেঁটে হেঁটে এগোতে হয়। কখনো বা হোঁচট খেতে হয় এবং প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করতে হয় আমি আবদুল মান্নান সৈয়দের গল্প পড়ছি।

—খান মোহাম্মদ ফারাবী, *চলো যাই পরোক্ষে আলোচনা, উত্তরাধিকার*

১৪. মান্নানের গল্পগুলো আমার কাছে ভালো লাগে, কেননা তাঁর বেশিরভাগ গল্পেই একটি সাহসী প্রসঙ্গ এবং বক্তব্য থাকে।

—ফজল শাহাবুদ্দীন, 'আবদুল মান্নান সৈয়দ : দুটি নতুন উপন্যাস', *ইত্তেফাক*

১৫. আপাতদৃষ্টিতে আবদুল মান্নান সৈয়দকে আত্মবিরোধী মনে হলেও তিনি কখনোই সত্যবিরোধী নন—তার প্রমাণ তাঁর 'সত্যের মতো বদমাশ' গল্পগ্রন্থে। 'চলো যাই পরোক্ষে', 'মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা', 'নির্বাচিত গল্প' প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি এক বিস্ময়কর স্বকীয় ভাষারীতি অনুসরণ করেছেন। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সবরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা এদেশের সাহিত্যভুবনে একমাত্র আবদুল মান্নান সৈয়দই সম্পন্ন করতে পেরেছেন, বলা যায়।

—নাজমুল আলম, *আবদুল মান্নান সৈয়দের ৫০ বর্ষপূর্তি উৎসব সংবর্ধনা গ্রন্থ*

১৬. সমাজবাস্তবতার আচ্ছাদনে দুর্বল কথাসাহিত্য যেখানে দশক-দশক রাজত্ব করে বেড়ায় সেখানে ব্যক্তিকে গল্পসাহিত্যে চরম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা নিঃসন্দেহে সাহসের ব্যাপার। আশার কথা এই যে আরো অনেক কিছুর ন্যায় গল্পের ক্ষেত্রেও আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রথাজাড্যে গা ভাসাননি। অনেক পরে হলেও হাসান আজিজুল হক স্বীকার করেছেন যে ষাটের দশকে তাঁরা মান্নান সৈয়দকে ভাবতেন 'আধুনিকতম গল্পকার'।

—পিয়াস মজিদ, *খেয়া*, ভাদ্র ১৪১৫